ভ্রমণ

ডাঃ নকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

এচ. এম. বি., এফ. আর. এচ. এস.,

ডি. পি. ই., এম. এচ. এণ্ড এস. এল. (লণ্ডন)

১৪/৬, ক্যারী রোড, চ্যাটার্জ্জীহাট,

হাওড়া-৪

প্রকাশক ঃ

ডাঃ নকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রণে ঃ

বি. পি. ট্রেডিং কোং

৮৮এ, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড,

কলিকাতা-১৪

১ম সংস্করণ ১৯৫৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। গ্রন্থকার

১৪৬, ক্যারী রোড, চাটার্জীহাট, হাওড়া-৪

১। প্রবোধ লাইব্রেরী

৭৯, ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

৩। ফ্রেণ্ডস লাইব্রেরী

৫৩৬/১, সারকুলার রোড, চাটার্জীহাট,

হাওড়া-৪

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

সূচীপত্র।

		পৃষ্ঠা
১।	সিমলায় সাতদিন	১
২।	কেদার—বদ্রীনাথ	১৫
	কেদার-বদরীর মানচিত্র	
৩।	মোটরযোগে হাজারীবাগ	৪৩
৪।	ডাঙ্গোয়াপোসি (বিহার)	৫৪
৫।	সুমহান মহাবালেশ্বর	৬৪
৬।	ভারত পরিক্রমা	৮০
	মানচিত্রে ভারত-পরিক্রমার যাত্রাপথ	
৭।	কাঠমাণ্ডু (নেপাল)	১৯০

সিমলায় সাতদিন

ভূমিকারও যে প্রয়োজন আছে তাহা বোধহয় সর্ববাদী সম্মত। সুষ্ঠুভাবে কোন কিছু প্রকাশের পূর্বে একটু উপযোগী অবস্থার অবতারণা, কার্যাকারণ বিষয়ে আলোচনা বা ছোট্ট একটু নকশার আদর তাই এত বেশী। সময় বিশেষে বা কার্যে ভণিতারও প্রয়োজন আছে, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এখানে আমি দেশভ্রমণের উপযোগিতা, সম্পূর্ণতা, মানসিক বিকাশ, ভ্রমণের আনন্দ, দেশভ্রমণ ও দেশপ্রেম বিষয়ে দুচার কথা বলতে চেষ্টা করব।

মানুষের মন বৈচিত্রময়, সর্বদা সুদূরের জন্য লালায়িত। খাঁচার পাখী যেমন অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াতে চায়, মানুষও তেমনি স্বগৃহের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে চায়, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে শীতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ স্বাস্থ্যের অনুকূলে ও আপন আপন আর্থিক সামর্থানুযায়ী। সত্যই মানুষের দেশভ্রমণ করবার ইচ্ছা সুস্থ ও সবল দেহ-মনের পরিচায়ক ও পরিপূরক বলে মনে করি। মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার পক্ষে একান্ত সহায়ক এই দেশভ্রমণ। ভ্রমণে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পায়। আমাদের অনেক কিছু অজানা ও অদেখার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে এই অনাবিল ও বিশুদ্ধ আনন্দের মাধ্যমে। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের লোকদের মধ্যে যে নিয়ত দলাদলি ও ঝগড়া লেগেই থাকে তাহার কারণ আমাদের পল্লীভাইবোনেরা দেশ ভ্রমণ বড় একটা করেনা। যাহারা বহু দেশভ্রমণ করেছেন তাহারা সাধারণতঃ উদারভাবাপন্ন—কথায় ব্যবহারে ও কাজে। বস্তুতই বিভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার ও মতবাদের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিমানেরা সহজেই সঙ্কীর্ণতার আবরণ সরিয়ে দিয়ে মনকে স্বচ্ছ ও উদার করে লোকমানসে অমর হয়ে থাকেন।

চোখে দেখার আনন্দ, কানে শোনা কাহিনী বা বই পড়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী। সারাজীবনই মানুষ কিছু না কিছু শিক্ষা করে। জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে সর্বদাই শিক্ষার কাজ চলতে থাকে। মানুষ নিজে যাহা দেখে, তাহারই ভিতর দিয়ে তাহার প্রকৃত শিক্ষা হয়। সেইদিক দিয়েও দেশভ্রমণের উপকারিতা যথেষ্ট। কালের আবর্ত্তনের সাথে স্কুল কলেজের পাঠ্যাবস্থার পাঠসব আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যায়। দেশভ্রমণের ফলে কিন্তু দেশের মধ্যে ছড়ানো ঐতিহাসিক স্থানগুলি, ভৌগলিক অবস্থানগুলি চোখের সামনে এমনই সজীব হয়ে ওঠে যে তাহা ভুলবার নয়। মনের সাথে সে সমস্তরই একটা সহজ ঐক্যবোধ—মমত্ব জন্মায়। দেশভ্রমণ তীর্থভ্রমণই হউক, শোকসন্তাপ হরণের জন্যই হউক, বা লুপ্তস্বাস্থ্য পুণরুদ্ধারের জন্যই হউক, সবসময়েই তাহা শুভ এবং ইহার উপকারিতা সর্বসম্মত। দেহ ও মনের গ্লানি দূর করতে এমন "টনিক" বোধহয় আর নেই।

বিত্ত হতে চিত্ত বড় নয় কি? অর্থ অপেক্ষা ইচ্ছাটাই বড় কথা, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, আপনারা সবাই জানেন। অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যে কোন পুণ্য নেই। সমাজ চায় দয়া-মায়া, প্রেম-ভালবাসা, সুখ-শান্তি, কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমেই মানুষ হয়ে ওঠে সঙ্কীর্ণমনা ও স্বার্থবাদী। মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস দেখা দেয়, চুরি, জুয়াচ্চুরি ইত্যাদি নিত্যকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তাই চিত্তের উন্নতিসাধনে তৎপর হওয়া উচিত। পার্থিব বিত্তকে পরিত্যাগ করে চিত্তের বিত্তকে বড় করে দেখলে এই জগৎ আবার প্রেম, মহত্ব ও মনুষ্যত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মানব-প্রেম, দেশ-প্রেম, সমস্ত প্রেমের মূলেই রয়েছে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার একটি অদম্য বাসনা। শুধু মানুষই নয়, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, ফুলফল সবই কিন্তু আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারলেই ধন্য মনে করে। 'যে সহে সে রহে', আমরা সবাই জানি। জীবনে দুঃখ অনিবার্য্য কিন্তু তাহাকে জয় করাই বড় কথা। অন্ধকারময় গৃহে যেমন প্রদীপ জ্বালালে ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গৃহটি সমুজ্জ্বল হয়, সেরূপ জ্ঞানার্জ্জনেও সর্ব্ববিধ মনো-

মালিন্য বিদূরিত হয়ে চিত্তের ঔদার্য্য বা উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়। দেশে দেশে নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে, মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। মানুষ একটানা কাজ করতে পারে না, মাঝে মাঝে চিত্ত বিনোদনের জন্য অবসরের প্রয়োজন আছে, আর এই অবসর অতিবাহিত করার শ্রেষ্ঠ উপায়, দেশভ্রমণ। আর এ-কাজের প্রধান সহায় বা মাধ্যম হওয়া উচিত, সংসারের কাজের ফাঁকে সময় ও সুবিধামত দেশভ্রমণ। সিমলা, শিলং বা দারজিলিং মুসৌরী বা মহীশূর, প্রয়াগ বা পাটলিপুত্র, দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হরিদ্বার, রাঁচি, নৈনিতাল, পুরী, ওয়ালটেয়ার, জয়পুর, চিতোর, যশলমীর, কাশী, কুরুক্ষেত্র, গয়া, উত্তরে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা—যেখানেই যান না কেন, আনন্দে আত্মহারা না হয়ে থাকতে পারবেন না। প্রকৃতি আপন মাধুর্য্যে এতই সুষমামণ্ডিত যে সর্ব্বরুচির লোকের মনে সর্ব্বকালে অপার আনন্দ এনে দেয়, এই দেশভ্রমণ। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্রকাব্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যেমন চাই তদানীন্তন আবহাওয়া, উপযুক্ত পরিবেশ ও ভাবের অনুভূতি, ভ্রমণের আনন্দ পুরাপুরি উপলব্ধি করতে হলে চাই খোলা চোখে উপযুক্ত সঙ্গী আর্থিক আনুকূল্য ও সর্ব্বোপরি চিন্তামুক্ত সচ্চি দানন্দ মনোভাব। কথায় কথা বাড়ে, কাজেই এখানে "অলমিতি বিস্তারেন ভাল নয় কি ?

প্রখর গ্রীষ্মে পাহাড় বেড়ানো যে কত মনোরম তাহা আশা করি আপনারা সবাই জানেন। আমরা দুই বন্ধু গ্রীষ্মবাকাশে সিমলা পাহাড়ে যাব মনস্থ করে সব ঠিক করে নিলাম ; লেপ-তোষক, গরম জামাকাপড়, ফ্লাস্ক, ট্রানজিষ্টর সেট, ক্যামেরা, কিছু ঔষধপত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি-কিছুই বাদ গেলনা। গমনে "বামনবৈষ্ণব" স্মরণ করে জয়দুর্গা বলে সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম নিয়ে বের হলাম এক শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে "কালকা মেল" ধরবার জন্য। ষ্টেশনের যা ভীড়, তাহা না দেখলে কেহ বুঝতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে আমরা এক বিশেষ শ্রেণীর মজুরের শরণাপন্ন হলাম—তাহারা জনপ্রতি একটা মোটা পারিশ্রমিক পকেটে নিয়ে আমাদিগকে

"সজীব মালের" মত জানালা গলিয়ে ভিতরে ঠেলে দিল—আর ওদেরই আর এক ভাইয়া ভিতর থেকে আমাদের দেহটাকে সংগ্রহ করে পূর্ব্বনির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিল। উহারা এইভাবে আমাদিগকে সাহায্য না করলে নিজেদের চেষ্টায় আমরা ঐ গাড়ীতে উঠে বসতে পারতাম না নিশ্চয়। পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, ঐ রকম পরোপকারী মজুরের অভাব নাই হাওড়া স্টেশনে ! নিছক বেড়াবার উদ্দেশ্যই আমাদের—অন্যকোন কাজ নয়, এটা প্রথমেই বলে রাখা ভাল মনে করি। আমরা পূর্ব্বে মুসৌরী, হরিদ্বার, কাশী, গয়া, শিলং, কার্শিয়াং দারজিলিং, কালিম্পং, রাঁচী, রাজগীর, হাজারীবাগ, প্রভৃতি শৈল্যবাসে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে, সমুদ্র সৈকতে পুরী, ওয়ালটেয়ার, দীঘা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে ; এলাহাবাদ, আগ্রা, নৈনিতাল, মহীশূর, বাঙ্গালোর, ঝাঁসি, দিল্লী, প্রভৃতি মনোরম স্থানে একাধিকবার বেড়িয়ে এসেছি বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবারেও আমাদের সিমলা ভ্রমণ সার্থক ও সুন্দর হবে—এবং সত্যিকথা তাহাই হয়েছে। হাওড়া-কালকা মেলে দিল্লী হয়ে প্রায় ৪০ ঘণ্টা পরে আমরা কালকা পৌছাই। সেখান থেকে দুঘণ্টা পরে ছোট রেলগাড়ী চড়ে আমরা আবার রওনা হয়ে গন্তব্যস্থল সিমলা পৌছাই সোমবার বৈকাল প্রায় ৩টার সময়ে। আগের রাতে ঝড়ের চিহ্ন শুধু আমাদের মনেই নয়, কালকা থেকে সিমলা গোটা পথটাই ভীষণ ঝড়ের চিহ্ন রয়েছে নির্ম্মম নিষ্ঠুর সাক্ষীর মত। কোথাও বিশাল বটবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত, কোথাও ষ্টেশনের প্রতীক্ষালয়ের অর্দ্ধেক অজানা উদ্দেশ্যে উড়ে গেছে—চারিদিকেই প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলার সাক্ষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখলাম। বন্ধ গাড়ীর ভিতরে বসে অনেকটা এরকমই অনুমান করেছিলাম, এখন দিবালোকে সব চাক্ষুষ প্রতিভাত হইল !

আঁকা-বাঁকা পাহাড়িয়া রেলপথ আমদের কাছে নূতন নয়। তবু, কালকা-সিমলা লাইনের একটা বিশেষ রূপ আছে। সর্পিল গতিতে ট্রেন ছুটিয়া চলে, গতিবেগও কম নয়! গাড়ীগুলিকে রঙ করে উৎসবের সাজ পরানো হয়েছে, যেন আমাদেরই অর্ভ্যর্থনা'র জন্য। গাড়ীছোট হলেও তাহার ভিতরে সবরকমের সুবিধা দেবার চেষ্টা

হয়েছে। আছে 'সাণ্ডাস" (পায়খানা), আছে ছোটবড় বসিবার আসন—আর চোখে লাগে অথচ সহজভাবে আবৃত "এলার্ম' চেনের সুইচ"—যাহার অপব্যবহারের জন্য ২৫০ টাকা জরিমানার বিজ্ঞপ্তিও আছে পাশেই। একদিকে যেমন সুউচ্চ পাহাড়, অপরদিকে তেমনি বিরাট খাদ্! চড়াই উৎরাই, একের পর এক পাহাড় ক্রমেই উঁচু হয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রচারে মুখর হয়ে আছে। নানাপ্রকারের অদ্ভুত "ক্যাকটাস" গাছে ভর্ত্তি চারিদিকে পাহাড়, আর আছে কত রকমের অনাদৃত ফুল ও মনোহারী লতাগুল্ম। পথিমধ্যে একমাত্র বড় ষ্টেশন "বরোগ"—সেখানে গরম চা পানে অনেকেই শীতের আমেজে একটু সহজ হয়ে উঠল। এত দুঃসহ গরমের পরে হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন যেন অভাবনীয় মনে হয়। বিখ্যাত "সোলন" ষ্টেশানে (৪,৮০০ ফিট উচ্চ) "ডায়ার মিকিন" কোম্পানীর মদের কারখানা অবস্থিত। রেলপথে যাতায়াতের সময়েও মনে প্রাণে দোলা দেয় একটা মিষ্টি গন্ধে—বিশেষ করে ওপথের পথিক যাহারা তাহার তো বোধ হয় আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য সুরু করেন এই গন্ধের আমেজে-মদের ভাটিখানার মিষ্টি গন্ধে পথে ছোট বড় বহু 'কালভার্ট' বা রেলগাড়ী চলার উপযুক্ত ছোট্ট ছোট্ট কংক্রীট সেতু বিরাজমান। কিন্তু এই ছোট রেলপথের মধ্যে ১০৩টী "টানেল"—সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয় ইহার কারুশিল্প ও ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে। এই টানেলগুলির মধ্যে ৮নং, ৩১ নং ও ৮৩ নং বেশ বড়, আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মনে হয় ৩১নং (যাহার ভিতর দিয়ে যেতে রেলগাড়ীর সময় লাগে প্রায় ১৪ মিনিট)। কতই না মেহনত, বুদ্ধি ও আর্থিক খরচ ইহার জন্য হয়েছে এবং হচ্ছে প্রতি বৎসর।

যাক্, ছবির মত ছিমছাম সিমলা ষ্টেশনে নেমে আমরা প্রথমে যাই সিমলা কালীবাড়ী--একটী পুরাণ ও বিখ্যাত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। ওখানে আমরা রওনা হবার আগেই জরুরী তার করে আমাদের জন্য একখানা ঘর ঠিক রাখতে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সুযোগ হতে বঞ্চিত হলাম—ঠাই নাই, ঠাই নাই রব আর কি! পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শমত আমরা চললাম 'দি ম্যাল" রোড

ধরে বালাজী হোটেলের জন্য—কিন্তু সেখানেও ঐ 'যথাপুর্ব্বম্' (স্থান নাই)। এদিকে আড়াইদিনের পথক্লান্তি আর এই পথের চড়াই উৎরাই আমার সঙ্গের বন্ধুটিকে একান্ত কাবু করে ফেলেছে। তাহার অনুরোধ অনতিবিলম্বে যে কোন হোটেল রেস্তোরা পাওয়া যাবে তাহাতেই যেন আমারা ঢুকে পড়ি। আগত্যা আমাদের মজদুর ভাইয়ার চেষ্টায় (যিনি ষ্টেশন থেকেই আমাদের সাথে আছেন) অগৌণে পেয়ে গেলাম ম্যালের উপরেই "গেলট হোটেল" (ঠিক মিউনিসিপ্যাল পার্কের নীচে)—সিমলা-১! ম্যানেজার গৃহিনী (মাতাজী) সাদর অভ্যার্থনা জানিয়ে সব ঠিক করে দিলেন, আর আমরাও স্নানাহার সেরে নিয়ে অবেলা হলেও দিব্যি দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় নিজেদের সঁপে দিলাম।

সিমলার কালীবাড়ীর একটা ঐতিহ্য আছে বলে বিশেষ বর্ণনার দাবী রাখে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে সিমলা কালীবাড়ী তাহাদের সর্ব্বপ্রধান বলা যায়। এই কালীবাড়ীর আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। কালীবাড়ীকে কেন্দ্র করে সুদূর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সিমলার যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, তার আরম্ভ এক আকস্মিক ঘটনা বলা যেতে পারে। ভারত গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় আধুনিক সিমলা নগরীর গোড়াপত্তন হয়। ১৮২৩ সালে জরিপ সংক্রান্ত কয়েকজন বাঙালী রাজকর্মচারীর চেষ্টায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় শুনেছি। তুষারমৌলী হিমালয়ের রুদ্র প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে শক্তিসাধনার দিকে মন আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রবাসী বাঙ্গালীরাও তাই তাদের সবচেয়ে আদরের প্রতীক করালী কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়েছিলেন এখানে। জয়পুরের একবিখ্যাত ভাস্করকে দিয়ে এই দিব্যদিপ্তীভরা কালো পাথরের কালীবিগ্রহ গড়ানো হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সিমলার বিখ্যাত শ্যামলাদেবীর বিগ্রহও এই মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। স্থানীয় লোকেদের কাছে গল্প শোনা যায় যে এই শ্যামলাদেবীর নামানুসারে এই শহরের নাম 'সিমলা' হয়েছে। ইন্দোরের মহারাজা হোলকার, দিল্লীর

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ আলোপ্পী, জববল রাজ্যের রাণাসাহেব, জয়পুর এর মহারাণী, মণ্ডিরাজ্যের বাঙ্গালী রাজবংশের নৃপতি স্যার যোগীন্দর সেন এবং বহু বাঙ্গালীর অনন্যসাধারণ কর্ম্মোদ্যোগের ফলে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে এই সর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট কালীবাড়ী—সামাজিক আদর্শে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী বাঙ্গালীর কল্পনা যেন পরম ধৈর্য্যে হিমালয় শীর্ষে সকল হিন্দুর এক অভিনব মিলনতীর্থ সৃষ্টি করে তুলেছে !

এই মনোরম সিমলা পাহাড়ের উচ্চতা হল ৭,২০০ ফিট। এর আগে আমরা দারজিলিং (৫,৮১২ ফিট), কালিমপং (৪,000 ফিট), কারসিয়াং (৫,০০০), মুসৌরী (৭,000 ফিট), কাঠমাণ্ডু (নেপাল) ৫ ৫00 ফিট, বদরীনাথ (১[illegible]৫00), কেদারনাথ (১[illegible]৭৬0), আবু (৪,000), তিরুপতি (২,৮00), কাশ্মীর (শ্রীনগর, ৫২00 ফিট), রাঁচি (২000 ফিট), হাজারীবাগ (২00 ফিট)প্রভৃতি শৈলনিবাসে বা তীর্থস্থান বেড়িয়ে এসেছি। শুনেছি ভারতীয় মনোরম পাহাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে উটকামণ্ড (৭.৫00 ফিট), বেশ উঁচু। সেখানে যাবার জন্য সব সুস্থির হওয়া সত্ত্বেও একবার আমরা মহীশূর থেকে ফিরে আসি, কপালে মন্দ ছাড়া আর কি বলিব ? বলতে বাধা নেই যে হঠাৎ পৈটিক গোলযোগই ইহার একমাত্র কারণ।

পঞ্চনদের দেশে কর্মরত পুত্রের নববর্ষের প্রণাম জানিয়ে পত্র পাই রওনা হবার কয়েকদিন পূর্বে। নানা কারণে তাহাকে এর পূর্বে আর আশীর্বাণী পাঠানো সম্ভব হয়নি। এখন এই সুউচ্চ সিমলা শৈলে বসে মনের আনন্দে একটি ছন্দাকারে আশীর্বাণী লিখে পাঠিয়ে দিলাম—নিশ্চয়ই খুশী হবে পুত্র।

"শুভ নববর্ষ প্রাতে নবারুণ কিরণ সাথে
মোর এই ক্ষুদ্র আবেদন।
সুখ শান্তিময় হোক জীবন তোমার
বৃদ্ধ পিতার এই আকিঞ্চন॥
শান্তি ও স্বাস্থ্য দেহমন ঘিরে

যেন থাকে অবিচল।

চারিদিকে তব যেন থাকে অবিরত

আনন্দেরই কোলাহল ॥

লহ শুভেচ্ছা আর স্নেহ ভালবাসা

মোর সাদর সম্ভাষণ।

শুভ নববর্ষ তরে জানিয়ে স্নেহাশীষ

আজি করি সমাপন ॥"

সহযাত্রী বন্ধুবর আমার বাংলা ছবি খুবই পছন্দ করেন যদিও সময় ও সুযোগের অভাবে ভাল বইও দেখার সৌভাগ্য ঘটে ওঠেনা। তেমনি তিনি অপছন্দ করেন যত হিন্দীছবি, কারণ অবশ্য তাহার নিকটে যেমন শুনেছি (১) সব কথা ও গান বুঝতে পারেন না বলে আর (২) অবাস্তব সমস্যার উদ্ভট সমাধান দেখান হয় বলে। কিন্তু স্থান কালের পরিবর্ত্তনে কখন যে কি হয় বলা খুব কঠিন। এখানে যে চারটি ছবিঘর আছে (রিগ্যাল, রিট্জ, রিভলি ও শাহী) তন্মধ্যে বিখ্যাত "রিটজ" হলে আমরা "মিলন" বই দেখলাম। এই ছবিঘরের সদর দরজার কাছে রঙীন পুষ্পভারাবনত ছোট ছোট ফুলগাছগুলি দেখে মোহিত হতে হয়। তাহার পাশে পূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্থানীয় রমনীরা সহাস্যে হেলেদুলে "দশপয়সা প্যাকেট" 'ভারত-বাদাম" বিক্রয় করছে। ছবি দেখে হোটেলে ফির সে রাত্রে প্রায় ১০-১৫মিঃ এর সময়—উঃ, কি শীত তখন! বন্ধুটীর কিন্তু খুশী খুশীভাব—বৈচিত্র যে কোথাদিয়ে কেমন করে কাহার ভিতরে প্রকাশ পায় তা বোঝা ভার। "দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ"—নয়কি?

সিমলার প্রধান প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চিত্তাকর্ষক হল "জাবকু হিল"—উচ্চতা ৮,০৫০ ফিট। পদব্রজে বা ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয় এই মাইল খানেক পথ। আমরা ১৬ই মে মঙ্গলবার ওখানে বেড়াতে যাই দুটী সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে। ওস্তাদ না হলে

-ও এখানে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোতে কোন ভয় নেই—শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই ঘোড়ায় চড়ে স্ফূর্তি করে—আনন্দের সহিত কম পরিশ্রমে চড়াই উৎরাই করে—সহিস অবশ্য সঙ্গেই থাকে—"গাইডের" মত। এখানকার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে পূর্ব্বদিকে "সিঙ্গলী" পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম। আর পশ্চিমে খোদ সিমলা শহর—অপরূপ ভঙ্গিমায় যেন হাতছানি দিয়ে যেন কত কথা বলে চলেছে। সে দৃশ্য একবার দেখলে নয়ন ফেরান কঠিন। স্তরে স্তরে যেন ছোট বড় খেলার ঘর, সাজান রয়েছে, রঙীন সব ঘরবাড়ী, রঙ-এর মেলা বসেছে বাগানে বাগানে—মনপ্রাণ রাঙ্গিয়ে দেবার ক্ষমতা সত্যি এই দৃশ্যাবলীর আছে, বিশ্বাস করি। পাকদণ্ডি পাহাড়ের পথ, লম্বা চওড়া নয়, যেন গোলকধাঁধাঁর মত ঘুরে ঘুরে উপরে উঠি অনন্ত উৎসাহ নিয়ে। ভাবতে ভাবতে কত কথা মনে হয়—বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ। মঙ্গলময় ভগবানের অপরূপ সৃষ্টির রহস্য বোঝা ভার। পরমকরুণাময় পরমেশ্বর আমাদের কত স্নেহ করেন, কত ভালবাসেন, অবাক হয়ে যাই। আপাত দৃষ্টিতে নিস্প্রাণ পাদপাদিও তাঁহার সেবায় রত। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের তো কথাই নেই। শহরের বুকে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বার তাহার বাস্তব সাক্ষ্য। মাধবানন্দজীর বাণী মনে পড়ে 'কথায় ও আচরণে অন্যকে আনন্দ দেবার নামই সেবা" ছোটবড় গাছগুলিও যেন এই পরম সত্য উপলব্ধি করে মহান পিতার সেবায় নিযুক্ত রয়েছে। অন্যান্য পাহাড়ের ন্যায় এখানেও কিলাতা, বেরা, উটিস্, কটুস, মালাতা, ক্রীপটোমেরিয়া প্রভৃতি সুউচ্চ বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জনমানবের সেবায় তথা সৃষ্টিকর্ত্তার সেবায় নিজ নিজ জীবন বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হতেছে। তিনি একাধারে কৃষ্ণ, কালী, খৃষ্ট, খোদা, গুরুজী অর্থাৎ সবই; যেভাবে যে ভজন করে বা ডাকে, আপন আপন জ্ঞানধর্ম্ম অনুযায়ী। মত ও পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কি বলেন? তিনি বিশুদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যময়, প্রীতিময় ও দয়াময়—অপরাজেয় ও অপরাজিত, নীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ ও যোগযুক্ত তপস্বী! আমাদের শ্রীশ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ

চরিত্রের এরকম দার্শনিক ভাব মিলিবে। জাককু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মন অনাবিল আনন্দে নেচে উঠে। সাংসারিক দুঃখকষ্ট, দুশ্চিন্তা ক্ষণিকের জন্য হলেও মন থেকে সরে গিয়ে প্রকৃতির সাথে হাত মিলিয়ে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনে আগ্রহী হয় আমাদের সামগ্রিক অর্দ্ধজাগ্রত দেহমন-আত্মা। কি অপূর্ব সে অনুভূতি! এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হনুমানজীর মন্দির—একটি ভক্ত রসিকদের দর্শনীয় বস্তু। মজার কথা এই যে হনুমানজীর বংশাবতংস এখনও সেখানে আরামে ঘুরে বেড়ায় ও যাত্রীদের কাছ থেকে তাদের পাওনা আদায় নিতে মোটেই কার্পণ্য করে না। এই মন্দির প্রাঙ্গণে এখানকার স্থানীয় অধিবাসী শ্রীরামনন্দন শর্ম্মার সাথে খানিকটা আলাপ হয়েছিল! তিনি স্থানীয় "সেণ্ট বিডস্" কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র এবং একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। এরকম মিষ্টভাষী বুদ্ধিমান সজ্জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুখকর। তাহার নিকটে শুনলাম এখানকার বারমেসে অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু, তবে খৃষ্টান, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের লোকও কিছু কিছু আছে। মেয়েদের সাধারণতঃ ৭/৮ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরেই ১৭/১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। আর স্কুলের মেয়েদের মধ্যে গড়ে মাত্র ৫% কলেজে প্রবেশ করে। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী এই শহরে ৪/৫টি পৃথক পৃথক ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি কলেজ, ষ্টেটব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, অসংখ্য সরকারী অফিস (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার) আছে। আর আছে সিমলা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, মিউনিসিপ্যাল অফিস, টুরিষ্ট অফিস এবং আরো কত। প্রধান সড়ক "দিম্যাল"-এর উপর মিউনিসিপ্যাল পার্ক (রঙীন ফুলে ভরা, বসিবার জন্য মনোহারী ও রকমারী জায়গা—যাহার যেমন রুচি, নিভৃত আলাপনের জন্য বেছে নেওয়ার সর্ব্বসুবিধাযুক্ত), সিনেমাহল—বড় বড় অফিসগুলি, সুসজ্জিত সুবৃহৎ পণ্যশালা, নূতন নূতন বিদেশী টুরিষ্টের মনোহরণে ব্যাপৃত। ছোটবড় হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট ভর্ত্তি এই শৈলাবাসটি সত্যই মনোরম। বহু দেশী-বিদেশী, ধনী ও নির্ধনী ব্যক্তিরা

এখানে এসে কিছুদিন আনন্দে বেড়িয়ে যান প্রতি বৎসর।

আমরা গিয়েছি বেড়াতে, পূর্বেই একথা বলেছি। প্রথমদিনই রাত্রি শেষে লেপের গরম ছেড়ে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। যদিও ইতিমধ্যে আমাদের হোটেলের বেয়ারা "বেড-টী" দিয়ে গিয়েছে। আমরা "ব্রেকফাষ্ট" নেবনা, গরমজলে স্নানাদি সেরে একেবারে "লাঞ্চ" খেয়ে সারাদিনের জন্য বাহির হব বলে দিয়েছি। গল্পে গল্পে বেলা প্রায় ১০টা হয়ে গেল। তারপরে বেয়ারার তাগিদে লেপের গরম ভেঙ্গে সত্যি আমরা উঠে পড়লাম! লেপ ছাড়তেই বাইরের ঠাণ্ডাটা কনকনে হাওয়ার ভিতরে যেন আমাদের চাবুক মারতে লাগল। আকাশ ঘন মেঘে ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার' আর একারণেই আজ আমাদের বাইরে যেতে বেশ দেরী হয়ে গেল। হোটেলের বাইরে এসেই শীত—পা ঠিকমত চলে না মাতালের মত যেন ছন্দহীন। অদূরে তুষার শুভ্র সুবৃহৎ প্রখ্যাত শৈলশ্রেণী—ভারত ও তিব্বতের সীমানায় অতন্দ্র প্রহরী—অপূর্ব্ব তো বটেই।

সিমলা টুরিস্ট আফিস বেশ সাজানো-গোছান ও উপযুক্ত মিষ্ট-ভাষী কর্ম্মচারী দ্বারা পরিচালিত। তিনি সর্বতোভাবে যাত্রীদের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। প্রধান প্রধান বেড়াবার জায়গাতে বেড়াবার ও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে দেন। মনে হয় তিনি এটাকেই তার মুখ্যকর্ম্ম বলে বেছে নিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান বলতে বুঝায় :—

(ক) জাককু হীল (৮,০৫০ ফিট উচু), এখানে হনুমানজীর মন্দির আছে।

(খ) সোলন (৪,৮০০ ফিট) ষ্টেশনের কথা আগেই বলা হয়েছে।

(গ) আনণ্ডেল (উচ্চতা ৬,১১৭ ফিট)—শহর থেকে ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। সব চেয়ে বড় মাঠ এখানে, পথের শোভা অতীব মনোহর।

(ঘ) গ্লেন (৬,০০০ ফিট) চড়ুইভাতির জন্য উপযুক্ত স্থান।

গভীর বনের ভিতর দিয়ে ঝর্ণা কুলু কুলুনাদে ট্রেনের পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

(ঙ) তারাদেবী (৬,০৭০ ফিট)—রেলে বা মোটরে যাতায়াত করা যায়। পাহাড়ের চূড়ায় একটি সুন্দর মন্দির আছে। শহর থেকে ৭ মাইল দূরে "স্কাউট হেডকোয়ার্টার" এইস্থানে অবস্থিত।

(চ) তাতপাণি (২,১৫০ ফিট)—শহর থেকে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। বাসে যাতায়াতের সুবিধা আছে। গরম জলের প্রস্রবনের জন্য প্রখ্যাত।

(ছ) কোটগড় (থানাধর)—৬,০০০ ফিট উচু পাহাড়। এখানে প্রচুর আপেল ও খোবানী উৎপন্ন হয়। বাসে যাতায়াতের সুবিধা বর্ত্তমান।

(জ) ছেইল (৭,০৫০ ফিট)। সিমলা শহর থেকে বাসে যাতায়াত করতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উঁচুতে "ক্রিকেট" খেলার মাঠ এইস্থানে অবস্থিত। মনোরম ছোট্ট শহর, সরকারী অতিথি ভবন, বিশ্রামাগার, প্রভৃতি বিদেশী আগন্তুকদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য সপ্রতিভ প্রতীক্ষায় রত।

সুউচ্চ সুন্দর সিমলা শৈল
মধুর আবেশে লাগে দোল।
ছুটির আনন্দে বিশ্রামের ফাঁকে
মনের গহনে কত কলরোল॥
বহুদিনের আশা ভাবিতেও খাসা
কতই শান্তি আজ মনে।
সবকাজ ভুলি পরমানন্দে চলি
"জাকুহীল", সঙ্গী অনাজনে॥
পরমপিতার আজ মাগি আশীর্বাদ
চরণে জানাই নতি।
রঙ্গীন দিনের যত রঙ্গীন বাসনা
তোমাতেই যেন থাকে মতি॥

ভুলে গিয়ে পথশ্রম অর্থকষ্ট যত
নিবিড় শান্তিসুখ চায় মন।
তোমার ইচ্ছা জানি হইবে পূরণ
এ অভাগার তাই আকিঞ্চন ॥
সিমলার কালীবাড়ী ফিরি তাড়াতাড়ি
হিমেল হাওয়ায় ভ্রমণ শেষ!
কল্পাশেষে আবার সংসারের ঘানি
সেই পুরাতন "নূতনবেশ" ॥

মনের গহনে বা অন্তরের নিভৃততম কোণের মণিকোঠায় অনেক জিনিষ অন্যের অলক্ষ্যে সঞ্চিত থাকে। সময়ান্তরে সেই মধুর স্মৃতি বা স্মৃতিকণা মাত্র মানসপথে উদয় হলে অপার আনন্দ পাওয়া যায়— পুলকে মন ভরে ওঠে। এবিষয়ে আপনারাও দ্বিমত পোষণ করেন না আশা করি। আমাদের সিমলা ভ্রমণ সেইরূপ আমাদের মনের মণিকোঠায় গোপনে জমা থাক, সময়ান্তরে রোমন্থন করে আনন্দ উপভোগ করব।

সুউচ্চ পাহাড়ে, নূতন পরিবেশে বেড়াতে বেড়াতে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভ্রমণের আনন্দ মাটি হয়ে যায় ফিরে যাবার কথা মনে আসতেই। মনে হয় যেন চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, অয়েল না করে নিলে চাকা আর চলবে না। আমি জানি কোন কিছুই চিরকাল একরকম থাকে না—"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"। বোধন হলে বিসর্জন হবেই। ভালবাসার একটি অর্থই আমি জেনেছি-বেদনা! মিলনের নিগুঢ় অলক্ষ্য পরিণতি— বিচ্ছেদে! আচ্ছা, আমাদের হৃদয় তো আকাশ। আকাশে সব কিছুরই স্থান হয়, হৃদয়ে হয় না কেন? যত প্রশ্ন আসে মনে— উত্তরও হয়তো পাওয়া যায়—কিন্তু পছন্দসই হয় না। আমাদের হৃদয় মাঝে মেঘে ঢাকা আকাশের মতো ছোট্ট সঙ্কুচিত হয়ে যায়— নিয়মে, লোকাচারে ও নীতিতে। অথচ এই নিয়ম, নীতি লোকাচারই জগৎ-সংসারকে বেঁধে রেখেছে। ভেবে ভেবে মন ভারাক্রান্ত

হৃদয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—কারণ এই লোকাচারের অন্ধ নীতিতে আমিও বিসর্জিত হলাম। আমি যে হাসি চাই, যে উচ্ছ্বলতা চাই, জীবন-যৌবন আনন্দ চাই, তা পাওয়ার পথটা আমায় বলে দিতে পারেন? কোন আশা আছে কি আমার? স্বপ্ন দেখি, কি ও কেন...? অস্থির ক্ষ্যাপার মত অন্তরে কি যে খুঁজে বেড়াই, নিজেই জানি না—তবু ভয় হয় এই বুঝি হারাই। আত্মবিস্মৃত হয়ে পরম-পিতার নিকটে নিবেদিত হতে চাই, তাঁর করুণার এক কণাও পাবনা কি?

এবার বিদায় সিমলা থেকে। মাত্র সাতদিন থেকেই পুনরায় সেই গরমের দেশে পাড়ি জমাবার উদ্দেশ্যে প্রথমে "টুরিষ্ট" অফিসে এবং তাদের পরামর্শমত সিটি বুকিং (রিজার্ভেশান) অফিসে যাই এবং সর্ববিশেষে সিমলা রেল স্টেশনের চীফ বুকিং ক্লার্ক শ্রীঅরোরার নিকটে। শ্রীঅরোরা একজন সজ্জন, অভিজ্ঞ রেলকর্মী এবং সবাইকে উপযুক্ত বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। ব্যথায় ভরা মন ফিরবার কথা মনে ভেবে, তবু যতটুকু আনন্দ সংগ্রহ করা যায়, যতখানি মধুর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই, মনের মধ্যে এঁকে নেওয়া যায়—এই আশায় দুজনেই উপযুক্ত আসন সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম প্রথমদিকে। সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য কথা কাটাকাটি শেষ হলেও মনের গুমোট সহজে গেল না। অবশ্য পরে সেসব শুধরে গেছে—আমার শুধু স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে মনের গভীরে। যাক, আমরা কালকা মেলে রওনা হই ১২-৪৫ মিঃ, সন্ধ্যায় কালকা পৌঁছাই। রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিঃ হাওড়া মেলে চেপে বন্ধুবর ও আমি তার পরের পরদিন প্রাতে প্রায় ৯।। টার সময়ে হাওড়া পৌঁছাই। মনে পড়ে সেই "পুনর্মূষিকোভব" বা ছুটির শেষে যে তিমিরে সেই তিমিরে—চলমন নিজ নিকেতনে।

কেদার-বদরী ভ্রমণ

অনেকদিন আগে শ্রীপ্রবোধ কুমার স্যান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়ে কেদার-বদরি ভাল করে জানবার জন্য প্রলুব্ধ হই, কিন্তু সংসারী জীব আমরা, তাই সহসা সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠেনা। আর এটাও জানা কথা যে সুযোগ এলেই হয়না, সুযোগের জন্য সুযোগ্য হয়ে তৈরী থাকতে হয়। চেষ্টা থাকলে পুরাপুরি না হলেও অনেকটা যে সফল হওয়া যায়, তার প্রমাণ যথেষ্ট মিলে—উদাহরণ আমি স্বয়ং। স্ত্রী সহ ধর্ম্মাচরণ শ্রেয়ঃ জেনে আমরা দুজনে শ্রীকেদারনাথ ও শ্রীবদরি নারায়ণ তীর্থ দর্শনে রওনা হব ঠিক হল হঠাৎ। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" গমনে বামনকৃষ্ণের স্মরণ করে হাওড়া থেকে ডেরাডুন এক্সপ্রেস যোগে সরাসরি হরিদ্বার, আর সেখানে মোট পাঁচ দিন থেকে ট্রেনযোগে হৃষীকেশ, আর সেখান থেকেই হল সত্যিকারের কেদার-বদ্রী যাত্রা। হাওড়া থেকে হরিদ্বারে ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর বর্তমান ভাড়া ৩৭'৪০ পয়সা। রেলপথে হরিদ্বারে (১৪৭৫ কিঃ মিঃ) পাঁচদিন [তিনদিন ভোলাগিরি ধর্মশালা ও দুদিন "বিদেশ বিরাম ভবন"] বাসকাল আমরা মনের আনন্দে আর একবার দর্শনীয় স্থানগুলি বেড়িয়ে বেড়াই।

ব্রহ্মকুণ্ড (হরকিপৌড়ি) ঘাটের পাশেই গঙ্গা, গায়ত্রী, শ্রীবদরি নাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখলাম। সকাল-সন্ধ্যায় এখানে নিয়মিত আরতি হয় দেবী গঙ্গার—সন্ধ্যারতির সময় বিশেষ করে বহু যাত্রীর-পর্যাটকের সমাগম হয় এখানে। অনেকে পাতার ডালায় দীপ জ্বেলে নিজের নিজের কামনা জানিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়ে দেন। মুসল মানদের এখানে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ শুনলাম। পূতসলিলা, সর্বসন্তাপ হারিণী মা গঙ্গার কথা আর কি বলব—আপনারা সবাই জানেন। নররূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ একসময়ে

তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "ওরে গঙ্গার জল জল নয়।" অর্থাৎ জল বহু পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এর সাথে মিশে আছে বিভিন্ন ধাতু, বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও বহু বনৌষধি। সেজন্যই গঙ্গার জল, সাধারণ জলের চেয়ে মানব দেহের বিশেষ উপকারী ও অমৃততুল্য। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বিরাট আকারের মাছগুলি অল্প পরিসর জলে এসেও যাত্রীদের দেয়া ময়দা গুলি নির্ভয়ে খেয়ে খেলে বেড়ায়। জুতো পায়ে ঘাটে যাওয়া নিষেধ —হিন্দী ও ইংরেজীতে কয়েকস্থানে এ কথা লিখিত আছে।

মনসাদেবীর মন্দির, হরিদ্বার রেলওয়ে লাইনের ধার ঘেঁষে হরকি-পৌড়ির পিছনে। প্রায় আধমাইল উচু পর্বতশিখরে এই প্রখ্যাত মন্দিরটি অবস্থিত। ১,১০০ শতাব্দীতে ইহা নির্মিত হয়েছে বলে কথিত আছে। দেবী প্রতিমার তিনমাথা ও পাঁচহাত, ভোগ হয় সাধারণতঃ মুড়ি, খৈ, (চলতিনাম যথাক্রমে পরমল, খিল/ফুলিয়া) ও নকুলদানা দ্বারা ; বেশ মজার কথা নয়কি ? এই মনসা দেবীর মন্দিরের পাশ্বেই দেবী অষ্টভুজা ও ভৈরবের মন্দির আছে। মন্দির —কমিটি ইদানীং মন্দিরে উঠবার রাস্তা ও উপরে বিশ্রামাগার প্রভৃতি সুগম করিবার চেষ্টা করছেন।

মানবকল্যান আশ্রম—এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি সকলের মনেই তৃপ্তি এনে দেয়। প্রধান পুরোহিত ১০৮ স্বামী শ্রীসুখদানন্দ পুরী (বাঙ্গালী) বিভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সবাইকে বুঝিয়ে দিতে আগ্রহান্বিত। এখানে স্বল্প ব্যয়ে যাত্রীরা নিজ গৃহের ন্যায় কয়েকদিন থাকতে পারেন। পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও অতীব মনোরম। যাত্রীদের নিকট থেকে এখানে স্বেচ্ছা-দান গ্রহণ ও রসিদ দেওয়া হয়।

হৃষীকেশের পথে 'সপ্তঋষি আশ্রম" (সপ্ত সরোবর) প্রায় এক-মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে এখানে বসে সপ্তঋষি তপস্যা করেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর এখানে দেহত্যাগ করেন। এসব দেখে দেখে মন পুলকিত হয় ; ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে প্রাণে এক অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি

হচ্ছে চারিদিকে; বহুতলবিশিষ্ট রম্য অট্টালিকা নির্মিয়মান দেখলাম কিন্তু সেই পুরাণো পারিপার্শ্বিক পূতভাবাপন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন ক্রমেই বিলীয়মান। হৃষীকেশে সরকারী সাহায্যে "এন্টিবায়োটিক" কারখানার নির্মানকার্য্য শেষ। শতসহস্র লোকের অন্নসংস্থান হবে এতে, দেশেরও হয়তো উপকার হবে অগোণে. কিন্তু সেই শুচি-শুভ্র অনাবিল পরিবেশটি, আশ্রম সান্নিধ্যের খুশী-খুশী ভাবটি আর পাওয়া যাবে কি? সে যে একান্তে চলে গেল মনে হয়।

এই হরিদ্বারে বহু ধর্মশালা, নীলপর্বততীর্থ, শ্রমণনাথ মহাদেবের মন্দির, ভোলাগিরি মন্দির, কনখল, (২মাইল—গঙ্গার নীলজলধারা ও ভাগীরথী জলের সঙ্গমস্থল), ভীমগোড়া, গুরুকুল, (৪ মাইল—স্বর্গীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ১৯০২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে ৪টি পৃথক পৃথক কলেজ আছে যথা—আদর্শ কলেজ, বেদ-বিদ্যালয়, আয়ুর্বেদ কলেজ ও কন্যাগুরুকুল। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। এখানে প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পিছিয়ে নেই—অতিরিক্ত ইংরেজী, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ও নিয়মিত-ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।) ঋষিকুল কলেজ, হাসপাতাল, সেবা-সমিতি, বাঙ্গালী পরিচালিত হোটেল ও বিভিন্ন প্রকারের দোকান আছে। এখানে সবাই নিরামিষাশী, আমিষের নামও যেন দণ্ডার্হ। জ্বালাপুরে (৫ মাইল) ইহার ব্যতিক্রম।

হৃষীকেশ (স্বর্ণাশ্রম) ছাড়িয়ে আমরা ট্যাক্সি করে যাই লছমন-ঝুলা পুলের গোড়া পর্য্যন্ত। পূর্বাপেক্ষা রাস্তা এখন অনেক সুগম, কোন অসুবিধে নেই। সরকারী নিরীক্ষণ ভবনটী পুলের গোড়ায় অবস্থিত। ধর্মশালা ও যাত্রীনিবাসও আছে এখানে। পুলের ওপারে স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন, মহামণ্ডল, বহু দেবালয় বিভিন্ন প্রদেশের সাধু-সন্ন্যাসী, সবকিছু মিলে একটা অনবদ্য ভাবে মন ভরে ওঠে। অজানাকে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়; বাড়ী ফিরতে মন চায়না। দৈহিক ক্লেশে ক্লেশই মনে হয়না। হৈমবত প্রদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন দোলা খায়। সকল বাঁধন খুলে লোভ-মোহ-স্বার্থ

ভুলে মহানন্দের পথে ছুটে চলার দুর্ব্বার বাসনা জাগে মনে। কত কথা আসে মনে—যেন এ চিন্তার শেষ নেই। কালিদাস রায় মহাশয় ঠিকই বলেছেন, "কত জ্ঞানবীরগণ দূর দুরান্তরে পৃথিবীর অজ্ঞাত, অনাবিস্কৃত পথের পথিক হইয়া নানাপ্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বীরব্রতে কেহ বা জয়ী হইয়াছেন, কেহ বা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ; কেহ বা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অন্যকোন দুঃসাহসী বীরকে ব্রতভার সমর্পন করিয়া গভীর প্রতীক্ষায় জীবন যাপন করিয়াছেন। এই অসাধ্য-সাধন সত্যের আবিষ্কারের জন্য, জগতের জ্ঞানসম্পদ বাড়াইবার জন্য, প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের জন্য—এককথায় অজানাকে জানার জন্য।"

পাহাড় থেকে বের হয় নদ-নদী, পাহাড় ভেঙ্গে। আর তারা যে চূর্ণ পাষান বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা মোটামুটি পলিমাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানতঃ গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরী। দক্ষিণাপথ থেকে উত্তরাপথ (উত্তরখণ্ড) বোধহয় নবীনতর, কারণ, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশ প্রথমে ছিল জলমগ্ন পরে হিমালয়ের নদনদীর কৃপায় উত্তরাপথ গড়ে উঠল—ভারতবর্ষ নামক মহাদেশের উত্তরাপথ বা উত্তরখণ্ড যুক্ত হল দক্ষিণ দ্বীপের সাথে তাই এখন উত্তরখণ্ড জনবহুল, শস্যশ্যামল, দেবতাত্মা হিমালয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, "যুরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেছে শহরে ও সেইখানেই লালিত-পালিত। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে ও সেইখানেই লালিত-পালিত হয়েছে।" মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানতঃ মাটি নিয়ে। গাছপালা, তৃণশস্য, সব মাটিতেই জন্মায়। কিন্তু মাটি হল পৃথিবীর চামড়া, ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথরে কিছুই জন্মায়না—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। হয় পাথরকে পুড়িয়ে বা গুড়িয়ে, না হয় গলিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। জলের কাজ হচ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা, আর অগ্নির কাজ হল তাকে দ্রব করা।

তাই পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলেছেন যে "মা বসুন্ধরা অন্তরে অন্তরে পাষানী।" যাক, কথা বলতে বলতে বোধ হয় খেইহারা হয়ে পড়েছি।

যে গাড়ীতে আমরা হাওড়া থেকে হরিদ্বার রওনা হই, সেই গাড়ীতেই (সৌভাগ্যক্রমে বলতে বাধা নেই) বদরীনাথ পর্বত (২২, ৭৭০ ফিট) অভিযানকারী এক বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রওনা হলেন। ভারতীয়েরা বিশেষ করে হিন্দুরা ভারতকে জানার জন্য ঘর বাড়ী ছেড়ে বাহিরের আকাশে সাড়া দিবার জন্য চিরকালই আগ্রহশীল। এই উৎসবে সব চেয়ে বেশী ইন্ধন যোগায়, অপার রহস্যের খনি-সুউচ্চ চিরপ্রশান্ত দেবাদিদেব হিমালয়। একথা সত্য যে সমতলের থেকে উত্তুঙ্গ পাহাড়ী পথের আকর্ষণ অনেক বেশী এবং ভারতের উত্তরে প্রায় দেড়হাজার মাইল লম্বা এবং দেড়শত মাইল চওড়া মহান দেবতাত্মা হিমালয় পর্বতমালা অভিযানকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। পর্বতারোহণের পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র তাহাদের সহায়। ভারত সরকারও নানাকারণে তাহাদের সার্থকভাবে উৎসাহ দিতে ও সাহায্য করতে উৎসুক। ষ্টেশনে প্রখ্যাতযশা শ্রীপ্রবোধ সান্যাল মহাশয় নিজে উপস্থিত থেকে অভিযাত্রীদলকে মাল্যভূষিত করে খুব উৎসাহ দান করেন। আমাদের সঙ্গে একই গাড়ীতে নয় শুধু, একই "কম্পার্টমেণ্ট" হওয়ার জন্য আমরা সবপথটাই তাহাদের সান্নিধ্য ও সংসর্গলাভে "পুলকিতচিত্ত" হয়েছিলাম। দলের ম্যানেজার মিঃ এস বোস যেমন অমায়িক, তেমনি রসিক। আবার বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই তিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন এই কঠিন কাজের জন্য। তিনি ভবিষ্যত বিষয়ে একটি বিশেষ মত পোষন করেন—তার কাছে যাহা শুনেছি তার সারমর্ম্ম হল এই যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন চিন্তা বা অনুমান করা খানিকটা পাগলামী মাত্র। সংসারে বাধা বিপত্তি কেবলমাত্র উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যেই অতিক্রম করা সম্ভব। অনুমান বা তর্ক মানুষকে ভুলপথেও নিয়ে যেতে পারে—কেননা, অনুমানের সম্বন্ধ ভবিষ্যতের সঙ্গে আর ভবিষ্যৎ চিরকালই অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত। অনুমান তাই ভুল হতে পারে। অতএব ভিত্তিই যদি

ভুল হয় তাহা হলে তারজন্য তর্ক করা বা ভুল ভিত্তির সাহায্য নিয়ে সফলতার স্বপ্ন দেখা পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে? তার কাছে আরও একটা মজার কথা শুনেছিলাম—তার বলার ঢংটাও ছিল চমৎকার। বেড়াবার কথায় তিনি বলেছিলেন যে "চোখের মত বলিয়ে কইয়ে আর নেই। চোখ বক্তাও যেমন, তেমনি চোখ আবার শ্রোতাও চমৎকার। তার হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় কি? তার রসিকজন সুলভ জ্ঞান ও সময়োচিত ব্যবহার মনে রাখবার মত। আলোচনায় মেয়েদের কথা এসে পড়ে তিনি বলেছিলেন "মেয়েরা কাউকে মন দিয়ে চাইলেই চায়, না চাইলে কিছুতেই তাদের দিয়ে চাওয়ানো যায়না। এ বিষয়ে ভূয়োদর্শীর কথাটা ঠিকই—"কিন্তু না চাহলেও তারা "নাচাইতে" পারে, তার কোন ভুল নেই মশাই।" তাদের যাত্রাপথ মধুর হউক, সুখের হউক, এই প্রার্থনা করে তাদের আমরা বিদায় জানাই হরিদ্বার স্টেশনে। পরে শুনেছি তাদের জয়যাত্রার শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকা সত্বেও তাহারা পর্বতশৃঙ্গে উঠিতে সক্ষম হইয়া অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। কলকাতায় একাধিক স্থানে তাদের সম্বর্দ্ধনা জানান হয়েছে।

আমরা হরিদ্বারে প্রায় পাঁচদিন থাকতে বাধ্য হই—কেদার-বদরি যাত্রার প্রাক্কালে। কারণ, বর্ষার জন্য রাস্তায় কয়েক জায়গায় বিরাট বিরাট ধ্বস নেমে রাস্তা ভেঙ্গে পড়ে। "বুলডোজার" ও আরো নানাপ্রকার যন্ত্রদানবের সহায়তায় উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদল কর্তৃক রাস্তা পুনরায় নির্মিত হয় এবং তাহাদের অনুমতি পাবার পরেই সব বাস যাত্রা শুরু করে ঋষিকেশ থেকে কেদার-বদরির পথে। আমরা দুজনে ছিলাম "কুণ্ডু স্পেশাল" দলের যাত্রী, হরিদ্বার থেকে হরিদ্বার পর্যান্ত, আর বাকী সবাই গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে—আর তারা ঐ দলের সাথেই কলকাতা ফিরিবেন—পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে। কুণ্ডু কোম্পানীর ব্যবহার, আদরযত্ন, বিশেষ করে সারাপথে এবং ১১,০০০ ফিট উচু পাহাড়ে সময়মত গরম ও মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা,

আমাদের পরম আনন্দের কারণ। প্রত্যেকটি কর্মচারীই ধন্যবাদার্হ, বিশেষ করে উক্ত দলের ম্যানেজার শ্রীদেবী ব্যানার্জী! তিনি একাধারে "বজ্রাদপি গরীয়সি, মৃদুনি কুসুমাদপি"—কখনও তাহার ব্যবহার কুসুমের চেয়েও কোমল, আবার কার্য্যব্যপদেশে তিনি কখনও বজ্রের মতো কঠোর, শত অনুরোধেও কর্ত্তব্যে অচল অটল। তিনি একজন ওস্তাদ শিল্পীও বটে, যদিও মাত্র একদিনই তিনি আমাদের সবাইকে হিন্দী ও বাংলা গানে আপ্যায়িত করেছিলেন।

হরিদ্বারে মোট পাঁচদিনের মধ্যে দুদিন থাকি "বিদেশ-বিরাম ভবনে" (ফোয়ারার সন্নিকটে)—আর বাকী তিনদিন "ভোলাগিরি ধর্ম্মশালায়"। বেশ আনন্দেই ছিলাম ধর্মশালা ও বিদেশ-বিরাম ভবনে। উক্ত বিদেশ-বিরাম ভবনের দোতলার একখানা ঘরের দৈনিক ভাড়া ছিল ৬৲ টাকা মাত্র—দিনকাল বিবেচনায় উহা অস্থায়ী যাত্রীদের জন্য হয়তো খুব বেশী নয়। এখানেই "মা"এর দেখা পাই এবং এখান থেকে হরিদ্বার ফিরে আসা পর্য্যন্ত তিনি মাতৃবৎ আমাদের সাথেই ছিলেন। মনে করুন তার নাম শ্রীযুক্তা তুষারবাসিনী গাঙ্গুলী, ঠিকানা কেয়ার অব শ্রীঅমিয় কুমার গাঙ্গুলী, ৪।২।ডি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, মাণিকতলা, কলিকাতা-৬। মার গল্প (সত্যিকার কাহিনী) পরে বিস্তারিত বলবার আশা রইল। সত্যি কথা বলতে কি এখনও মনটা তার জন্য কেমন যেন করে। শ্রীমতী রমলা মিত্রের সাথেও এখানে পরিচিত হই। তিনি তার বড়জা ও দেবর ডাঃ মিত্রকে নিয়ে আমাদের সাথেই কেদার-বদরি ঘুরে এলেন। বিদেশের পথে এ রকম মিষ্টভাষী বৃদ্ধের দল সবাইর তৃপ্তিকর হয়। আর বিশেষ করে পাহাড়ের দুর্গম পথারোহণের সময়টা সুসংসর্গের গুণে কষ্টের পরিবর্ত্তে সুখের ভিতর দিয়ে সহজেই কেটে যায়। মিঃ এস্, এন্ মিত্র একজন অবসরপ্রাপ্ত "সিভিলিয়ান"। নিজ বাড়ীতে কলকাতায় থাকেন; ধরে নিন, ১।৬৮, গরচা ফার্ষ্ট লেন, কলকাতা-১০। শ্রীমতী মিত্রের ফিরবার দিন ও সময় তার কথামত আমিই পূর্বাহ্ণে টেলিফোনযোগে (কলকাতা ৪৬-৩০১২) জানাই মিঃ মিত্রকে

টেলিফোনে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তিনি একজন বিজ্ঞ, অমায়িক ও সদাশিব লোক।

চারিধামের মধ্যে শ্রেষ্ঠধাম—শ্রীবদরিধাম বলে কথিত আছে। অপরধামগুলি হল শ্রীজগন্নাথধাম, শ্রীরামেশ্বরধাম ও শ্রীদ্বারকাধাম। পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে এই ধামের যাত্রা হরিদ্বার তীর্থ হতে আরম্ভ হয়। হরিদ্বার হতে অগ্রসর হলে উত্তরাখণ্ডে (কেদারখণ্ডে) বদরিকাশ্রম, পঞ্চবদরি, পঞ্চকেদার, পঞ্চপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, জ্যোতীমঠ, (যোশীমঠ), ইত্যাদি তীর্থস্থান পড়ে। এই পুণ্যক্ষেত্রে বদরীতীর্থ সম্বন্ধে পুরাণের একটি কাহিনী বলব—একদিন নৈমিষারণ্যে আটষট্টি হাজার মুণি একত্রে সমবেত হয়ে শ্রীসুতকে জিজ্ঞাসা করলেন হে সুত, আপনি সম্যকভাবে পুরাণাদি জ্ঞাত আছেন। অতএব অনুগ্রহ করে আমাদিগকে বলুন, পৃথিবীতে এমন কোন্ তীর্থ আছে যেখানে মনোবাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। তখন সুতদেব উত্তরে বললেন হে শৌনকাদি ঋষিগণ, সর্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ বদরিনারায়ণ। এখানে শ্রীবদরিনারায়ণ ভগবান বাস করেন। এই তীর্থ-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চারিটিই প্রদান করেন। তিনি পরে এই তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে নন্দ প্রয়াগ হতে গরুড়গঙ্গা পর্য্যন্ত বদরিনারায়ণক্ষেত্র। আর গরুড়গঙ্গা হতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত সূক্ষ বদরিনারায়ণ ক্ষেত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে কুবেরশিলা পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ আর কুবেরশিলা হতে সরস্বতীগঙ্গা পর্য্যন্ত শুদ্ধ বদরিক্ষেত্র ; যার স্মরণমাত্রেই সব পাপ ক্ষয় হয়। সর্বধর্মরহিত ও শ্রীবদরিনারায়ণ দর্শন হলে মুক্তিলাভ করে। যে কেহ শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্বক বদারিনারায়ণ দর্শন করে সে জপতপ না করেও মোক্ষপ্রাপ্ত হয় এবং যদি কেহ গল্পচ্ছলেও বদরিনারায়ণের মহিমা বর্ণনা করে তবে তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় ; মহাপাতকীর ও পাপক্ষয় হয়। এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য এই দুর্গম সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গে আজও প্রচলিত রয়েছে। কেননা, অন্যান্য তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যতো রেলগাড়ি ও অন্যান্য আধুনিক যানবাহনাদি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অপহরণ করে নিয়েছে।

শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ এর পট (১১,২৪০) ফিট ও শ্রীশ্রীকেদারনাথের

পট (১১,৭৬০ ফিট) সাধারণতঃ মে মাসের মাঝামাঝি খোলে। কেবল কেদারনাথ হয়ে বদরিকাশ্রম যাত্রার নিমিত্ত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্য্যন্তই প্রশস্ত কারণ ইহার পরে শীত আরম্ভ হয়। তবে আজকাল বহুযাত্রী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় পর্য্যন্ত কেদারবদরি হয়ে অক্ষয়পুণ্য সংগ্রহণান্তে আপন আবাসে প্রত্যাগমন করে থাকেন। এই পুণ্যভূমি বা তপোবনের মানুষদেরই তীর্থনির্মানের প্রবৃত্তি প্রথমে উদ্ভূত হয়, পরে অন্যান্য দেশে প্রসারিত ও প্রচারিত হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেক জাতিরই আপন আপন পবিত্র তীর্থস্থান আছে। প্রত্যেক জাতিরই আপন আপন পবিত্র জাতীয় স্মারক আছে, যা ব্যক্তি বিশেষ, মহান আত্মা বা অবতার বিশেষের স্মৃতি বহন করে। ইহার অতিরিক্ত এই স্থানগুলির আপন আপন বিচার বুদ্ধি অনুসারে বা বিশ্বাসের বলে পৃথক পৃথক মহত্ত্বও আছে তাহা বৈজ্ঞানিক হোক কিম্বা আধ্যাত্মিক অথবা রাজনৈতিক হোকনা কেন ! আপনি জানেন, ভারত প্রাচীনকাল হতেই জগৎগুরুর আসনে আসীন রয়েছে এবং সমস্ত বিশ্বকে মানবিক উন্নতির পথ দেখিয়ে আসছে। ভারতকে শান্তির দূতও বলা হয়। বিশুদ্ধ আত্মার প্রেরণায় সমগ্র বিশ্বে শান্তির মনোরম সাম্রাজ্য স্থাপন করাই তার অভিপ্রেত। কিন্তু এই বিশুদ্ধ আত্মার প্রেরিত প্রাকৃতিক ও জাগতিক বিশেষত্বের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। শতাব্দীব্যাপি পরাধীন থাকবার পরে ও প্রাণীমাত্রের বিচার-বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটেনি। বর্ত্তমানে ভারত ধার্মিক দেশ বলে অভিহিত হয়। মানুষের মনই মানুষকে বন্ধনে জড়িত বা বন্ধন হতে মুক্তি প্রদান করে। শুদ্ধমনে ভগবানের নাম স্মরণ করে যাত্রা করা উচিত। উত্তরাখণ্ডের যাত্রা পদব্রজেই ভাল হয়। মোটরে কেবলমাত্র সাধারণ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হয়। কখনও বা পাহাড় ধ্বসে গিয়ে যাত্রীদের পথরোধ করে, তখন মোটরে যাতায়াত বন্ধ থাকে এবং ফলে এই মোটর যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ ঘটে থাকে। আবার কখনো কখনো মোটরে পাহাড়ে উঠবার সময় বমনাদি করে অনেকে শারিরিক কষ্ট পায়। তবে একথা ভুললে চলবেনা যে তাড়াতাড়ি করে আরামের সহিত তীর্থভ্রমণে মোটরই একমাত্র সহায় বা সারথি হলেও "গোলা-

পেরও কাঁটা আছে।" সাবধানে তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পদব্রজে পরিক্রমাই শ্রেয়ঃ।

হরিদ্বার থেকে ১৮২৷৷০ মাইল দূরে অলকনন্দার দক্ষিণতীরে শ্রী বদরিনারায়ণ অবস্থিত। বদরিকাশ্রম তীর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১,৫০০ ফিট উচু। এখানে কমবেশী প্রায় ৫০০ লোকের বসতি আছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম এখানে একটু বেশী। কেদার নাথের মত এখানে বেশী শীত নেই। শ্রী বদরিনারায়ণজীর মন্দির ৪৫ ফিট উচু—মন্দিরে শ্রী ভগবানের মূর্ত্তি, ডাইনে কুবের উদ্ধব, গনেশ ও গরুড় মূর্ত্তি, আর বামে নরনারায়ণ ও নারদ ঋষির মূর্ত্তি আছে। এখানকার পাণ্ডাদের ব্যবহার খুব ভাল, তারা অনেকেই পরিস্কার বাংলা বলেন ও যাত্রীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আমাদের পাণ্ডার নাম ছিল শ্রীধীরেন্দ্র ভট্টা—বেশ বলিষ্ঠ, বৃদ্ধ ও অমায়িক ভদ্রলোক।

হরিদ্বার থেকে ১৫৩ মাইল পায়ে হেঁটে কেদারনাথ যাওয়া যায়। বর্তমানে গুপ্তকাশী (৪, ৮৫০ ফিট উঁচু) পর্য্যন্ত বাসে/মোটরে আসতে হয় হৃষীকেশ থেকে, আর এখান থেকেই সত্যিকার তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ পদযাত্রা সুরু। যারা হাঁটতে পারেন না বা অন্যরকম চাহেন, তারা ঘোড়া, ডাণ্ডি বা কাণ্ডি ভাড়া করে এখান থেকে কেদারনাথ যাতায়াত করতে পারেন! সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১,৭০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বত শিখরে এই তীর্থস্থান। বৎসরে প্রায় ছয়মাস এখানে বরফ পড়ে। প্রতি বৎসরে এপ্রিল মাসে এই তীর্থযাত্রা সুরু হয়।

শুনেছি যে অন্ধের একদরজা বন্ধ হলে দশদরজা খুলে যায়, বোবার একমুখ বন্ধ হলে দশ আঙ্গুল তার ভাষা তর্জ্জমা করে দেয়। আমার যদি সব দরজা বন্ধ হয়ে মাত্র একটী খুলে যায় তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সে দরজা দিয়ে বের হয়ে আমি কোথায় গিয়ে পৌছব তার খবর ও আমি জানতে চাইনে। যে রচনা লিখতে বসেছি বোধহয় তার থেকে অনেকদূরে চলে এসেছি। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাও অসম্ভব নয়—সরস, মনোজ্ঞ ও সুসাহিত্যের অভাবে। যাক, এবার হরিদ্বার থেকে সত্যিকার কেদার-বদরি যাত্রা সুরু করি।

বৈকাল ৪।৪০ মিঃ (তাং ইং ১৩।৯) ট্রেনযোগে হরিদ্বার থেকে রওনা হই (কুম্ভ স্পেশাল) হৃষীকেশ অভিমুখে। হরিদ্বার ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই দুইটী "টানেল" (সুরঙ্গপথ) এর মধ্যেদিয়ে গাড়ী হুহু শব্দে পার হয়ে যায়। আমরা সবাই যথাসম্ভব মুখ বের করে সূর্য্যাস্তের মনোরম দৃশ্যের প্রতি তাকিয়ে থাকি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হৃষীকেশ পেঁছাই। ছোটখাট বাজার করি আমরা—প্রস্তুতি-পর্ব্ব—বদরির পথে। বিশেষ ধরনের দুটী লাঠি সংগ্রহ করি নগদ দক্ষিণা ৩।।০। টাকায় হৃষীকেশে অতিরিক্ত সব মালপত্র কুম্ভ স্পেশালের গাড়ীতে রেখে আমরা পরদিন অর্থাৎ ১৪।৯ তারিখে চা-পানের পর রওনা হই গুপ্তকাশী (৪,৮৫০ ফিট) বা আরো এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। পথে লছমনঝুলায় (১,১০০ ফিট) প্রাতরাশ সমাপনান্তে আমরা পুনরায় যাত্রা সুরু করি ১২-৩০ মিঃ। এখানেই বিখ্যাত উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপর লছমনঝুলার ঝুলন্ত সেতু অবস্থিত (১৩০ ফুট স্পান)। পথে শিবপুরী সেতু (গঙ্গা ও পান-গঙ্গার সঙ্গমস্থল), ব্যাসচটি ছেড়ে পৌছাই দেবপ্রয়াগে প্রায় ২-৩০ মিঃ (১,৫৫০ ফিট) —এখানে ভাগিরথী ও অলকা—নন্দার সঙ্গমস্থল। এখান হতেই ভাগিরথী গঙ্গা নামে আখ্যাত হয়। যাত্রীরা এখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করে পুণ্য-অর্জ্জন করেন। রঘুবীরের শ্যামবর্ণ বিশাল মূর্ত্তি এখানে বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। স্থানটীও অতীব মনোরম। নিকটেই পর পর তিনটী ঝুলন্ত সেতু। বাবা কালীকমলীর একটী বড় ধর্ম্মশালাও আছে এখানে। চারদিকে মনোহর হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেনী ও নিম্নে মালার মত প্রবাহিত গঙ্গা এই শোভাকে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করে। বৈকাল ৪-১৫ মিঃ শ্রীনগর—একটি ছোট সহর বলা চলে। অনতিবিলম্বে বাসথেকে অবরোহন করে দলবলসহ রাত্রিবাস করি এখানকার "টুরিষ্ট বাংলোতে"। এখানে সরকারী হাইস্কুল, হাঁসপাতাল, ডাক-তার আফিস ও দৈনিক বাজার আছে—আর আছে গঙ্গার ধারেই সত্যনারায়ণের মন্দির ও কালীকমলীর ধর্মশালা।

১৫ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) প্রাতে ৭-১৫ মিঃ বাস ছাড়ে শ্রীনগর —৯ টায় পৌছাই রুদ্রপ্রয়াগ (২,000 ফিট)—এখানে অলকানন্দা ও

মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। এখানে ডাক-তার আফিস ও একটি ভাল ধর্মশালা আছে, যেখানে সহস্রাধিক যাত্রী থাকতে পারে। হৃষীকেশের মত এখানে ও পরে বেলা কুচিতে ডাক্তারী সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেখাতে হয়। পথ চলেছে একেঁ-বেঁকে চড়াই উৎরাই। কয়েকটা ছোট পাহাড়িয়া নদী যেন কুলুকুলু নাদে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে রত—সর্ব্বদাই মুখর এই তপোভূমি—সেই একই ভাবে—ভাব গম্ভীর সুরে। ত্রিবেণীতে হিলং সেতু (১৩২ ফিট স্পান) হয়ে যোশীমঠে পৌঁছাই সন্ধ্যার পূর্ব্বে। চক্ষু সার্থক এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যে—সুউচ্চ শিখররাজি ছেয়ে আছে চারিদিকে—অপরূপ সে শোভা—অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় সন্দেহ নেই। এই যোশীমঠে (৪,৩০০ ফিট) ওঙ্কারেশ্বর শিবের একটী সুন্দর অতি পুরাতন মন্দির আছে—পথে একটী "পাণিচাকি" (গম ও অন্যান্য শস্য ভেঙ্গে তৈরী করার জন্য হাওয়া চালিত স্বয়ং সম্পূর্ণ একটী ছোট যন্ত্র বিশেষ) দেখলাম। বাৎসরিক ১২ টাকা লাইসেন্স ফিস দিয়ে একজন গ্রামবাসী ঐ স্থানের রক্ষক হয়েছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে কেহ নিজ ইচ্ছামত সময়ে এসে ঐ পানিচাকিতে গম বা অন্য শস্য ভেঙ্গে নিতে পারেন—মজুরী বা খাজনা বাবদ ঐ ঘরের ভিতরে রক্ষিত শূন্যপাত্রে দশভাগের একভাগ জমা রেখে আসতে হয়। মালিক বা রক্ষক তার সুবিধামত সময়ে উহা সংগ্রহ করে নিবেন। এখানে সবাই সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য সন্দেহ নেই! পথের পাশে কয়েকটী খেজুরগাছ দেখলাম—পরিচিত গাছ বড় কম। রসাল খেজুরগাছ কিন্তু নীরস পাথর থেকে সদাই শোষনরত! চারিদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড় চূড়া, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন ভুলে যায় সব ফেলে আসা দিনগুলির কথা —আর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। অলকানন্দার উপল সমাকীর্ণ ফেনিলধারা যেন মনটাকে ধুয়েমুছে ধর্ম্মাশ্রয়ে শ্বেতশুভ্র অবস্থায় ভগবানের চরণে নিবেদন করার জন্য তৈরী করে তোলে। আমাদের এই হিন্দুধর্ম্ম সত্যই মহান, সার্ব্বভৌমিক। সার্ব্বজনীন আদর্শ আছে এর অনুপরমাণুতে। এর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় সূত্র আবিস্কার করা একটুও কঠিন নয়। তবে

দৃষ্টিশক্তির অভাবে ধর্মই ঈশ্বর ভ্রমে সৃষ্টি করে প্রমাদের। কিন্তু ধর্মতো ঈশ্বর নয়। ধর্ম একটা পথ, তাতে চলে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। মন জাল বুনে চলে অন্তহীন ভাবে..............প্রত্যক্ষ ছেড়ে কি অপ্রত্যক্ষের দিকে ধাওয়া ঠিক ? পরমকে ছেড়ে কি চরমকে ধরা সঙ্গত ? রবীন্দ্রনাথের সাথে ঠাকুর রামকৃষ্ণও একমত হয়ে বলেছেন, "দুঃখে দুঃখেই মানুষ মহত্ত্বের দিকে এগিয়ে যায়। এই দুঃখের মুক্ত আকাশেই শুনতে পাওয়া যায় অজানার সুর।" অনেকে মনে করেন এই দুঃখের জন্যই বোধহয় জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য" বলতেন, কিন্তু তা বোধহয় নয়। শঙ্করের "ব্রহ্ম-সত্য জগৎ মিথ্যা" জ্ঞানের দিক থেকে, অনুভূতির দিক থেকে নয়। জ্ঞানের শেষ পর্য্যায় নির্বিকল্প সমাধি। সেখানে পৌছালে জগৎও ব্রহ্মে পার্থক্য দৃষ্ট হয়না। কিন্তু যতক্ষণ না সে জ্ঞান জন্মায়, ততক্ষণ জগৎ ও ব্রহ্ম পৃথক ও সত্য। আবার রামকৃষ্ণ বলেছেন দেহধর্ম ও আত্মধর্ম অভেদ ; জগৎ ব্রহ্ম অভেদ। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন, বরফের মধ্যে যেমন জল, সমুদ্রের মধ্যে গতি—দুইই সমান গৌরবের, কেউ ছোট নয়, কাউকেই কোনঠাসা করা যায়না।

যোশীমঠের কথা বলতে বলতে অনেক দূরে এসেছি—পাগল মনটা সব সময় বাঁধন মানেনা যেন। যোশীমঠ থেকে বাসে চড়ে দলের সঙ্গে সকাল ৭-১৫ মিঃ রওনা হই। পথে পঞ্চশৃঙ্গ পাণ্ডবেশ্বর (৬,০০০ ফিট), বিষ্ণুপ্রয়াগ (পঞ্চম ও অন্তিম প্রয়াগ), (১.৬২০ ফিট), নং ১৬২২ পাইওনীয়র কোম্পানীর কর্ম্মীরা প্রশংসনীয় ভাবে রাস্তা মেরামতে কর্ম্মরত, আরো কত কি দেখতে দেখতে শ্রীবদরিনাথে পৌঁছলাম (১১,৫০০ ফিট)। বাস থেকে নেমে অল্প উৎরাই পথ গিয়ে অলকানন্দার উপরের মনোরম সেতু পার হয়ে আমরা "বাকু-লিয়া হাউস" এ পৌঁছলাম—আমাদের কয়েকদিনের আনন্দদায়ক বিশ্রামস্থল। এখানে একটী ছোটখাট বাজার, অনেক বাসোপযোগী বাড়ী ও ধর্ম্মশালা আছে। এখানে ডাক-তার ঘর, হাঁসপাতাল ও ইনস্পেকশন বাংলো আছে। সর্বোপরি যাহার দর্শনের জন্য যাত্রীগণ অনন্ত কষ্ট স্বীকার করে এখানে আসেন, সেই বদরী বিশালজীর

প্রাচীন স্বর্ণমন্দির আছে। এই মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ৪৫ ফিট উঁচু মুখ্যদ্বার আছে। মন্দিরের মধ্যে ভগবান শ্রীবদরিনারায়ণের দর্শনলাভ করে প্রাণীমাত্রই কৃতকৃতার্থ হয়ে থাকে। চলুন, আমরাও শ্রীবদরী বিশালের দর্শনলাভ করি।

মন্দিরের সম্মুখভাগে শ্রীবদরী বিশালের (কৃষ্ণপ্রস্তরের) বহুমূল্য বস্ত্রাভরণযুক্ত, বিচিত্র মুকুট শোভিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আছে। সেই শ্যামল সুন্দর শরীরে বহু রত্নজড়িত অলঙ্কার ও ললাটে একটী দ্যুতিময় হীরা কি সুন্দরই না লাগে দেখতে। দক্ষিণ দিকে শ্রীকুবের ও শ্রীগণেশের মূর্ত্তি আছে। বামে শ্রীলক্ষ্মী ও নরনারায়ণের মূর্ত্তি আছে। এই মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গম্বুজওলা লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে, পাশেই ভাণ্ডারগৃহ—যেখানে ভগবানের ভোগের জন্য প্রত্যহ অন্নপাক করা হয়। পূর্ব্বদিকের ময়দানে গরুড় ভগবানের পাষাণমূর্ত্তি আছে। শ্রীবদরীনাথজীর মন্দিরের সামনে ৬৫ সিড়ি নীচে নেমে ১৫ হাত লম্বা ও ১২ হাত চওড়া তপ্তকুণ্ড আছে। এখানে সকল সময় গরমজল নির্গত হয়। সন্নিকটে পঞ্চশিলা বিদ্যমান—নারদশিলা, নৃসিংহশিলা, বরাহশিলা, গরুড়শিলা ও কুবেরশিলা। নারদশিলার নিকটে নারদকুণ্ড আছে। আর আছে ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড ও গৌরীকুণ্ড। মন্দিরের প্রায় ৪০০ গজ উত্তরে অলকানন্দার দক্ষিণতটে ব্রহ্মকপালি নামক শিলাখণ্ড আছে—যাত্রীরা এখানে এসে পিণ্ডদান করেন। আজকাল মন্দিরে প্রবন্ধের ভার উত্তর প্রদেশ সরকারের। যাহার ইচ্ছা আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভেট (আটকেঁ) লিখে দিয়ে পরের দিন বেলা ১২টার মধ্যে ভোগ নিতে পারেন। মন্দির খোলা সকাল ৬—১২টা এবং বিকাল ৪—৮।৩০ মিঃ পর্য্যন্ত। পাণ্ডারা বেশ মিষ্টভাষী ও সজ্জন—কোন গোলমাল করেনা।

আমাদের পথে পাওয়া "মা" ১৬ই সেপ্টেম্বর (শনিবার প্রাতে) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাঃ ঘোষ (নাতি) ডাঃ মিত্র কয়েকবার তাকে দেখাশুনা করে উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করেন। তার ছেলেরা কি করে একা-তাকে "কুণ্ডুস্পেশালের" সাথে ছেড়ে দিল তা অনেকের গবেষণার বিষয় হয়েছিল সেদিন। বুড়ীমার জামাকাপড় ঠিক থাকেনা,

ভুলকথা বলেন, কখনও শুধুই কাঁদেন—সে এক অদ্ভুত অবস্থা। যাহোক, আমাদের সমবেত চেষ্টায় ২।৩ দিনের মধ্যেই তিনি অনেকটা ভাল হয়ে গেলেন। ওখানে ছোট দোতলা বা তেতলা বাড়ীর অভাব নেই, কিন্তু একটা বিশেষত্ব এই যে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীরই ছাদ পাথরের শ্লেটে তৈরী। মজুরেরা খুব বিশ্বাসী, কিন্তু মজুরানা তদপেক্ষা অনেক বেশী। এদিন বৈকালে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় শীত বেশ জমকালো মনে হয়—মন্দির দর্শন শেষে সকাল সকাল আমরা নৈশভোজন সমাপনান্তে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। পরদিন প্রাতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান পূজা সমাপন করে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের পূজা দেই—মন্দির প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য ঠাকুর দর্শন করে বাড়ী এসে নৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতে ব্যস্ত হই।

মৌনীবাবার নাম শুনে আমরা দুজনে তার আশ্রমে যাই বদরীনাথের মূলমন্দির থেকে প্রায় একমাইল চড়াই পাহাড়িয়া "চারবাট" (পায়েচলার রাস্তা)। তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে রন্ধন করে প্রত্যেক দর্শনার্থীকে খাইয়ে দেন, ডাল-ভাত/ডাল-রুটী ও শাকশব্জী, চাটনীতো আছেই। অতিথি আপ্যায়ণের পরে নিজে সামান্য কিছু গ্রহণ করেন। প্রত্যহ আনুমানিক ৩০/৪০ জন যাত্রীকে তিনি ভোজনে আপ্যায়িত করেন। কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা তাঁর সঙ্গেই থাকেন, ভিন্ন ঝুপড়িতে। পরিবেশ ও ব্যবহার চমৎকার সন্দেহ নেই।

শীতের ঋতু অথচ শীত নেই মনে হয়। প্রাকৃতিক জীবনের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আমরা অভ্যস্ত কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এখানে সদাই শীতঋতু বিরাজমান, শুধু তীব্রতা কখনও কম বা বেশী মাত্র। বেশভূষা ও অলঙ্কারের পারিপাট্যে এখানকার স্ত্রীলোকেরা একটু অনন্যসাধারণ। বিশেষ করে অদ্ভুত অলঙ্কারাদি ব্যবহারে ইহারা অভ্যস্ত। বয়স নির্বিশেষে প্রায় সবাই নাকের ডগায় বিরাট বড় আংটির মত স্বর্ণবলয় পরে থাকেন; আমাদের পাণ্ডার ছড়িদারের নিকট অনুসন্ধানে জানলাম যে ললনাকুল খাবার সময়ে এবং রাত্রে সাধারণতঃ উহা নাসিকা মুক্ত করে রাখে এবং প্রতিদিনই প্রাতে বা বাহিরে যাবার প্রাক্কালে পুনরায় তাহা নাসিকা

সংলগ্ন করে। বদরিনাথ থাকাকালীন কয়েকদিনই গোলাগুলির আওয়াজ পাই, সভয়ে সময়ে ও অসময়ে। কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পারি যে উহা চীনাদের গোলমালের নমুনা। চীনাদের আগ্রাসী মনোভাবের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা প্রচ্ছন্ন আছে অন্তরের অন্তস্থলে। আমি দারজিলিং, কারশিয়াং কালিম্পিং, সিমলা, পহেলগাঁও, শ্রীনগর ইত্যাদি স্থানের হিমালয়ের কোলের আদিবাসীর সাথে বেশ খানিকটা মেলামেশা করবার অবকাশ পেয়েছি কয়েকবার। তাতে বুঝেছি হিমালয়ের মানুষ অবস্থায় দরিদ্র হলেও দেশপ্রেমে অটল। তারা কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও, দারিদ্রে জর্জ্জর হলেও দেশকে কিন্তু গভীরভাবে ভালবাসে। মনেপ্রাণে তারা বিশ্বাস করে প্রত্যেকেরই উপযুক্ত নাগরিক হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য ; আর উপযুক্ত নাগরিক হতে হলে বিদ্যা, বিনয়, বীরত্ব, সাহসিকতা, মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পারদর্শী হতে হবে। চীনের আগ্রাসী আচরণে তারা ভীত নয়, দেশপ্রেম তাদের জীবনধারণের সাথে একান্তভাবেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এখানে সুমেরু ও কুমেরুর মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্বে ও পশ্চিমে নরনারায়ণ ও নীলকণ্ঠ পর্বত। প্রায় সমস্তটাই তার সাদা বরফে ঢাকা। সকাল সন্ধ্যায় অপরূপ শোভা ধারণ করে এই শৃঙ্গদ্বয়, অপূর্ব ও অনির্বচনীয় বলিলেও যেন কম বলা হয়। এই নীলকণ্ঠ জয়ের চেষ্টা হয়েছিল দুবৎসর আগেও কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে শেষ মুহূর্তে তাহা অকৃতকার্য্যতায় পর্য্যবসিত হয়। কি মনোরম শোভা ধারণ করে এই অজেয় চিরতুষারমৌলি, চোখে না দেখলে তাহা সম্যকভাবে বোঝা যায় না, ধারণা করা যায় না। যেমন শীত, তেমন ঠাণ্ডা, তবুও অতীব মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। বৈকালে আমরা পুনরায় বদরীবিশালের মন্দিরে যাই—সেখান থেকে মানা, বদরীনাথ ডাক—তার আফিস হয়ে বাড়ি ফিরি। মঙ্গলবার প্রাতে (১৯/৯) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে ঠাকুর দর্শনে যাই, পাণ্ডা শ্রীধীরেন ভট্টাকে দর্শনী ও প্রণামী যাহাই বলুন, দিয়ে শান্তি-আশীর্ব্বাদ

(সুফল) গ্রহণ করি এবং ৮-৩০ মিঃ বাসযোগে আবার রওনা হই সেই গুপ্ত-কাশীর উদ্দেশ্যে। জয় বদরী বিশালকি জয়!

বিষ্ণুপ্রয়াগ ছাড়িয়ে আমরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে (বাস নং U P Y-1141) যোশীমঠে পৌঁছাই বেলা ১টার সময়ে। শঙ্করাচার্য্যের তৈরী চারিটি মঠের অন্যতম এই যোশীমঠ (জ্যোতির্মঠ)। অন্যগুলি হল শৃঙ্গেরিমঠ (মহীশূর), গোবিন্দধামমঠ (পুরী) ও সুখীমঠ (উখীমঠ) ৪,৩০০ ফিট। এই যোশীমঠ একটি বিখ্যাত মক্ষিপালন কেন্দ্র (Honey Centre)। ভোজনপর্ব সম্পন্ন করে যোশীমঠ থেকে ৩-৪৫ মিঃ রওনা হই অন্যবাসে চড়ে (U P Y-901) পিপলকোটি পেঁছাই বৈকাল পাঁচটার সময়ে। দোতলা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় সেই রাত্রির জন্য। বুধবার ২০/৯ তারিখে খুব ভোরে রওনা হই, পথে চামৌলিতে প্রাতরাশ ৬ ৩০ মিঃ। চামৌলি একটি বড় সহর, সবকিছু পাওয়া যায় এখানে, হোটেল, রেস্তোরা ও ধর্ম্মশালা আছে। প্রাকৃতিত দৃশ্য ও মনে আনে অপার আনন্দ।

পাহাড়িয়া নদী, ঝরণা যোগায় জল।
অবিরাম গতি, শব্দ কল—কল ॥

কর্ণপ্রয়াগ, গোচর (সত্যি বহু গরুছাগল চড়তে দেখলাম এখানে) হয়ে মন্দাকিনী তীরে রুদ্রপ্রয়াগে বাস থামে—চা পানের বিরতি। এখান থেকে শ্রীশ্রী কেদারনাথ (১১,৭৬০ ফিট), গুপ্তকাশী (৪,৮৫০ ফিট) ও অগস্ত্যমুনি (২,৫00 ফিট) যাবার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা আছে। গুপ্তকাশীতে পৌঁছাই বেলা ৩-১৫ মিনিটে। চা-পান অন্তে বিশ্রাম আর অল্পপরেই কুণ্ডের শীতল জলেই স্নানাদি সেরে মন্দির দর্শনে বের হই। রাত্রে দোতলা যাত্রীনিবাসে বিশ্রামের নামে বসে কাটাই——ছারপোকার অত্যাচারে—ইংরেজীতে বলে "বাগ" (Bug)—সত্যিই আমরা এই রক্তখেকো ক্ষুদ্রাকার ভীষণ জীবের কথা কোনদিন ভুলতে পারবনা।

বৃহস্পতিবার প্রাতে (ইং ২১শে সেপ্টেম্বর) আমরা ৭।৮ জন পদব্রজে গুপ্তকাশী থেকে "ফাটা" রওনা হই, নালা, মাইখাণ্ডা চটি হয়ে। এই আটমাইল পথ শেষে ফাটা পৌঁছাই ১২-৩০ মিনিটে।

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার যাত্রাসুরু, রামপুর চটি পৌঁছাই ৬-৩০ মিঃ। পরেরদিন শুক্রবার সকাল ৭ টায় রওনা দিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ (৭,০০০ ফিট) পেঁছাই বেলা ১০-৩০ মিঃ। পথে দুজায়গায় ২টী পানিচাকি দেখলাম—সমস্ত পাকদণ্ডি পথটাই প্রায় চড়াই। হাঁটাপথে পথশ্রম লাঘব করবে জন্য ঔষধ হল, দুধ, জল, টফি, লজেন্স, আমসত্ব, কাজুবাদাম, ইত্যাদি, যা যা আমরা আনন্দের সাথে গ্রহণ ও বিতরণ করেছি। এই ত্রিযুগীনারায়ণ হতে কেদারনাথ মাত্র ১৩ মাইল দূর; জায়গাটা অতি মনোরম ও বেশ ঠাণ্ডা! এখানে নারায়ণের নাভি হতে জল নির্গত হয়ে বাইরে কুণ্ডে গিয়ে পড়ে। এস্থান অতি পবিত্র—কথিত আছে এখানে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ হয়েছিল—তাদের বিবাহকাল হতে একটী ধুনি এখনও এখানে প্রজ্বলিত আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও সরস্বতী নামে চারিটী কুণ্ড আছে—কোনটীতে স্নান, কোনটীতে তর্পন, আর কোনটীতে জলপান করা হয়। সরস্বতী কুণ্ডের ভিতরে স্বর্ণবর্ণ কয়েকটী ছোট ছোট সাপ অছে; অবশ্য উহাদের কাছ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। এখান হতে গৌরীকুণ্ড প্রায় ছয়মাইল। এখানে ডাক-বাংলো, যাত্রীনিবাস, ডাকঘর সবই আছে। আর আছে তপ্তকুণ্ড—যেখানে স্নানকরে শরীর ও মনের সব ক্লেদ গ্লানি দূর হয়ে প্রাণে এনে দেয় একটা সুন্দর সুষমা-মণ্ডিত শুভ্র আনন্দজ্যোতি। কলনাদিনী পুন্যশীলা স্রোতস্বতীর পাশে দ্বিতল যাত্রনিবাসটী ও বড় মনোরম—পরিবশেও চমৎকার। শুভ্রজ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রে যেন একটী অন্যরকম আবেশে মনে দোলা দেয়, ঐশ্বরিক অনুভূতি—একটা পুলকের শিহরণ জাগে মনে প্রাণে, সে আনন্দ লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায়না। গৌরীকুণ্ডে রাত্রিবাস করে পথশ্রম অপনোদন করি। এখানে নূতন উন্মাদনা পাই এই আশ্চর্য্য পরিবেশে। আবার পরদিন প্রাতে (শনিবার, ২৩।৯) যথাপূর্ব্বম্ সুরু করি পদব্রজে সঙ্গীর ছোট ৮।৯ জনের দলটী সহ—(১) মিসেস মিত্র, (সিনিয়র) ওরফে দিদি, (২-৩) আমরা দুজনে, (৪) মিঃ কমল বোস, (৫) ডাঃ ঘোষ (ওরফে ডাঃ), (৬) মিঃ দাশ, এবং আরো তিনজন ছিলেন দলে যারা ক্রমে ক্রমে রাস্তার কষ্ট সহ্য

করতে না পেরে দলত্যাগ করে অশ্বারোহণে বড়দলের সাথে অগ্রসর হল। এখানে আমার মিসেস পায়ে একটি হোঁচট খেয়ে বুড়ো আঙ্গুলের নখটি জখম করেন, তদুপরি কয়দিন যাবত শারিরীক ক্লেশের সাথে আবার সেই পুরাণো "অর্শ" রোগ জনিত রক্তস্রাব দেখা দেয়। ফলে মানসিক বিপ্লবও যথেষ্ট ঘটেছে এবং আমিই তার একমাত্র লক্ষ্যস্থল হলাম—মনমেজাজ ভাল না থাকলে যাহা হয় আর কি! কিন্তু এই বহু প্রত্যাশিত দিনটী আগতপ্রায়—কেদারনাথ পৌছিব আজ আমরা—কি আনন্দ। পথে জঙ্গলচটি (৮০০০ ফিট) কাঠের পুলের পাশে প্রখ্যাত প্রস্রবণ, আর তারি পাশে সারি সারি সূর্য্যমুখী ফুলের ঝোপ—অপূর্ব্ব দৃশ্য বটে। ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে ভিন্নতর গাছ—সবুজ, পীত ও নানা বর্ণের সমারোহ। অদ্ভুত মহীরুহ আছে পথে যার সব পাতাই বড় পানপাতার ন্যায়। গাছ সবুজ, আর নীচে ঝরে পড়ে আছে বৃন্তচ্যুত হয়ে বৃদ্ধাবস্থায় ঘন রক্তবর্ণ এই পত্রনিচয়।

যখন তখন মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা দেখে সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। ছোট্ট একটুকরো রোদ আর চারিদিকে ঘন কুয়াশা বেশ মজার নয় কি? পথে পড়ে রামওয়ারা, গরুড় চটি (১১,০০০ ফিট)—যেখানে চায়ের নামে দুধ খেয়ে আমরা পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করবার চেষ্টা করি। ওখানে পঞ্চধারা প্রবাহমান দেখলাম—মনে প্রাণে আসে আনন্দের জোয়ার! ঐ যে অদূরে কেদারনাথ, সুউচ্চ দুগ্ধফেননিভ গিরিশৃঙ্গ ও তারই কোলে শ্রীশ্রীকেদারনাথজীর মন্দির। কল্লাদিনী মন্দাকিনীর কোলে কেদারনাথে (১১,৭০০ ফিট) পৌছাই বৈকাল ৪-১৫ মিঃ। তীর্থবাসের জন্য নেপাল ভবনে আশ্রয় নেই। মন্দিরের নিকটে বেশ বড় একতলা বাড়ী, সামনে খোলা বিরাট বারান্দা, উঠান, পিছনে পৃথক রান্নাঘর, পায়খানা ও চাকর-মজুরদের ঘর এবং প্রকাণ্ড জলের কুয়া। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও চা পানের পরে কেদার সন্দর্শনে যাই—আরতি প্রত্যক্ষ করি সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। কথিত আছে এই প্রাচীন কেদারনাথের মন্দির পাণ্ডাদের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরে পূজা

দিয়ে শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করতে হয়। ভগবান শ্রীকেদারনাথজীর বিগ্রহ শিবলিঙ্গের মত নহে। বরং শ্যামবর্ণের বিশাল শিলাসদৃশ, বেশ লম্বা-চওড়া। পুরাণ শাস্ত্রানুযায়ী কেদার মহিষের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, দ্বিতীয় কেদার (মধ্য মহেশ্বর), গাভির আকারে তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ এবং কল্পেশ্বরে তাঁর জটা প্রক্ষিপ্ত রয়েছে ইহাই পঞ্চকেদার বলে উক্ত হয়। ইহার সহিত নেপালে শ্রীপশুপতিনাথে মস্তক বর্ত্তমান আছে। এখানে বদরিকাশ্রম থেকে শীত অনেক বেশী, ডাক-তার অফিস আছে। বোধহয় অনেক যাত্রী রাত্রে এখানে না থেকে দর্শন ও পূজা সমাপনান্তে নীচে রামওয়ারা চটীতে বা আরো নীচে অন্য চটীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কারণ দ্বিবিধ= (১) অতিরিক্ত শীতকষ্ট ও (২) অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য শ্বাসকষ্ট ও আনুষঙ্গিক অসুস্থতা। আমাদের দলেরও দুজন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রাত্রে—"কোরামাইন" সেবন ও ইনজেকসনাদি দ্বারা তাদের সুস্থ করান হয়। স্কন্দপুরাণে শ্রীশঙ্কর ভগবান বলেছেন যে বদরীক্ষেত্রের অন্তর্গত শ্রীশ্রীকেদাররূপী মহালিঙ্গের ভক্তিভাবে দর্শন-স্পর্শন ও পূজন করলে কোটিজন্মের পাপ ধৌত হয়ে যায়—তার আর পুনর্জন্ম হয়না। পদযাত্রার সাথী মিঃ কমল বোস (জামসেদপুর) এখানে আমাদের কয়েকখানি ফটো তোলেন তার নিজ ক্যামেরায়। কেদারের মন্দির পিছনে রেখে ছবিগুলি অপরূপ হবে সন্দেহ নেই। মিঃ বোসের মত এমন রসজ্ঞ, সদালাপী বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা—আমরা মিঃ ও মিসেস বোসের দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা করি।

স্বর্গের কাছাকাছি এসে মনে হয়ে যেন মানুষের আদিম প্রবৃত্তি-সব (ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ইত্যাদি) আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমি কয়েকজন প্রাজ্ঞ লোকের সাথেও এবিষয়ে আলোচনা করেছি--তারাও আমার সাথে একমত। এজন্যই বোধকরি পুরাকাল থেকেই সংসারে বৈরাগ্য এলে জ্ঞানবৃদ্ধেরা সংসারের মায়া ত্যাগ করে কোন নিভৃত সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরে গিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করতেন বা তীর্থপরিক্রমায় বাহির হতেন

পারমার্থিক উন্নতির সোপানে আরোহণের চেষ্টায়। সুউচ্চে অবস্থান কালে শুধুই যে আদিম প্রবৃত্তিগুলি অন্তরে নীচস্থ হয় তাহা নয়, কোমল অন্তর্মুখী সাধুপ্রবৃত্তিগুলি সেইসঙ্গে বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে তুঙ্গে আরোহণ করে মনকে এক অপার আনন্দে ডুবিয়ে দেয়---যেন স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ভগবানে আত্মনিবেদনে অগ্রসর হয়। সত্যি, পরিবেশ ও ইন্দ্রিয়াদি তখনই সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে মনকে। মন চিন্তার জাল বুনে এগিয়ে যায়, অনিত্য সংসারের কথা, মায়া-স্নেহ, ধর্ম্ম-পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে কত কথাই মনে আসে। আমরা গৃহী আমায় মুক্তির জন্য কি করেছি বা করছি ভেবে মন ব্যাকুল হয়। শুনেছি গৃহী বা সন্ন্যাসী যে কোন অবস্থাতেই মানুষ দেবতা হতে পারে --যদি সংযম, ত্যাগ ও ভক্তি দিয়ে মনকে অনাসক্ত করা যায়। এই মনই সব, মনেই পাপ, মনেই পুণ্য। মনেই জগৎ সত্য, আবার জগৎ মায়া। মন একবার ব্রহ্মময় হয়ে গেলে আর সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়না, যেমন ধান পুঁতলে গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পুঁতলে আর গাছ হয়না।

সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীর সাধক মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, এসংসারের বোঝা ঘাড়ে করেও ভগবানের পানে চেয়ে থাকে। অর্থ জীবনে অনেক পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ আনতে পারে কিন্তু সামান্য স্বাচ্ছন্দ সব পাওয়ার স্বাচ্ছন্দকে যেন ভুলিয়ে না রাখে। যদিও সাধারণতঃ সাধুরা কামিনী-কাঞ্চনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিন্তু তাদের স্বীকার করেছেন---অস্বীকার করেছেন তাদের প্রতি আসক্তি। আসক্তি রোধ করার জন্য তিনি বলেছেন, "আত্মার সহিত রমণ কর, যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর কর ক্রোধ, আর তাঁকে পাবার কর লোভ। আমার আমার যদি করতেই হয়, তবে তাঁকে লয়ে কর, যেমন আমার কৃষ্ণ, আমার রাম, আমার গোপাল। যদি অহংকার করতে হয় তবে বিভীষণের মত বল আমি রামকে—পরম সত্যকে প্রণাম করেছি, এমাথা আর কারও কাছে অবনত করবনা।" মিলনের চেয়ে

বড় মুক্তি—পরম সত্যকে পেতে হলে পরম ত্যাগের প্রয়োজন। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; আপনারাও জানেন। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক নহে। সম্ভোগের মধ্যে আবদ্ধ দৃষ্টি ভোগের ক্ষুদ্র আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ করেনা। অল্প পরিসর দৃষ্টি নিয়ে অর্দ্ধেক সত্য অনেক সময় মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে।

পাশ্চাত্যে নারী ভোগ্যা, মনোহরণে নিয়োজিতা, পোষাকে, আচারে ও ব্যবহারে। এখানে নারী মনোহারিণী, ইষ্টসাধনেব নায়িকা। ইষ্ট অর্থ মোক্ষ, সংযম ব্যতীত যাহা সম্ভব নয়। সংযম ও ভোগ বিচ্ছিন্ন নয়। ভোগের মধ্যেই সংযমের প্রস্তুতি, তবে সে বোধ কখন আসে? সাধারণতঃ গার্হস্থ, বাণপ্রস্থের পরে, কখনও বা যৌবনের অরুণ আলোব সঙ্গে সঙ্গে—যাদের দ্বারা ভগবান লোকশিক্ষা দিতে চান, তাদেব অবশ্য সংসার ত্যাগ কবা দরকার, ধ্যানে ও অনুভূতিতে সত্য উপলব্ধি করে তা বিতরণ করার জন্য। শুধু ভিতরে ত্যাগ করলেই হবেনা বাইরেও ত্যাগ চাই। তাহা না হলে লোকে মনে করবে যে যদিও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে কিন্তু ভিতরে ভিতরে এসব ভোগ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নারীদের মধ্যে আজ মাতৃত্বেব প্রভাব নষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে। প্রগতি অর্থে চুস্ত-পায়জামা, কুর্ত্তা, সালোয়ার-পাঞ্জাবী ইত্যাদির মধ্যে মনোহাবিণী হবার ইচ্ছা প্রকট হয়েছে। অভিনেত্রী নারী আজ মাতৃরূপিনী নারীকে পরাস্ত করতে বসেছে—প্রাণের আবেগ মাখা "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" সেই উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি আর শুনতে পাওয়া যায়না। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ক্ষণা, মৈত্রেয়ী, শ্রীমা, আনন্দময়ী মা যে আমাদেবই দেশের মেয়ে লোকবরেণ্য বিশ্বমাতা, তাহা আমরা ভুলতে বসেছি। দেবীজ্ঞানে, গুরুজ্ঞানে, মাতৃজ্ঞানে পূজার নামও কবিনা। বিদেশে রমণী নিশ্চয়ই সম্মানিতা, কিন্তু পূজার স্তরে কি উন্নত হয়েছে, নিশ্চয়ই নয়। অনন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রাণপণ চেষ্টার যুক্তাক্ষরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তায়—ইহা শাশ্বত সত্য ও বহু প্রমাণ আছে। ঈশ্বর থেকে বিমুখ করার সবচেয়ে

বড় শত্রু নারী। নারীপুরুষের মধ্যে যে ভালবাসার উদ্দীপনা হয় তাতে যে বিদ্যুৎশক্তি থাকে সেই শক্তি যদি কামনায় আবদ্ধ না করে উপযুক্ত মনোবল নিয়ে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত কবা যায়, তা হলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা হয়না বলা চলে। ঈশ্বব পাওয়া সহজ কথা নয়। ঈশ্বব পাওয়া হল সব পাওয়ার শেষ পাওয়া—সব চাওয়ার শেষ চাওয়া। সব ত্যাগ না করলে পরম সত্য কখনও খোলেনা ঘোমটা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন :—

"তিমির রাত্রি পোহায়
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে।"

মানুষের কল্যাণে, মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন মহাশক্তিশালী সাধকেরা। আকাশের শূন্যতায়, সুউচ্চ পাহাড়ের গভীব গহ্বরে, নিঃশব্দের স্তব্ধতায়, শূন্যপ্রান্তরের উদাস হাওয়ায়, তারা নিয়ত এই চিন্তায় শ্বেতশুভ্র পতাকা উত্তোলন করে বলেন— "মানুষের যাহা কিছু অসুন্দর, অশিব, তাহা সব মিশে যাক এই পবমসত্য বিশ্বসুন্দরের সাথে—মুক্ত হউক আত্মা, জীবাত্মা মিলিত-হউক সেই পরমাত্মার সাথে।"

চিন্তার শেষ নেই—চাবিদিকে রাত্রির ছায়া ঘন হয়ে ওঠে, গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে ঘরে, নিদ্রার লেশমাত্রই নেই চোখে। একটা গভীর অনুভূতিতে চিত্ত হয় নিবিড়। প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে যায়। নীরব নিস্তব্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে.....প্রভাতের অরুণ আলো মনের কোণে উঁকিঝুকি মারে, মজার আকাশে মন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে নূতনভাবে ছবি আঁকে বিবিধ বৈচিত্রের সমারোহে। মনে নেমে আসে রোমাঞ্চ, আসে প্রশান্তি দুকূল বেয়ে। যখন যেমন তখন তেমন; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যাকে যেমন, তাকে তেমন—নীতিকথাটি বড় ভাল। প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভাবের

আদান-প্রদান অপরূপ সাহায্য করে। কামিনী-কাঞ্চনের সবচেয়ে বড় প্রবক্তাবৃন্দ ফ্রয়েড ও মার্ক্স আজ নেই কিন্তু তাদের অনুরাগীর সংখ্যা বোধহয় ইদানীং বেশ কিছু বেড়েছে। জীবনের বড় উদ্দেশ্য কামিনী-কাঞ্চন নয়, ঈশ্বর লাভ। সাধনার দ্বারাই পৃথিবীতে স্বর্গরচনা করা যায়, এবং মানুষ দেবতা হতে পারে। অর্থ ও কামের রূপায়ণই জীবন নয়—দর্শনছাড়া জীবন অর্দ্ধেক সত্য, আর অর্দ্ধেক সত্য মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর। আর এ কারণেই হিন্দুধর্ম্ম—অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম এই তিনের যথাযথ রূপায়ণকেই গৃহস্থ জীবনের আদর্শ বলেছে। অবিদ্যার সংসারে মেয়েদের মোহিনী শক্তিই প্রথমে চোখে পড়ে, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা তা সহজেই কাটিয়ে ওঠেন। গৃহস্থজীবন ভগবানকে লাভ করার পথে অন্তরায় নয়—মহাজনেরাই পুনঃ পুনঃ বলেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য"—এবিষয়ে অন্যমত আছে কি? কিন্তু থাক, অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বোধহয় বলা হল—এবারে মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

পরদিন প্রাতে কেদারনাথজীর যথাবিহিত পূজা দিয়ে (পাণ্ডা শ্রীমহাদেব প্রসাদ পান্নালাল) ৯-৫০ মিঃএ রওনা দিলাম (ব্রহ্মকমল সংগ্রহ করে পূজা দেওয়া খুবই ব্যয়সাধ্য তবু অনেকেই তা করেন এবং আমরাও তাই করলাম)। পথে গরুড়চটি (১১,০০০ ফিট), রামওয়ারা, সোনপ্রয়াগ (মন্দাকিনী ও সোনগঙ্গার সঙ্গমস্থল) হয়ে রামপুর চটীতে পৌঁছিলাম (৯,০০০ ফিট) প্রায় সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ (২৪-৯-৬৭ তারিখে)। রাত্রিবাস করি বাবা কালিকমলির ধর্ম্মশালাতে। আমরা (পদযাত্রা পার্টির সদস্যবৃন্দ) সন্ধ্যার পূর্ব্বে চটিতে না পৌঁছাবার জন্য দলের ভিতরে নানাপ্রকার গুঞ্জরণ হতেছিল—পরে শুনলাম সেই নবকুমারের দশা আর কি! শেষ পর্য্যন্ত উপদলপতি বলাইবাবু অতি শঙ্কাকুল চিত্তে একটি "হাজাগ" ও আর একটি সঙ্গীসহ আমাদের খুঁজতে খুঁজতে প্রায় দু'মাইল এসেছিলেন—আমরাও তাদের দেখতে পেয়ে পরম পুলকিত হলাম। তারা না এলে আমাদের আরো বেশী কষ্ট হত—এটা বলাই বাহুল্য। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির ভিতরে অচেনা-অজানা চড়াই-উৎরাই রাস্তার অন্ধকারের

ভিতরে আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ছয়জন সভ্যের মধ্যে আবার ছুজনই স্ত্রীলোক, সোনায় সোহাগা নয় কি ? যাহোক, বাবা কেদারনাথের কৃপায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে রামপুর চটিতে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে এসে আমাদের কুশল প্রশ্ন করেন—ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করেন—সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্ত তখন! রাত্রিশেষে রামপুর থেকে রওনা হই সোমবার সকাল ৮ টায়। ফাঁটা চটি পৌঁছাই বেলা ১১ টায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনাদি সেরে আবায় পদযাত্রা সুরু করি ১২-৩০ মিঃ। এবার আর একটি সভ্য দলত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আঘাত ও অর্শজনিত রক্তক্ষরণের ফলে অন্য উপায় আর ছিলনা। এই স্বল্প পথের জন্য তিনি হলেন ঘোড়সওয়ার, আর আমরা বাকী পাঁচজন আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পদব্রজেই পৌঁছিলাম গুপ্তকাশী প্রায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

কোথায় যেন পড়েছিলাম—হাসির রামধনুতে অদৃশ্য থাকে গভীর রহস্যের কথা—রাত্রির নীরব নিস্তব্ধতা আড়াল করে থাকে সব ভাবী ইতিহাস—নিভৃতের তপস্যা! সত্যেন দত্তের একটি কবিতা মনে পড়ে গেল—

সেই একদিন জীবনে চার্ব্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার।
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন
সে যে আনন্দের দিন—সে যে প্রত্যাশার॥

আর একটি কবিতা

"ঠেকেছিল মনোতরী খানা
প্রাণনাশা সংশয় দোলায়
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।"

আবার

ভালোবাসার ঋণের বোঝা
বড্ড ভারী ভাই,
হালকা যদি করতে পারি
এগিয়ে এসে তাই—
গুপ্তকাশীর বিশেষ কথা
বলবো তোমা সনে।
চিরস্মৃতি রইবে জেনো
মনের গহন কোণে॥

এই গুপ্তকাশীর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকুক আমার হৃদয়ের গহন কোণে। জীবনের একটা মধুর স্মৃতি বিজড়িত এখানে—যদিও চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নেই জীবনে তবু বহু প্রতীক্ষিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলেও বেশ খানিকটা যেন ধরা দিয়েছিল অন্তরের অন্তস্থলে। সে আনন্দ—মাধুর্য্যের শিহরণ অব্যক্ত, ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। জানিনা তীর্থ-মাহাত্ম্যই তার একমাত্র কারণ কিনা। আর একটা কারণও আছে গুপ্তকাশীর অক্ষয় স্মৃতির—গোলাপেরও যেমন কাঁটা আছে—সারারাত আমরা বসে বসে ছারপোকা শিকার করি; শারীরিক শ্রম লাঘবের জন্য শয্যার আশ্রয় একান্ত দরকার হলেও তা থেকে আমরা ঐদিন বঞ্চিত হলাম। জীবনে এরকম লক্ষ লক্ষ ছারপোকা ও একসঙ্গে তাদের দংশন আর কারো জীবনে প্রকট হয়েছে কিনা সন্দেহ। পদযাত্রার এখানেই শেষ, বাকীটা বাস-ট্রেনযোগে বিরাট দলসহ।

একটা কথা বারে বারেই মনে হয়। কত কিম্বদন্তি শুনেছি—কারও ভাগ্যে হয়তো কেদার-বদরির দ্বারপ্রান্তে পৌছেও দেবদর্শন হয়নি! নানাকারণে আমরা কিন্তু ভাগ্যবান—সৌভাগ্যের যেন শেষ নেই। ভগবানের কৃপায় আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। সত্য সত্যই স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহ। শুদ্ধমনে, ভক্তিবিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করলে আজকালও সত্য ধর্ম্মের জয়

অনিবার্য্য। সত্যধর্ম্মের স্বাদই আলাদা। এযে সত্যের জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া। একে পেতে হলে যেতে হয় নিষ্কাম স্নেহের ভাগীরথী-উপকূলে, মনন ও হৃদয় বৃত্তির সঙ্গম স্থলে, সেখানে সত্য নিজেই ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সংসার সমুদ্রে বিচরণ করবার জন্য সংযমের জাহাজে যাত্রী হতে হয়। বালিতে চিনিতে মিশে আছে এই অনিত্য সংসার, বালি অনিত্য ও চিনি নিত্য—পিপীলিকার ন্যায় চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ত্যাগ করতে হয়। জলে-দুধে মিশে আছে সংসার, হংসবৎ দুধটুকু নিয়ে জল পরিত্যাগ করতে হয়। পানকৌড়ির মত গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে দেয় বুদ্ধিমানেরা—সাধকেরা। তারা পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থাকলেও দেহ থাকে পরিস্কার উজ্জ্বল। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভিতরে যেন জল প্রবেশ না করে, তাহা হলেই ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের মনে যেন সংসার ভাব না থাকে। জানবার স্পৃহা যেখানে উগ্র, শক্তি যেখানে সহায়, সত্য সেখানে আপন গরজেই প্রকাশে হয় যত্নবান। নিষ্কাম প্রেমসিক্ত অনুভূতির সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়, জীবনের রুদ্ধস্রোতমুক্ত করতে নিঃসংকোচে নিজেকে নিবেদন করলেই বাকীটা আপনা থেকেই একশ সুপথের নির্দ্দেশ দেয়। অচিরে সুদীর্ঘ পথের শেষ হয়। কঠোর শ্রমের দিনগুলি হঠাৎ বিদায় নেয়, রেখে যায় অব্যক্ত আনন্দ, আর সেই পরমানন্দ ভাব।

মনে মনে ঐ কদিনের হিসাব নিকাশ করতে বসি—সত্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, তীর্থরাজ কেদার বদরি দর্শন, তীর্থবন্ধুদের পরমাত্মীয় সুলভ ব্যবহার, সত্যই চিরদিন মনে থাকবে। আর আমাদের পথসঙ্গী "মা" এর কথা, তিনি আমাদের পদযাত্রার সময়ে ডাণ্ডি করে চলেছেন কিন্তু রাত্রে একত্রে কাটিয়েছি। তিনি (আপনভোলা বৃদ্ধা) সত্যই আমাদের সকলকে সন্তানের মত ভালবাসতেন এবং যত্ন করতেন। এবার তাকেও ছেড়ে আমরা পৃথক হলাম। শুধু একটা কথা বারে বারে পড়ে মনে—বিদায়ক্ষণে সজলনয়নে মায়ের ভালবাসা মাখা আশীর্ব্বাদ। ধন-দৌলত, মান-সম্মান, প্রভাব-

প্রতিপত্তির চেয়েও বাবা মার আশীর্ব্বাদ অনেক বড়, এমন কি স্বর্গের চেয়ে ও মহত্তর। ভালবাসা যেখানে গভীর, কোন বন্ধন, কোন লৌকিকতা সেখানে টিকেনা। সুখঃ, দুঃখ কোন অনুভূতিই তাকে স্পর্শ করেনা। তাই ভালবাসা শুধু ভালবাসাই। কর্দম-পঙ্কিলতার মাঝে হলেও সে নির্ম্মল নির্ঝর, নিরুদ্বেগ ও নিরুপম। এই মায়ের কথা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায়না। ইচ্ছাকরে ভোলা যায়না কাউকে কখনো। ভোলাটা যদি অত সহজ হত তবে পৃথিবীতে মানুষ সবকিছু ভুলে পাথরে পরিণত হত; স্মৃতি বলে কিছুই থাকতনা। মানুষ-জীবনটা যে মস্ত একটা স্মৃতির গুহা, এটা মানুষ প্রায়ই ভুলে যায়। আর স্মৃতি আছে বলেই তো নানা দুঃখ কষ্ট, ব্যথা-বেদনার মাঝে মানুষ আজও বেঁচে আছে। যাক, হরিদ্বার থেকে আমরা "ডুন এক্সপ্রেস" যোগে সরাসরি হাওড়া পৌছাই এবিষয়ে বিস্তারিত বলা নিস্প্রয়োজন।

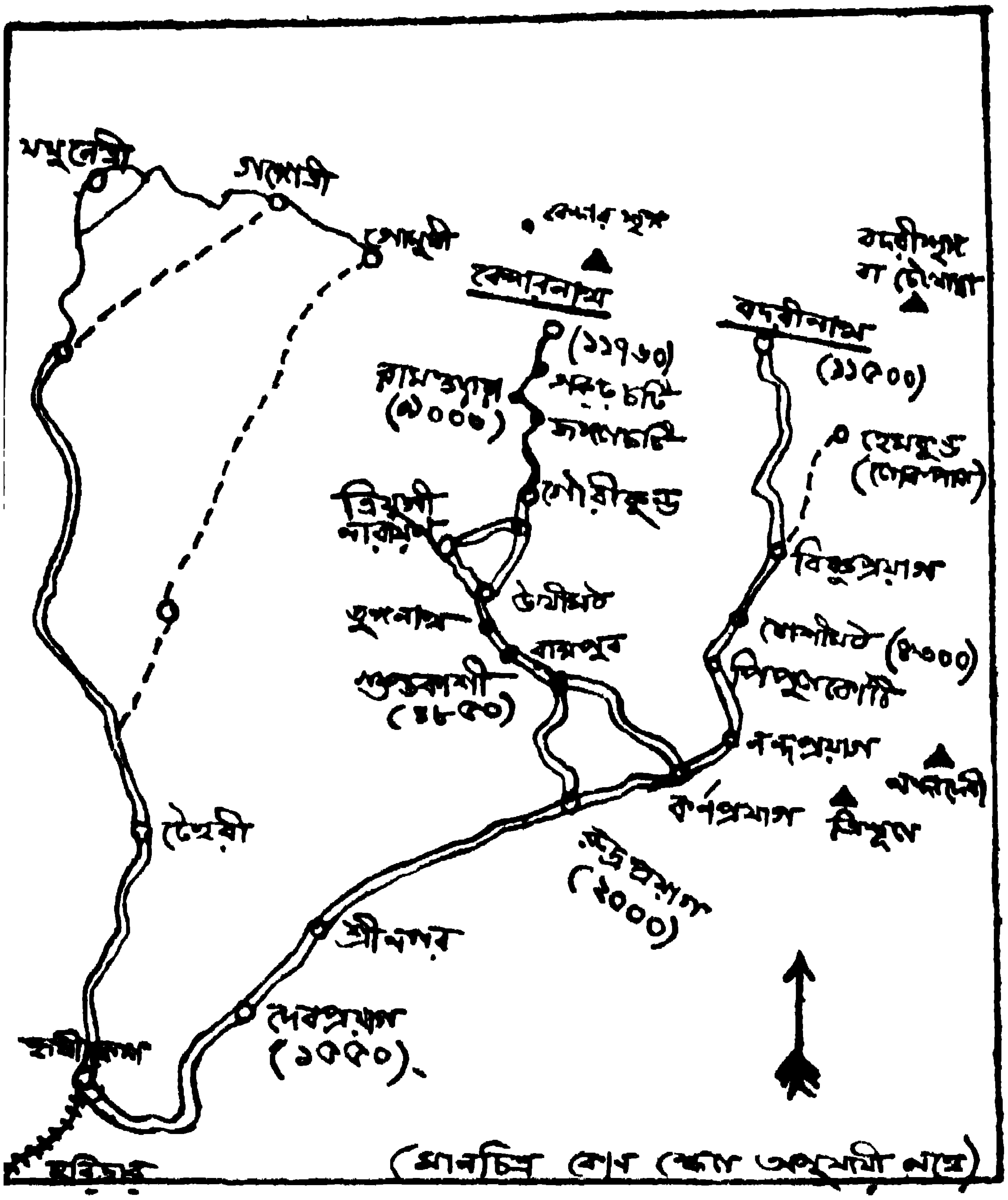

"কেদার-বদরী" গিরিপথে রাত্রিবাস :-

বদরীনাথের পথে :
(হৃষীকেশ থেকে)
শ্রীনগর,
যোশীমঠ,
বদরীনাথ।

কেদারের পথে :
(বদরীনাথ থেকে)
পিপুলকোঠি,
গুপ্তকাশী,
(কর্ণপ্রয়াগ হয়ে)
রামপুর,
গৌরীকুণ্ড
(ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে)।
কেদারনাথ।

ফিরবার পথে।
(কেদারনাথ থেকে)
রামপুর,
গুপ্তকাশী,
হরিদ্বার।

মোটর যোগে

হাজারীবাগ

ভ্রমণ জীবনে এনে দেয় অপার আনন্দ। প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে প্রতিটি মনুষ এই ভ্রমণের মাধ্যমেই জীবন-যৌবন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে ভরে তুলতে সচেতন হন। অশান্ত-অবাধ্য মনকে শান্ত, সংযত এবং সুন্দর করার জন্যও ভ্রমণের প্রয়োজন আছে বৈকি। আর্থিক এবং মানসিক প্রস্তুতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অবশ্য অনেকটা নির্ভর করতে হয় আমাদের।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনই সমস্যা সমাকীর্ণ। আবার সমস্যা সব বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন, বিষয় ভিন্নতর পরিস্থিতি ও আয়তন নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে অনেক সময়। সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে সুষ্ঠু ও প্রবলভাবে মোকাবিলা করাটাই শ্রেয়ঃ। ডাঃ শরীফ এক জায়গায় বলেছেন "ছলনা দিয়ে ছলনার প্রতিকার হয়না"। পরাস্বপহারীর হৃদয় গলেনা অনুনয়ে, কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখলে শুকোয়না দুষ্টক্ষত, মিথ্যার প্রলাপে ঢাকা যায়না মিথ্যাকে। বেদনা সয়েই ব্যবস্থা করতে হয় বেদনা উপশমের। সমস্যা এড়িয়ে চললে সমস্যা বেড়েই চলে—সমাধান হয়না। অস্ত্রোপচারে যন্ত্রণা বাড়িয়েই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হয় কোন কোন রোগে। এরূপ ক্ষেত্রে কল্যাণবুদ্ধি ও মমতাই যোগায় নির্মম হবার প্রেরণা, আপাত নিষ্ঠুরতা অনেক ক্ষেত্রেই গভীর করুণার পরিচায়ক। যাক, আমাদের এই প্রাক্-ভ্রমণক্ষণে কোন তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে আমরা খুসী। বালীগঞ্জ থেকে অক্টোবরের এক ভোরে রওনা হলাম "জীপে" করে। আরোহী আমরা ড্রাইভার সহ পাঁচজন (+ট্রেলারে যাবতীয় মালপত্র)। দলের বাকী সবাই রওনা হলেন পাঠানকোট এক্সপ্রেস যোগে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে সকালবেলা।

প্রারম্ভে যে প্রস্তুতি দরকার (মানসিক, দৈহিক ইত্যাদি)

সবই স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলতে পারি। জিনিষপত্র গুছিয়ে নেওয়া, ছেলেমেয়েদের তৈরী করা যে কি কঠিন ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনা। তদুপরি যদি দলের ভিতরে আবার সে রকম কেহ থাকেন —অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, অতি আতুরে বা ঐ রকম কিছু "Living Luggage" তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা। অনিবার্য্য কারণেই তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া গেলনা, বাকীটা গুনীগণ অগোনে আঁচ করতে পারবেন।

শিয়ালদহ, দক্ষিণেশ্বর হয়ে বিবেকানন্দ সেতু (Bally Bridge) পেরিয়ে আমরা ক্রমে অগ্রসর হলাম। খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছি আর মাঝে ২ এদিক-ওদিক দেখছি। কোন্নগর ছেড়ে পড়লাম এক বিরাট "জ্যামে" এর মুখোমুখি। যতদূর দৃষ্টি যায়-সামনে ও পেছনে-কেবল গাড়ী ; তন্মধ্যে লরীই বেশী। দুজন দীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ বিলিতি সাহেব (উভয়েই এক-খানা "প্রাইভেটের" আরোহী) এবং কয়েকজন লরী ড্রাইভারের আপ্রাণ চেষ্টায় "ট্রাফিক জ্যামের" একটা ফয়সলা হল প্রায় তিনপো ঘন্টা পরে। আমরা আবার গন্তব্য পথে চলতে সুরু করি। চন্দননগরে পৌছে ধুমায়িত চা সহযোগে জলখাবার খেয়ে মনে আবার আসে আমেজ—আর পথচলার আনন্দ-না চেনাকে চেনার অদম্য আগ্রহ। আসানসোলে ভোজনপর্ব্ব সমাপন হয় দ্বিপ্রহরে। অবন্তিকা হোটেলের শীতলকক্ষে বসে—ভালই লেগেছিল, তবে হোটেলের সেই ঝাল-রান্না যেন এখনো ঠোটে লেগে আছে - বেশ জ্বালা বলাই বোধহয় ঠিক—ঐটি বাদ দিয়ে বিরস বদনকে রসনাসিক্ত করার উপাদান আরসব ঠিকই ছিল। বিল মেটাবার সময়ে অবশ্য টের পেলাম যে সেটা বেশ ভারী। পুত্র তা দেখে বিস্ময়ান্বিত! পুনরায় রওনা হলাম, পথে ৩।৪ জায়গায় থেমে গাড়ীকে জল খাওয়াতে হল—আর একজায়গায় "পেট্রল"। বগোদর হয়ে প্রায় বিকাল ৪টায় গন্তব্য স্থলে "শরীয়া" অর্থাৎ "হাজারীবাগ রোড" পৌছিলাম জীপে করে।

সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ট্রেনে করে হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনে পৌঁছিল দলের বাকী সবাই। আমরা গিয়ে তাদের বাড়া নিয়ে এলাম গাড়ী করে। রাত্রে প্রথমে চা-পর্ব, পরে খিচুড়ি ও ভাজা। ক্লান্তি অপনোদনের ঔষধ আমাদের জানাই ছিল—নৈশভোজের পরে বিছানায় যাওয়ামাত্রই অনেকের নাসিকাগর্জন ও ....

বাড়ীটা খুব ভালই লেগেছে। চা খেতে খেতে বাগানের গাছপালা দেখছিলাম। বড় বড় ঘর, গাছপালা, বাগান, আলো-হাওয়া প্রচুর। মালীর সঙ্গে হাতমিলিয়ে খানিকটা কাজ করার পরে বাড়ীর চেহারা একদিনেই বেশ বদলে গেছে মনে হয়। বাগান-টাতে মনোরম মরশুমী ফুলের বাহার, বাড়ীর সামনেই গেটের পাশে বড় বড় দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ সোজা ঋজু ভঙ্গিতে উঠে গেছে। পাতা কচলালেই মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়ায়। ঘরের লাগোয়া গোলাপ আর গাঁদাফুলের গাছ। গাছভর্তি এমন ফুল আর ফুল। বাড়ীময়, তার সুঘ্রাণ ছড়ানো। কিছু ভোমরা ফড়িং আর প্রজাপতি উড়ে উড়ে ঘুরছে; মাঝে মাঝে ঝাকড়া ঝাউগাছ। বেশ লাগে দেখতে। মাধবীলতার গাছটা বাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত উঠে গেছে, থোকা থোকা ফুল ধরেছে।

শুধু যে ফুলের বাগান তা নয়, বাড়ীটায় ফলের গাছও প্রচুর। পেয়ারা, কাঁঠাল, ডালিম, পেঁপে, তবে পেঁপে গাছই বেশী। বড় বড় পেঁপে ফলেছে গাছে। কত বিভিন্ন প্রকারের রং-বেরং-এর সব পাখী দেখেছি এইদিনে। আশে পাশের বাড়ীগুলোতেও ভিড় বেড়েছে ক'দিনের ভিতর। শীত পড়েছে, রোজই আসছে লোকজন। প্রতিটি বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, ফলের গাছ। মালীরা গাছের বাড়তি পাতা ছেঁটে দিয়েছে। পথের দুপাশে বর্ষার জলে যে আগাছা জঙ্গলের মত হয়েছিল, এখন আর তা নেই। ফুলের গাছ-গুলোকে জল দিয়ে দিয়ে তাজা করে তুলেছে। গাছে গাছে একটা রকমারী বাহার—প্রাচুর্য্যের বন্যা বয়ে গেছে যেন। এ সৌন্দর্য্য এখানকার প্রতিটি বাড়ীতেই।

ভ্রমণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা নেই।

পথের অভূতপূর্ব্ব শোভা, পথচারীদের বৈচিত্র্যময় পোষাক, কথোপকথন, কতইনা কথা মনে করিয়ে দেয়। অপার করুণাময়ের কৃপায় আমরা মনেপ্রাণে তাঁর সৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে যাই। ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থনের অবকাশে স্মৃতিপথে জাগরিত হয়—সুপ্তমনে জাগে এক নবীন আশা ও ছন্দ। ক্ষণেক পরেই বিবেকের মর্ম্মকোষে উদ্ভাসিত: "মন চল নিজ নিকেতনে"; বাতাসের উপর ভর করে মন চলে সেই অজানা-অচেনা পথের পানে। ভয় হয় যেন চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, অয়েল না করে নিলে আর চলবেনা। ক্রমে মরচে পড়ে কবে ফুট করে বন্ধ হয়ে যাবে!

নূতন জায়গায় নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। তবে তা খুঁজে নেবার মন চাই—আর চাই উপযুক্ত আবহাওয়া (পারিপার্শ্বিক অবস্থা)। স্বল্পস্থায়ী দৈনিক উন্নতি পাকাপাকি করার চেষ্টাই বৃথা, যদি পরিপূরক সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যরক্ষার মুল নিয়মগুলি মেনে চলা না যায়। তবু ফল অনেকটা ভগবানের উপরই ছেড়ে দিতে হয়—কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ শরীর-দেহ-মন ঘষামাজায় খানিকটা উন্নতি হলেও—হাতীকে ঘোড়া বা ঘোড়াকে হাতী বানানো কি সম্ভব?

অনাবিল আনন্দ অবশ্য সবাই চায়; কার্য্যস্থলে বা ঘরে ফিরে যাবার আগে কিছু মনের সঞ্চয় করে নিতে চায়। স্বার্থ-দ্বেষ ভুলে "প্রীতিতেই পরিতৃপ্তি" আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করলে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যায় মনে করি। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" কথাটা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থায় সত্য। আত্মার তৃপ্তিতে শরীর-মন ভাল থাকে, আত্মার তৃপ্তিতেই মনের আনন্দ, পুষ্টি ও বৃদ্ধি। দেহ মনের আধার, আবার মন ও দেহের। তাই দেহ ও মনের এত অঙ্গাঙ্গীভাব, একাত্মতা। সত্যি, মনটাও আমাদের অনন্ত প্রবাহমান নদীর ন্যায়। তার গতির বিরাম নেই, নেই কোন নিয়মিত শান্ত বা অস্থির কার্য্যক্রম। মন যেমন বিশেষ কারণে, শোকে বা আনন্দে আচ্ছন্ন বা অভিভূত হয়, নদীতে তেমনি বিশেষ অবস্থায়,

বর্ষায় অবিরাম বারিপাতে, বা প্রবল বন্যায় আপনাকে নূতন ভাবে প্রকাশ করে। এই বিশেষ অবস্থায় সত্যাসত্যবুঝবার বিশেষ ক্ষমতা কাহার ও সম্যকভাবে থাকেনা—আপন গতিবেগে স্বীয় মনোনীত পথে অগ্রসর হয়ে অভীষ্ট সাধনে তৎপর হয়= দেহমনের তৃপ্তি ও আনন্দ বিধান করার জন্য। কোথায় যেন পড়েছিলাম,............প্রীতিই একমাত্র আদর্শ— যেখানে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব। উল্লাস ও আনন্দ থেকে প্রীতির জন্ম, প্রীতি থেকে প্রেম। প্রেম আর আত্ম—বিলুপ্তিতে আসে স্নেহ। এই স্নেহ আর কামনা থেকে "রাগের" জন্ম—যার কোন শেষ নেই। "রাগের" রম্যতাই অনুরাগ.........প্রাকৃতিক মাধুর্য্য মনেপ্রানে উপভোগ করার জন্য চাই এই অনুরাগ=উজার করে ভগবানের পায়ে আপনাকে নিবেদন করার যে শান্তি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; শুধু গুণীগণ বোঝেন মনে।

হাজার-ই-বাগ শহর এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে; নিয়মিত বাস-গাড়ী চলে এখানে। এই শরীয়া'র রেলষ্টেসনের নাম "হাজারীবাগ রোড" (পূর্ব্ব রেলওয়ে)। পূর্ব্বে বহু প্রখ্যাত শিকারী এখানে এসে ধন্য হয়েছেন—অর্জ্জন করেছেন প্রসিদ্ধি, কিন্তু অধুনা সে অবস্থা আর নেই, যদিও মাঝে ২ নরখাদক ব্যাঘ্রের খবর কোন কোন বৎসর পাওয়া যায় এতদঞ্চলে। লোকবসতি বাড়ার ফলে জঙ্গল অনেকাংশে পরিস্কার হয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে বন্য পশুরাও। কিন্তু "হাজার-ই-বাগের" বাগের শোভা এখনও অমলিন। পান-ওয়ার রোডের ও আশ্রম রোডের দুপাশেই কেবল বাংলো প্যাটার্নের নূতন ও পুরানো বাড়ী। মাঝে মাঝে দ্বিতল বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা পুরানো জমিদারদের কীর্ত্তি প্রকাশ করে। আর ঐ সব বাড়ীর সংলগ্ন সামনের ও পাশের জমি প্রায় সবটাই নানাপ্রকার বর্ণাঢ্য ফুলফলে সুসজ্জিত। বাগানের সন্নিহিত ঘরে আরামে বাস করে বর্ষার ঝড়ে বা দারুণ ঠাণ্ডায় যে কোন অবস্থায়ই বাগানের শোভা উপভোগ করা যায়। কুসুমরাজির বর্ণাঢ্য রং ও স্নিগ্ধ মনমাতানো গন্ধ লীলাময়ের লীলা কীর্ত্তনে বিহ্বল। শীতল

সমীরণের সাথে দুলে দুলে যেন সৃষ্টিকর্ত্তাকে চিরকাল ব্যজনে ব্যাপৃত। পথিককে সুমিষ্ট অভিবাদন করে ধন্যহয় এই ফুলদল। অবাক হয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে থেকে কত কথাই না মনে হয়! জন্ম-মৃত্যু, বিবাহের শুভাশুভ প্রত্যেক অনুষ্ঠানে চাই ফুল, ফটন্ত ফুল! ফুল মরণের উপর জীবন্ত প্রতীক। ফুল ফোটে, সৌরভ বিলায়—নিজের জন্য নয়; পরকে আনন্দ দিতে। ....কল্পতরুর ন্যায় যেভাবে যে চায়, ফুল সেভাবেই তাকে তৃপ্তি দিয়ে থাকে, বিমুখ কাউকে সে করেনা। ভক্ত দেয় মনের সব ভক্তিসহ একটি ফুল তার প্রিয় দেবতাকে; প্রিয়া দেয় নিভৃতে তার দেহমন প্রাণসম একটি ফুল তার একান্ত প্রিয়জনকে; বন্ধু দেয় অপর বন্ধুকে সমস্ত মনের আবেগ দিয়ে একটিমাত্র ফুল। মনোরম ফুল রূপে, রসে, গন্ধে দেবতা-মানুষ সবাইকে বশীভূত করে আপনার করে নেয় অতি অল্প সময়ে। ধানওয়ার রোডের জাকজমক, আশ্রমরোডের শুচিশুভ্র পবিত্রতা—সর্ব্বত্রই এই পরম রমনীয় ফুলের কত সমাদর!

দলবেঁধে একদিন গেলাম শহর ছেড়ে বরাকরের দিকে—গ্রামের পথে। ভেবেছিলাম, একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে পারব। শেষপর্য্যন্ত দেরীই হয়ে গেল; বেরোতে প্রায় তিনটে বেজে গেছে। শীতের বেলা দেখতে দেখতে কখন ফুরিয়ে যাচ্ছিল। গাছে গাছে ক'টা দোয়েল আর শালিখ পাখী উড়ছিল। রোদটা যেন এরই-মধ্যে আরো পাকা রং ধরেছে, মিঠে আমেজটা একটু একটু করে নরম হয়ে আসছে। মনে হলো, আর একটু পরেই এই রোদ ছুটতে শুরু করবে। ইতিমধ্যেই রোদ ঠেলে ঠেলে ছায়া নামছিল মৃদুপায়ে, নিঃশব্দে। দূরের মাঠে শাল-মহুয়ার বনে ঢালু জমীতে তাই ঝিম ঝিম ভাব। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে, কিছু শুকনো পাতা, ধূলো উড়ছিল।

ধানোয়ার রোডের দুপাশে বড় বড় সব বাড়ী, সব বাড়ীতেই এখন লোক। ছেলেমেয়েরা বাগানে হৈ চৈ করছে। দুপাশে আম, শিরিষ, ইউক্যালিপটাস গাছ। ঘনচ্ছায়া পথের উপর। আরো অনেকে বেড়াতে বেরিয়েছে। গরুরগাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে

করতে চলেছে। একজায়গায় বাড়ীগুলো যেন হঠাৎ শেষ হয়েছে, গাছপালাও কম। মাঠটা অনেক বড়, আকাশটাও যেন বড় হয়ে গেল। চোখের সামনে এখন আর কোন বাধা ছিলনা, অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। দূরের ঢালু জমীতে সরষের ক্ষেতগুলো এর রূপ যেন আরো অনেকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। হলুদ ফুল ফুটে আছে ক্ষেত জুড়ে। এদিকটা অনেক নিজ্জন।

মাঠ শেষ হয়ে এল, আলো ও ফুরিয়ে আসছে। পাখীদের কিচির-মিচির। পথটা এখানে এসে আরো সরু হয়ে গেছে, দুপাশে বাঁশ ঝাড়। আগাছায় ভরে রয়েছে। শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে সর্ব্বত্র। ক্ষেতের পাশে বেড়ার মতন করে অড়হর গাছ চলেগেছে অনেকদূর পর্য্যন্ত। ক্ষেত শেষ হয়ে বন শুরু হয়েছে দুপাশে ঘন শালবন।

সূর্য্য ডুবছিল, লালচে ভাবটা দেখতে দেখতে সরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামছিল নিঃশব্দে। বেশ শীত করছিল। একে একে সবাই ঘরে ফিরছে এবার। আমরাও অগোণে বাড়ীর পথ ধরি। দলের একজন যে এমন শিল্পী তা আগে জানা ছিলনা। প্রথমে গুনগুন করে পরে গলা ছেড়ে সেকি মিষ্টি—গান। সবার মিলিত অনুরোধে আর একখানা হলো। দরদী গলার সূক্ষকাজে সে এক অপূর্ব্ব মায়াজালের সৃষ্টি করেছিল। যখন ঘরে পৌছালাম তখন চাঁদ উঠে গেছে। এত পথশ্রমেও কিন্তু কাহারও শারিরীক বা মানসিক ক্লান্তি আসেনি সেদিন।

নিকটেই বরাকরে স্নান, তোপচাঁচী লেকে "পিকনিক", কোনার বাঁধ ও সূর্য্যকুণ্ড পরিদর্শন সত্যি আনন্দদায়ক। জীপে করে দলবেঁধে পরিভ্রমনের এমন সুযোগ সবসময়ে পাওয়া যায়না। আমরা গাড়ীকরে অন্যান্য বারের ন্যায় একদিন সূর্য্যকুণ্ড (প্রায় ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত—এখানে বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে এবং মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে একমাস মেলা বসে এই বিরাট অঞ্চলে) এবং অপরদিন তোপচাঁচি লেকে গিয়েছিলাম। লেকে বেড়াতে গিয়ে এবার প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বেশ খানিকটা অসুবিধে হয়েছিল;

পাহাড়ী ঝড় কা'কে বলে তা নূতন করে বুঝলাম। পূর্ব্বের ন্যায় সেই সুন্দর লীলাভূমি এখন আর নেই—প্রমোদ বিহারের "মোটর বোট", মনোরম পুষ্পোদ্যান সবই যেন পুরানো স্মৃতিমাত্র।

জীবনের একটা বৃহদাংশ একনাগারে প্রায় তেরবৎসর কাটিয়েছি দারজিলিং জেলার কার্সিয়াং এ। পাহাড় প্রথম ২ খুবই ভাল লাগে, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিত্য নবসাজে বিমোহিত হয় মনোহর মন—কিন্তু একটানা কয়েক বৎসর পরে সে ভাবের ব্যতিক্রমও ঘটে।

অনেকদিন পরে পুনরায় এই হাজারীবাগ পাহাড়ে এসে মন নিল নতুন রূপ—সরস আবেগে যেন সজীব হয়ে ওঠে এই বহুজ্বালায় জর্জ্জরিত জীর্ণ শরীর-মন। "প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে"·········মনে করে নিজ সন্তানবৎ ষোড়শী তরুনীদের সাথে হৈ-হুল্লরে মাঝে মাঝে বেশ দিন কাটিয়েছি। ছিপফেলা, পাহাড়ের রাস্তায় নিভৃত ভ্রমণ, প্রকৃতির সঙ্গে নূতন পরিচিতি—কতইনা ফেলে আসা দিনগুলি মনে করিয়ে দেয়। পথ চলার সাথে কিছু কিছু লেখাপড়ার কথা, সাহিত্য আলোচনা, সবই হোত, মানসিক পরিস্ফুটনের জন্য এটাই চমৎকার পরিবেশ নয়কি ?

সর্পিল গতিতে রেলপথ গিয়েছে বাড়ীর পাশ দিয়ে। লাইনের অপর পারে বসে সাপ্তাহিক হাট-প্রতি বুধবারে। সেদিন এক সমারোহ। সকাল থেকেই সুরু হয় স্থানীয় লোকের আনাগোনা। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলে এই বেচাকেনা ও জনস্রোত।

যদিও কার্ত্তিক, কোন কোন গাছ নিষ্পত্র হয়ে রোদ পোহায়—অবশ্য যখন এবং যদি হয়। কিন্তু তবু বন, শস্যক্ষেত্র পুরোপুরি শ্যামল। এ বন যেন চিরতরুনী, আর পাহাড় চিরযুবা। শীতের হিংস্রতা একে বিবর্ণ করতে পারেনি, দাবানল এর সবুজকে কালো করতে পারেনি কখনো। মাঝে ২ একনাগারে বৃষ্টি রাস্তাঘাট ভাসিয়ে নেয়, কিন্তু খানিক পরেই কাঁকড়-বালুময় পথ সিক্তবসনা গরবিনীর ন্যায় যেন প্রকৃতির কোলে ডেকে নেয় হাতছানি দিয়ে।

নিকটেই তিনমাথা এককরা বুড়োর মত কালোপাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথের মন্দির—আর ঐ নামের জন্যই নীচের রেলষ্টেশনের

নাম "পরেশনাথ"। মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে দূরে প্রকৃতির এক অনির্ব্বচনীয় শোভা দৃষ্ট হয়। সবুজ বন, প্রায় হরিৎ শস্যক্ষেত্র, দুরান্তে কৃষ্ণনীল। আর নীলবন ছাওয়া ছোটবড়, গায়ে ২ লাগা পাহাড়। ইতিমধ্যেই আমরা একদিন "বগোদর" থানা এলাকায় "ছোটকী-শরীয়া" ও "বারোয়াডিহি" গ্রামদ্বয় পরিভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেছি। "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" কথাটা সত্যি পুরোপুরি বোঝা যায় যদি গাঁয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিবিড়ভাবে ইচ্ছামত বেশ খানিকটা হাঁটা যায়; মোড়ল এবং তথাকথিত সাধারণের সহিত প্রাণ খুলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব জানবার-বুঝবার চেষ্টা নেওয়া যায়। পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের সে সাধ অপূরণ থাকেনি। পাহাড়ের উপর থেকে শুধু সূর্য্য-উদয় নয়, উল্টোটাও কম মনোমুগ্ধকর নয় যখন ধীরপদক্ষেপে অস্ত যায় রবি। এই শাশ্বত সৌন্দর্য্য সার্থক মনে হয় এখানে বসে। নিবিড় মনের গোপন কথা-সকল সমস্যার সমাধান হয় এই সার্থক পরিবেশে।

শরতের শিশির ভেজা আকাশ, আকাশের সাদা মেঘে হাল্কা হাসির ঢেউ, শিউলিফুলের গন্ধে খুশির আমেজ—বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ পূজার দিনগুলি ভরে ওঠে হাসিতে আর আবেগে। পরে কি হবে বা হতে পারে সে চিন্তা যেন কিছুকালের জন্য বিশ্রাম নেয়। প্রশান্তি বা পরের জন্য প্রস্তুতি? শরতের মেঘমুক্ত নীলআকাশে কিন্তু মাঝে ১ আসে তার অমোঘ কীর্ত্তির ধারা, যে বর্ষনসিক্ত আবহাওয়া কেহ চায়না, কেহপছন্দ করেনা। কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া এখানে অন্য উপায় নেই। প্রান্তরে প্রান্তরে কাশফুল, নানবর্ণের সৌরভে ঝির-ঝিরে বাতাসে পাখীর গান—আর মাঝে ২ মিষ্টিরোদের স্নেহস্পর্শ বাঙ্গালীর প্রাণের গহনতম কোণটিকে ও আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় এই সময়। ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের কল্পনাদৃষ্টির দেখা সেই বঙ্গ প্রতিমা প্রায় শতবর্ষ পরে আজ আমাদের সম্মুখে জাগ্রত। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে থেকেই ছেলেমেয়েরা বাণীবন্দনা ছেড়ে বীরপূজা বা বারো-ইয়ারি পূজায় মেতে ওঠে—আর বসে

আলোচনা চক্রে। এই "শরীয়াতে" মোট চারিখানা পূজো হয় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বেশ জাঁকজমক সহকারে। আর এই আনন্দের অবসান ঘটে বিসর্জ্জনে।

সবাই জানেন, বোধন যখন হয়, তখন বিসর্জ্জন হবেই। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন—নদে ?" অমর কবির একথা শাশ্বত সত্য ; তবু কেন আমরা এমন করি ? ভালবাসার একটি অর্থই আমি জেনেছি—বেদনা। মিলনের অলক্ষ্য পরিণতি বিচ্ছেদে—আমাদের হৃদয়তো আকাশ, আকাশে সব কিছুরই স্থান হয়, হৃদয়ে হয়না কেন ? —কে জানে। শত প্রশ্ন ওঠে মনে, উত্তর হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু পছন্দসই হয়না।" আমাদের হৃদয় মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা আকাশের মতো ছোট সঙ্কুচিত হয়ে যায়, নিয়মে—লোকাচারে—নীতিতে। অথচ এই নিয়ম—নীতি লোকাচারই জগৎ সংসারকে, বেঁধে রেখেছে। কারণ ঐ লোকাচারের অন্ধ নীতিতে আমিও নির্ব্বাসিত। সেই গ্রামোফন রেকর্ডের গানের প্রথম লাইনটা তার পদ ও সুরের গৌরবে এখনো মনে পড়ে—"মনমাঝি তোর আকাশগাঙে জোছনা জোয়ার খেলে"—অনুপম, অনবদ্য বলে প্রতিভাত হয় আমার মনে ঐ গানটা।

আমাদের বিদায়ের পালা এবার। ৫ই নভেম্বর, তারিখে প্রাতে দলের প্রায় সবাই পাঠানকোট একসপ্রেসে কলিকাতা রওনা হল—আর আমরা ওদের গাড়ীতে তুলেদেবার পরে ট্রেলারে মালপত্র ভর্ত্তীকরে রওনা হই প্রায় দশটার সময়ে জীপে করে। "বগোদর" সাড়েদশটায় পৌঁছে চাকায় হাওয়া আর ট্যাঙ্কে তেল পুরে এবার সত্যি ছুটল চাকা। গাড়ী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে—আর মনে হয় দূরদিগন্তের শ্যামল বনানী যেন হাত ছানি দিয়ে পথিককে বলে "আবার এসো"। জাতীয় সড়কের [Grand Trunk Rd.] দুধারে কখনও শস্যশ্যামল বসুন্ধরা, মাঝে মাঝে হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্র, কোথাও সুউচ্চ তালবৃক্ষ, আবার কখনও সুমিষ্ট ও সুবিস্তৃত চ্যুতবৃক্ষরাজি রাস্তার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মোমবাতি যেমন

"আপনি দহিয়া অপরে দেয় আলো" তেমনি পথিপার্শ্বস্থ পান্থপাদপ-গুলি শীততাপের জ্বালা সহ্য করে পথিকের ঢিল, উপহাস, এমন কি শেষশাস্তি নীরবে মেনে নিয়ে ও পথিককে সুশীতল ছায়াদানে বিরত হয়না। অপার অনন্দে ভরে ওঠে মন। পরেশনাথ, তোপচাঁচি, ধানবাদ, বরাকর, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়, বর্দ্ধমান হয়ে আমরা হাওড়া পৌছাই রাত্রি প্রায় নটার সময়। তারপর……?

ডাঙ্গোয়াপোসি—(বিহার)

রাত্রি ৯৷৷০ টায় ছাড়ে গাড়ী—রাউরকেলা ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার। গাড়ীর শেষ প্রান্তে যে "গুয়া"র জন্য নির্দ্দিষ্ট বগি ছিল, তাতেই কোন-মতে স্থান সংগ্রহে সক্ষম হই এক অপরিচিত বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবকের সহায়তায়। আমাদের কম্পার্টমেন্টে ছিল বিস্তর অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও তাদের লটবহর—যারা অনেকেই নেমে যান টাটা ও চাইবাসা। যদিও গাড়ীর নাম "ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার" তবু অতি শম্বুকেতর মন্থরগতিতে প্রত্যেক ছোটবড় স্টেসনে থেমে২ এগুচ্ছিল আমাদের গাড়ী। ভোর হল গালুডি ষ্টেসনে, লাইন ক্লিয়ার না পাওয়ায় ৬-০০ থেকে ৬-২০ পর্য্যন্ত এখানে গাড়ী অচল হয়ে পড়ে থাকে যেন রাত্রিশেষে একটু বিশ্রাম। যাত্রাপথে টাটা পৌছে ৭-১৫ মিঃ আর ছাড়ে ৭-৪০ মিনিটে। আমাদের গুয়া'র বগিখানা জুড়ে দিল অন্য গাড়ীর সাথে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-অনুযায়ী। গন্তব্য-স্থলে—ডাঙ্গোয়াপোসি পৌছাই বুধবার বেলা ১১ টায় অর্থাৎ ডিউটাইমের প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা পরে। গাড়ীর পুনঃ পুনঃ বাঁশীর আওয়াজে মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই কথা=সত্যি রেলগাড়ীর সবষ্টীম যদি গাড়ীর "হুইসিল" দিতেই ফুরিয়ে যায়, তবে চাকা চলবে কিসে? দেখলাম, রাস্তায় রেললাইনে মেরামতরত কত লোক—আদিবাসী পুরুষ ও স্ত্রী মজুরের দল।

পুত্র ষ্টেসনেই আমার জন্য অপেক্ষমান দেখলাম। নিকটেই তার কোয়ার্টার্সে যেতে বিলম্ব হলনা—শুধু ষ্টেসনেই পূর্ব্বপরিচিত পি-ডবলিউ-আই শ্রী বিশ্বাসের সহিত সামান্য সৌজন্যালাপ। বাসা-খানি বেশ ছিমছাম, ছোট হলেও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ভেতরে ও বাইরে ছোট্ট ফুলবাগান ও সব্জিবাগান—সুরুচির পরিচয় নয় কি?

নূতন জায়গায় নূতন পরিবেশ—আবহাওয়া, রান্না সবই নূতন। পেটরোগা মানুষ আমি, সইলোনা সব। দু-তিনদিন বেশ ভুগে উঠলাম—পেটখারাপ থাকলে 'কিছুই ভাল লাগেনা। শেষ পর্যন্ত ঔষধ খেয়ে তবে আরাম।

প্রাতরাশের পরে ট্রলি চেপে একদিন প্রাতে বেড়াতে বের হই—সঙ্গে থাকে "হটকেসে" দুপুর বেলার বন্দোবস্ত—ভাত, ডাল, তরকারী ও রামপাখী। এই আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়াঞ্চলে—বনবাঁদারে—হয়তো বন্যকুক্কুট বলাই বিধেয়; শাস্ত্রেও তাহলে বিধি মিলবে। আমরা বাদাপাহাড়, নোয়ামুণ্ডি হয়ে বড়াজামদা যাই। নোয়ামুণ্ডিতে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় খুব ঘটা করেই—শ্রী চাটার্জী, এস, পি, ডাবলিউ, আই এর কোয়ার্টার্সে এবং তাকে নিয়েই আমরা তিনজনে যাই বড়াজামদা। সেখানে বাজারে খানিকটা ঘুরে এসে তথাকার "ফিরপো"তে বসে ক্লান্তি অপনোদনকারী চাপানে মত্ত হই। এমন সময়ে দেখি বিরাট এক শ্বেতকায় শূকর আপন আনন্দে মন্থরগতিতে হেলে-দুলে অগ্রসর হচ্ছেন বড় রাস্তায়—ভীড়ের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে। শুনলাম, বিহার সরকার উহার পালককে মাসিক ১০ টাকা মাসোহারা দিয়ে থাকেন। বড়াজামদা থেকে আমরা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে করে ফিরি—চলমন নিজ নিকেতনে—ডাঙ্গোয়াপোসি—বৈকাল ৫ টায়। নোয়ামুণ্ডি থেকে বড়াজামদা যাবার পথে বরষার ঝরণার অনবদ্যরূপ নয়নভরে প্রত্যক্ষ করি—আর দেখি টাটা মাইনের লাল জলে রেললাইন প্রায় ধুয়ে যাবার অবস্থা। তার স্রোতবেগ, ভয়ালরূপ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি।

ঝরণার গান।

পাহাড়িয়া জল, উছলিয়া ওঠে, চলে কলকল,
হেলিয়া দুলিয়া আপন আনন্দে

যদি কোথা পায় বাঁধা, ক্ষণিকের তরে,

উতল্লিয়া যায় উদ্দাম তালে, মধুর গোপন ছন্দে।

নৃত্যেরি তালে চলে উর্ব্বশী, হরণ করিয়া মন,

যৌবন মদালসা, সর্ব্বনাশা বৈভবে মগন।

বন-হরিণীর মত ছুটে চলে চল একান্ত সঙ্গোপনে,

নিদাঘ-তৃষা, নেই কোন জ্ঞান, তুষিতে প্রিয়জনে।

খরতর বেগ, চঞ্চলগতি, গতি দুর্নিবার,

রাঙ্গাজলের নেই যেন শেষ, আনন্দ অপার।

মনে হয় যেন ভেসে যায় রেললাইন যত,

বাদালপাহাড়, নোয়ামুণ্ডি, বড়জামদায়।

টাটামাইনস্ এর লাল জল যত বহে অবিরত,

বেগে বাড়ে কমে কিন্তু রং নাহি বদলায়।

বরষার ঝরণা, পাহাড়ের দেশে, নেই কোন তুলনা,

ভীষণ দুর্বার আর মনোরম।

নিঃসঙ্গ নিভৃতে বিস্মৃতির মাঝে স্মৃতির আলোরণ,

মনের মনিকোঠায় অতি অনুপম।

পথ চলতে কত না বাধা, বেশভূষা হয় রাঙ্গা,

ভাবুক মনের প্রিয় অনুভূতি।

দেহমনের ক্লান্তি হোক অপস্কৃত, ভ্রমণ সার্থক,

বর্ষণসিক্ত দুপুরের এই মিনতি।

বরষার গান এমন-কভু শুনি নাই—

আমি পথহারা, সব হারিয়ে তোমাতে মিলিতে চাই

সৃজন কর্ত্তারে তাই নমি বারে বারে,

অপূর্ব গানের শেষে বিদায় মাগি ভাই ॥

পথে যেতে ২ মনোহারিণী প্রাকৃতিক দৃশ্যে হৃদয়ে লাগে দোল—এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। দূরান্তে ঘন কৃষ্ণনীল

পাহাড়ের চূড়ায় বৃক্ষরাজির অপূর্ব শোভা, আর নীচে অতি সন্নিকটে আদিবাসীরা আপন ২ কাজে কর্ম্মমুখর। সত্যি, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" এই কথার তাৎপর্য্য বেশী করে বোঝা যায় এই পরিবেশে। একটানা একটা মৃদু সঙ্গীত যেন ভেসে বেড়ায় এখানে —যে সঙ্গীত শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়; চোখবুজে নিবিষ্ট চিত্তে বুঝবার চেষ্টা করতে হয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম—সঙ্গীতই আদি এবং সঙ্গীতই অন্ত। সৃষ্ট জীব জড় সবই সঙ্গীতে বাঁধা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব এই সঙ্গীতের দাসমাত্র। অতুলপ্রসাদ তাই গেয়েছিলেন :—

মিছে তুই ভাবিসরে মন—
শুধু গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা,
গান গেয়ে যা আজীবন·········

পাহাড়ের কোলে কোলে আর বিশেষ করে রেল কোয়ার্টার্সের সংলগ্ন বাগানে বর্ণাঢ্য রংএর ছোটবড় ফুল বাগান রূপে-রসে-গন্ধে ভরা। মনোরম পরিবেশে সবই মনোহারী হয়ে মাতিয়ে তোলে মন। ফুল, পবিত্র শ্বেতশুভ্র সুগন্ধিত ফুল, কাহারনা ভাল লাগে? দেবতারা বশীভূত হন সচন্দন ভক্তি পুষ্পার্ঘে, প্রিয়জন তুষ্ট হয় পুষ্পের প্রীতি-উপহারে। আদিবাসী যুবতীরা ও তাই মাথার খোপায় ফুল পরতে এত ভালবাসে। স্থানীয় মুণ্ডাজাতীয় আদিবাসী স্ত্রীলোকের বেশভূষা একটু অন্যরকমের হলেও চেহারা লাবণ্যযুক্ত, সাধারণতঃ ঘনকৃষ্ণবর্ণ রং, বলিষ্ঠ খর্ব্বাকৃতি দেহ, পীন্নোন্নত বক্ষ—মুখে যেন সলজ্জ চকিত মৃদুহাসিটি লেগেই আছে। যাক, ফুলের কথা বলতেছিলাম—ছোটবড়, ছেলেমেয়ে, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সবাই খুসী ফুলে—পবিত্র সুন্দর ফুল তাই সবার এত প্রিয়।

ডাঙ্গোয়াপোসির হাট বসে সপ্তাহে দুদিন মঙ্গল ও শুক্রবারে। দ্বিপ্রহর থেকে প্রায় সন্ধ্যাপর্যন্ত চলে অগণিত জনসমুদ্রের স্রোত। ভাঙ্গাহাটের পরে সুরু হয় নিকটস্থ এক বিশেষ দোকানের ভীড়—(লাইসেন্স প্রাপ্ত দেশীয় মদের দোকান)—লেনদেন চলে বোধহয়

বেশ খানিকটা রাত পর্য্যন্ত। তারপর সব শেষ, তবে রেল কলোনীর ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের কারখানার কর্ম্মীদের ছুটীর দিন সব বিভিন্ন বারে হওয়ায় এই দোকানের কাজকর্ম্ম সপ্তাহভরেই চলে হাটেরদিনে (বা সত্যিকারের রাতের আধা অন্ধকারে) একটু বেশী চলে এই যা !! চাকুরীতে ব্যস্ত প্রায় দুই হাজার কর্ম্মীর পরিবার ছাড়াও গ্রাম্য লোক বহু আছে যারা মোটামুটি ভাবে ঐ হাটের উপর নির্ভরশীল — তাই হাটবার একটা কর্ম্মব্যস্ত দিন সবাইর জন্য — বিশেষ করে স্থানীয় চাষীদের, কেরানীদের বা সমগোত্রীয় অন্যান্য চাকুরী নবীশদের। একদিন হাটে গেলাম দর্শন-মানসে। বাঙ্গালী দোকান মোটেই নেই ; বেশীর ভাগই স্থানীয় অধিবাসীদের— আর কিছু কিছু হিন্দুস্থানী ভাইদের। পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক দোকানদারই বেশী মনে হল। তেলেভাজা খাবার দোকানে বেশ ভীড়। সামনেই পড়ে আছে যতসব এঁটো শালপাতা বা মালতা-পাতায় তৈরী দোনা। কতই না পরিশ্রম করে শালপাতা বা মালাতা পাতা যোগাড় করে বুনে নিয়ে তা বিক্রী হয় এবং সেই পয়সায় কত গরীব গৃহস্থের, দিন মজুরদের অন্ন জোটে! অনেক কথাই মনে আসে—ফেলে আসা দিনগুলি হুবহু উদয় হয় মানস-পটে। যে শালপাতায় মানুষ খায়, খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে এঁটো শালপাতায় কিসের এত দরদ ? প্রায় সর্ব্বত্রই এই অবস্থা—তবু মনে দোলা দেয় কেন বুঝিনা।

আমরা জীবনে বহু জিনিষের কল্পনা করি, কিন্তু বাস্তবে করতে চাইনা। তার কারণ, কল্পনাকে রূপ দিতে গেলে তার জন্য দাম দিতে হয় বলে বলে। আর বিনামূল্যে (তা যে ভাবেরই হউক) এ পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। ফলে ইচ্ছাপূরণ হয় না বলে জীবনের শেষে একটা তীব্র হতাশা এসে সমস্ত মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর তারই পরিণতিতে শেষের দিনগুলি কাটে মহা অশান্তিতে। প্রশ্ন হতে পারে, উচ্চচিন্তা যদি মনে স্থান না দেওয়া যায় তবে বড় হবার আকাঙ্খাও তো মানুষের জীবনে আসবেনা। আকাঙ্খাতে আপত্তি নেই, কিন্তু কিছু পেতে হলে

নিজেকে কিছু দিতে হবে ; নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে সেজন্য। তাই কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে সামান্যতম সুযোগ পেলেই তা কাজে লাগানো ভাল। বাস্তবে কতটা সম্ভব,কতটা অসম্ভব হবে তা নিজে বিচার করেই কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর একথাও ঠিক যে একান্ত ইচ্ছা থাকলে, সত্যিকার চেষ্টার ফলে বড় সুযোগ আসতে দেরী হয় না। সুযোগ এলে উপযুক্ত ভাবে তা কাজে লাগানোই হল সুখী হবার প্রকৃষ্ট উপায়। বাস্তব জীবনে অনেকে আমরা একটু অন্যরকম জানি—দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী বা সঙ্গীতানুরাগী যেই হোক, যার পেছনে কাঠি দেবার লোক নেই, সেই সুখী। ধর্ম্মের দিক থেকে সুখী হবার উপায় ও পথ— নানামুনির নানামত, তবে আত্মানুসন্ধানইহবে প্রথম সোপান, আর পথেই পথের সম্যক খবর পাওয়া যায় উপযুক্ত সময়ে।

দুপুরে খাবার পরে অখণ্ড বিশ্রাম। প্রায় প্রতিদিনই "অমৃতবাজার" পাশের কোয়ার্টার্সে "মেসবাড়ী" থেকে আনিয়ে পড়ি। ঘুম আসেনা, তেমন ইচ্ছা ও নেই। নানাপ্রকারের এলোমেলো চিন্তাধারা মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাকে একা পেয়ে। কেড়ে নেয় মনের শান্তি বা নিজস্ব কিছু লেখার ইচ্ছা। একটা দিকে স্থির না হয়ে মন ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো-ভাবে—পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের আনাচে-কানাচে—বিশ্রাম আর হয়না। একদিন মনে হল, শান্তি বা সবকিছু কেড়ে নিলেও একটা জিনিষ এই দুঃখ কষ্টের পৃথিবীতে কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। সেটা হল অবিচলিত সাহসে সগৌরবে নিজের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে চলা—পুরস্কারের আশা তিরস্কারের আশঙ্কার দিকে দৃক্‌পাত না করে। সবাই জানেন, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে=

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতার পারমার্থিক ভাবার্থ ছাড়াও এই তাৎপর্য্যপূর্ণ কথাগুলির একটা ইতিহাসগত অর্থ হয় এবং সেটি রাষ্ট্রনীতির বা সমাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। অর্থাৎ দেশের পরিবেশ অনুকূল হলেই যুগ প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব ঘটে। এই যুগ প্রবর্ত্তকের অর্থ এমন কোন নির্ভরযোগ্য এবং সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি দেশের সঙ্কটময় সময়ে এসে যথার্থ পথের সন্ধান দেন এবং দেশকে সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। এরকম সবকালে সবদেশেই প্রায় ঘটে থাকে। অবশ্য আমাদের দেশে সম্ভবতঃ এবিষয়ে ভাগ্যের একটি পরিহাস দেখা যায় এই যে, যিনি আমাদের পথ দেখাবেন, দেশের সবচেয়ে সঙ্কটময় অবস্থায় তাঁকে আমরা হারাই। সবচেয়ে যাকে প্রয়োজন, তিনি আর আমাদের মধ্যে তেমনভাবে থাকেন না। সভ্যতার চরম সঙ্কটকালে রবীন্দ্রনাথকে হারিয়েছি; রাষ্ট্র-নীতির চরম সঙ্কটকালে গান্ধিজীকে হারিয়েছি; আর যখন ভারত এক বিপর্য্যয়কর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে—তখন জবাহরলালজীকে··· এ ভাবার যেন শেষ নেই, তাই না?

সবিরাম প্রাত্যহিক বর্ষণের ও বুঝি ক্লান্তি এলো! একদিন হঠাৎ প্রখর সূর্য্যকিরণে চারিদিক ঝলমল; প্রাণের উচ্ছলতা প্রকাশ পেল সর্ব্বত্র: জড়, চেতন-অচেতন সবার ভিতরে। এই আনন্দ-মুখর দিনে আমিও পরম পুলকিত চিত্তে প্রকৃতির মনোহারিণী শোভায় মুগ্ধ হয়ে নব-নির্ম্মিয়মান হাঁসপাতাল সৌধের সন্নিকটে মাঠে বিশ্রামসুখে নিমজ্জিত হলাম। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা মন আত্মভোলার মত পরমপিতার চরণে শরণ নিল······ ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হলে সাময়িকভাবে অন্যসবদিকে মন যেন কেমন হয়ে যায়—ভগবৎ প্রেমের অতুলনীয় আনন্দে দিশেহারা মন খুসী খুসী ভাবে ভরে যায়। সে প্রেমের স্বাদ ভাষায় সঠিক প্রকাশ করা যায় না। মনের মণিকোঠায় অনুভব হয় মাত্র।······ সত্যই কি "প্রেম" মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য; প্রকৃত প্রেম কি; ভালবাসার মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি; মা, স্ত্রী, প্রেমিকা এদের সংজ্ঞা কি—কত প্রশ্নই না মনে জাগে। উত্তরও পাওয়া যায়,

তবে সেগুলি সর্ব্বজনগ্রাহ্য বা বাস্তব কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। প্রেমেই জগৎ চলে, প্রেমের তাড়নাতে চোর চুরি করে ; মহাপুরুষ আত্মোৎসর্গ করে। এককথায় মহামূল্য মানবজীবনে প্রেম—তা যে ভাবেরই হোক অপরিহার্য্য বলা চলে। প্রকৃত প্রেম কি, তার উত্তর হয়তো এত অল্প কথায় বোঝানো যায়না ; তবে সাধারণতঃ চলতি কথায় যে প্রেম বলা হয় সেটা প্রেম নয়—প্রকৃত প্রেম অভ্যাস সাপেক্ষ। ভালবাসার মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয় সকলের সঙ্গে মিলে এক হওয়া—স্বর্গীয় ভালবাসা স্বার্থদ্বেষহীন ও অতীব মধুর। বাস্তব জগতে আমরা মা, স্ত্রী, প্রেমিকা ওদের সংজ্ঞা বলতে বুঝি যথাক্রমে পূজনীয়া, স্বকীয়া ও পরকীয়া নয় কি ? আসল কথা, বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা স্বতন্ত্র। হৃদয়-মনের ও আপন নিজস্ব যুক্তিরাজ্য আছে—সেতো বুদ্ধির কাছে ভিখীরির মতো তার বুদ্ধি ভিক্ষা চায়না। আকাশের জল আর চোখের জল তো একই যুক্তি-কারণে ঝরেনা।

একদিন স্থানীয় "ইন্‌ষ্টিটিউট" এ গেলাম, বহু লোক—বেশীর ভাগই অল্প ও মধ্যবয়সী, নানা খেলায় বা কাগজ পড়ায় রত। সেখান থেকে যাই একটি মেস-বাড়ীতে। কয়েকজন রেলকর্ম্মী সেখানে বেশ জমিয়েছে মনে হয়। তাদের সহকর্ম্মীর পিতা বলে আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দিলেন—আর তাদের বাক্-যুদ্ধের ও খানিকটা রাশটেনে চলতে হল সৌজন্যের খাতিরে। শ্রী ভট্টাচার্য্য একবার কাঠমাণ্ডু (নেপাল) গিয়েছিলেন বেড়াতে। পথের মনোরম দৃশ্যে মোহিত হন তিনি—আরো বেশী বিমোহিত হয়েছিলেন স্থানীয় এক বিবাহিতা রমণীর রূপে-গুণে ও ব্যবহারে। তিনি প্রথমে তাহা ইন্দ্রজাল বা সত্যজাল তাই ঠিক করতে পারেননি। তার ঠোটে সলজ্জ মধুর হাসি, মুখে সব সময়েই শিশির মধুমাস, আফগানিস্থান—হিন্দুস্থান বিরাজ করত। কপাল আফগানিস্থানের শীতের বরফের মত শুভ্র আর কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংশুকের মত রাঙ্গা। কথায় তার সাথে পারা সুকঠিন, বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও তিনি বাস্তব এবং খাঁটী জ্ঞানের

দাবী রাখেন এবং তা যথার্থই। ঐ বিদুষী মহিলার কাছেই তিনি প্রথমে শুনেছিলেন যে সাধনা না করে কোন কিছু হয়না-মনকে শান্ত, সমাহিত করে নিয়ে একমনে সাধনা। ফল নির্ভর করে কামনার দৃঢ়তার উপর। পালোয়ানের উপদেশ পড়ে মাংসপেশী সবল হয়না, ডাক্তারী বই পড়ে পেটের অসুখ সারেনা। মনকে ও শান্ত করতে হয় উপযুক্ত ভাবে মনের ব্যায়াম করে। আর ঠিক পথে চলছে কিনা তার পরীক্ষা—প্রতিভার সাধনার পরে মনটা প্রফুল্লতর মনে হবে, ক্লান্তিবোধ হবেনা। পালোয়ানরা ও বলেছেন প্রতিবার ব্যায়াম করার পরে শরীর বেশ হাল্কা ও ঝরঝরে মনে হয়। না হলে বুঝতে হবে ব্যায়ামে গলদ আছে। আমাদের শাস্ত্রে ও আছে—"তীব্র সংবেগানাম্ আসন্ন" অর্থাৎ আবেগ তীব্র থাকলে ফল আসন্ন। সত্যই মেসের নানা আলোচনার ভিতরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সবাইকে সমান তৃপ্তিদেয়। শ্রী কে, কে, পাল (সবাই বলে "কামিনী-কাঞ্চন") যদিও খুবই কৃষ্ণকাল (শ্যামাঙ্গ নয়), তবু কোকিল কাল, কৃষ্ণ কাল বলতে বলতে তিনি কতই না উপমা দিলেন। কাজল যতক্ষন দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ—সে কালো। চোখে যখন মেখে নিই, তখনতো আর তার কালিমা দেখতে পাইনা। সে তখন সৌন্দর্য্য বাড়ায়—আর তিনি ও এই সভায় নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকারে সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছেন, ইত্যাদি। প্রত্যুৎপন্নমতি তার আছে বিলক্ষণ। গত ১৫ই আগষ্ট "ইনষ্টিটিউটে" একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন---স্থানীয় তেলেগু রেলকর্ম্মীরা। আর তাতে সবকটি গানই ছিল পুরানো চেনা গান অনেকেরই সেজন্য অপছন্দ হয়েছিল, আর তাই নিয়ে গোলমাল। আমাদের "কামিনী-কাঞ্চন" (হেতুটা বুঝে নিয়েই জোর চেঁচিয়ে উঠলো, কেন, চেনা গান লোকে শোনেনা ? নূতন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা সর্ব্বপ্রথম চেনা বই এর সন্ধান করিনা ? জলসাঘরে, গিয়ে ও প্রথমে খুঁজি চেনামুখ এবং বলতে নেই পরপারে গিয়ে ও চেনামুখই খুজি নাকি ? অদ্ভুত এই কালো ছেলেটি !

নূতন জায়গার কথা বলার যেন শেষ নেই। কিন্তু অনেক দূর

এগিয়েছি মনে হয়, তাই ইতি করা দরকার। বিরাম বোধ হয় দরকার বহু কারণেই। মনোজ্ঞ রচনা না হলে পাঠকের বা শ্রোতার তৃপ্তি হয়না, ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আর আমি জানি এটাও ঐ না হবার দলে। বোধন হলেই যেমন বিসর্জ্জন অবশ্য আসে, তেমনি বেড়াতে বেরুলে ঘরেও তেমনি অবশ্য ভাবে ফিরতে হয়। শাশ্বত সত্য কথা। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য হয়—তবে সেটা ঘটনা নয়, দুর্ঘটনা মাত্র। হঠাৎ একদিন ঠিক করা গেল, পরদিন সকালে রওনা হব—আর কাজেও তাই। মন যখন বাতাসে ভর নেয় তখন দুর্বার গতিতে সে আপন পথে চলবেই। আমি ও বিনা বিপত্তিতে রেল ভ্রমণ সমাপ্ত করি পরদিন হাওড়ায় পৌছে।

সুমহান মহাবালেশ্বর

Cal—Bombay—Poona—Mahabaleswar—Bombay—Calcutta.

হাওড়া বোম্বে ত্রিসাপ্তাহিক জনতা এক্সপ্রেস যোগে (ভায়া এলাহাবাদ) বোম্বে রওনা হই পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর সংরক্ষিত কোচের বাথ রিজার্ভ করে। আমাদের দলটি ছিল মোট পাঁচজনের (দুজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ)—বয়োজ্যেষ্ঠ আমি স্বয়ং। পূর্ব্বে কয়েকবার বোম্বে এসেছি বলে পথের কথা এখানে বিস্তারিত আর লিখলাম না। তবে এবার আসি ভায়া এলাহাবাদ, ভায়া নাগপুর নয়। ট্রেন বোম্বে "দাদার" পৌঁছায় ৭ই অক্টোবর তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুঘন্টা পরে ; কারণ পথে পথে মাঠের মাঝখানে গতি বিরতি—যেটা প্রায় স্বাভাবিক নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে শুনলাম। পূর্ব্বাহ্নেই তার পেয়ে জামাতা বাবাজী তাহার মোটরযানসহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল দাদার ষ্টেসনের প্লাটফরমে। সেই গাড়ী ও আর একখানি ট্যাক্সী নিয়ে আমরা অগৌণে চেম্বুর পৌঁছাই জামাতা বাবাজীর নিজ ফ্লাট বাড়ীতে। সবাই মহাখুসী—শারদীয়া সপ্তমীর খুসীর আমেজ যেন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। চা-টা সমাধা করে বিশ্রাম, আর বিশ্রামের পর স্নানাহার—রাজসিক না হলেও বিশেষ কম নয় আর কি! চাপানের সময় যে কথাটা খচ্ করে মনে লাগে সেটা বলব কি? আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ চা-শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম উৎপাদক—অর্থাৎ বৎসরে ৮৩ কোটি পাউণ্ড—আর এর পরেই হল সিংহলের স্থান—বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৫১ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু চায়ের সঙ্গে চিনির উৎপাদনের কথাটা মোটেই প্রীতিপদ্ নয়। ভারতের উৎপাদন বাৎসরিক মাত্র ৩০ লক্ষ মেট্রিকটন, কিন্তু কিউবা ৬০ লক্ষ মেট্রিকটন, আর ব্রেজিল উৎপাদন করে ৩৪ লক্ষ মেট্রিকটন। এর কি একটা সুরাহা হবেনা?

মহানন্দে বেড়াই কয়দিন—কাজকর্ম্ম নেই, প্রায় "খাই আর

শুই" অবস্থা। জামাতা, নাতি-নাতনী নিয়ে আমরা নজনের সংসার, সারাদিন হৈ চৈ করে কেটে যায়। অন্য কোন কথা মনে আসতে দেয়না এত হৈ-হুল্লড়ে। এরই একদিন "ইণ্ডিয়া গেট" থেকে আমরা দুজনে বোম্বের অনতিদূর সমুদ্রবক্ষে "এলিফান্টা কেভস্" যাই মোটরলঞ্চ সহযোগে (যাতায়াত ভাড়া বর্তমানে জনপ্রতি ৩.৫০ পয়সা)। এলিফান্টা কেভসের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দিয়েছি বলে এখানে আর পুনরুক্তি করলাম না। আর একদিন বেড়াতে যাই আত্মীয় বাড়ী "বাইকুল্লা"। রেলকোয়ার্টারে অনেক গল্পগুজবে বা স্বচ্ছন্দালাপের পরে সেখান থেকে সদলবলে যাই "কোলাবা" আর এক আত্মীয় বাড়ী, মিলিটারী অফিসারের বাংলোতে। চমৎকার সাজানো-গোছান বাড়ী, পরিবেশও মনোরম। রাত্রে বহুতর রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যে ভূরিভোজনের পরে জামাতা বাবাজীর নিজ গাড়ীতে আমরা সবাই চেম্বুরের বাড়ীতে, পৌঁছাই রাত্রি প্রায় ১২ টার সময়। ট্রাফ্রিক ঐ সময়ে কম থাকায় বোম্বের প্রশস্ত আলো-ঝলমল রাস্তায় গাড়ী চলে দ্রুততালে— দীপাবলীর জন্য প্রস্তুত বিশেষভাবে সজ্জিত বিপণীশ্রেণীর পাশ দিয়ে। ঢুলুঢুলু ভাব চোখে কিন্তু মনে যেন সেই চির পুরাতন—না জানাকে জানার অদম্য আগ্রহ। বাড়ী পৌঁছেই যেন অবিলম্বে শয্যায় তার সমাধি।

চেম্বুরের গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা খুব জাঁকজমক সহকারে সুসম্পন্ন হয়। দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান পূর্ব্বভারতের সবচেয়ে বড় উৎসব==কিন্তু পশ্চিম ভারতে বা দক্ষিণ ভারতেও কম যায়না তবে কোথাও হয়তো নামের কিছু হেরফের আছে, যেমন "দশেরা" উৎসব (অর্থাৎ দশহরা বা বিজয়াদশমী)। মহালয়ার মেঘ ও বর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে শারদীয়া মহাপূজার বিরাট মণ্ডপটী নির্ব্বিঘ্নে সুসজ্জিত হয়—রাত্রিবেলা আলোকসজ্জা আরো চমৎকার—বোধহয় দীপবালীকেও হার মানায়। শুনেছি শিবাজী পার্কে কোলাবার পূজাও বেশ ঘটা করে সাড়ম্বরে—নানা বিচিত্রানুষ্ঠানাদি সহ—সবার মন আকর্ষণ করে। সার্ব্বজনীন উৎসবে প্রস্তুতি পর্বটাই বিরাট,

যেমন বিরাট তার পূজার পরে প্রসাদ বিতরণ। পূজার চারদিনই সারারাত্রি জলসা, যাত্রাগান, নাটক, ম্যাজিক, বিচিত্রানুষ্ঠান, মনোজ্ঞ প্রদর্শনী, বন্যাত্রাণ তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি অবিরত চলতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে মণ্ডপে ছোটদের ভীড় সর্ব্বাধিক—রং বেরঙের নূতন পোষাকে খুসী মেজাজ যেন সবার প্রাণে আনন্দের ঝলক—দুঃখ কষ্ট যেন ঐ সময়ের জন্য হঠাৎ কোথায় গা ঢাকা দেয়। পূজার আনন্দ যেন পূজা মণ্ডপে প্রতিমার আবরণ উন্মোচনে সুরু—বড় বড় কর্ত্তারা তাই সব অনুষ্ঠানে মহামায়ার আরাধনার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। কেহ বলেন মা মহামায়া ভারতের ভাব ও ভাবনা ধ্যান-ধারণার এক পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। চিরন্তন ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক। শুধু দেবীর বাইরের আবরণ উন্মোচন করলেই হবেনা, অবিদ্যার আবরণও উন্মোচন করতে হবে আমাদের অন্তর থেকে। দেশে যখনই দুঃখ, দৈন্য-দুর্দ্দশা দেখা দেয় তখনই শক্তির আরাধনার প্রয়োজন বেশী। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে সংগ্রামী মানুষ ক্ষণিকের আনন্দ পাবার আশায় এই কয়টি দিনের জন্য কতই না অপেক্ষা করে থাকে।

কলিকাতায় শুনেছি এবার পূজা কমেনি; বারোয়ারী পূজাই প্রায় ৯০০। এই সুদূর পশ্চিমের বোম্বাই শহরে মোট পূজার সংখ্যা প্রায় ২০০-এর মত হবে। চেম্বুরের গান্ধী ময়দানে উচ্ছল, উদ্বেল প্রাণমাতানো পূজার কয়টা দিন (+ রাত্রিও) সত্যিই পরম আনন্দদায়ক; যেন বান এসেছে আনন্দের সাগরে। চেম্বুরে যে এত বাঙ্গালী পরিবার আছে তা এই জনসমুদ্র না দেখলে বোঝা যায় না। বন্যা আমরা দেখেছি আগেই এবার প্রত্যক্ষ করি আর এক বন্যা—বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের বন্যা। 'এখানে নেই সকালে শিশির ভেজা শিউলি ফুলের সমারোহ, সন্ধ্যার আলো-আঁধারে কাশফুলের মনমাতানো দোলা—কিন্তু যা আছে তাই কি যথেষ্ট নয়? ক'দিনই মাঝে মাঝে বর্ষণ হয়েছে, কিন্তু আনন্দের জোয়ার খানিক কমে গেলেও ভাঁটা কখনই পড়েনি। শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার শিশু ও নরনারীর প্রার্থনায় কিম্বা উৎসবমও সকলের

বেপরোয়া ভাব দেখে করুণাময়ের কৃপায় জল সংবরণ হল। সারারাত তিন খানি একাঙ্ক নাটক অভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠান হল নবমী পূজার রাত্রে—সে কি প্রচণ্ড ভীড় !! অবশ্য ভীড় শুধু রাস্তায় বা মণ্ডপেই সীমাবদ্ধ নয় ; রেস্তোরাঁগুলিতে, সিনেমাহলে, পার্কে-ময়দানে ও দুর্দ্দান্ত ভীড়।

এবার বর্ষা বিদায় নিতে না নিতেই এলো শারদীয়া মহোৎসব — শিশির ভেজা শিউলিফুলের সমারোহ — দুর্গাপূজা। দেখতে দেখতে যেন মহামায়ার সপ্তমী—অষ্টমী—নবমী পূজা শেষ হয়ে গেল। বিসর্জ্জনের বিদায়লগ্নে সবাই যেন মনমরা, দুঃখিত নানা কারণেই। শীত একটু একটু করে জাকিয়ে বসবে মনে হয় এবার। উদ্বোধন হলে বিসর্জ্জন হবেই আমরা জানি, তবু কেন এত দুঃখ ? তিন দিন আনন্দ উচ্ছলতার পরে পূজামণ্ডপের সানাই এর সুরে বিদায়ের করুণ মূর্চ্ছনা ! ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টায় বিসর্জ্জনের ধ্বনি। পুরললনাগণ নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন। আরতি-নৃত্য, ধুনুচি-নাচ সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব্ব সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন হয়। নিরঞ্জন শেষে প্রতি বাঙ্গালীর ঘরে বিজয়ার কোলাকুলি ও প্রীতি বিনিময় হয়। বহু অবাঙ্গালী পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবও এই ব্যাপারে মনেপ্রাণে যোগ-দান করেন। শিবপুর বি ই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সর্ব্বশ্রী অমিয় কুমার মিত্র ও সুকুমার মজুমদার (মেদিনীপুর) এর সাথে এখানে হঠাৎ দেখা হয় ও নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা হয় আনন্দ কোলাহলের মধ্যে। এই সঙ্গেই এ বছরের মত চারিদিনের দুর্গোৎসব শেষ।

দ্বারকাধাম, প্রভাসপাটন, যাওয়া বন্ধ হল কারণ প্লাবনে রাস্তাঘাট সব গোলমাল হয়ে গেছে। পরে "গোয়া" বেড়াতে যাব ভেবে ষ্টেসনে গিয়ে সংরক্ষিত আসন সংগ্রহের চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না ; অথচ আর আমাদের বেশী দেরী করার উপায়ও নেই। অনেক জল্পনা কল্পনা করে ঠিক হয়েছিল—এখান থেকে পুনা হয়ে ট্রেনে করে "মারগাও", আর সেখান থেকে ট্যাক্সি করে

"কোরনালিম" হয়ে গোয়ার রাজধানী "পানাজি" (বা পানজিম)। সেখানে কয়েক দিন থেকে ট্যাকসি করে এদিক ওদিকে দর্শনীয় মনোরম সব নূতন জায়গা বেড়িয়ে সমুদ্র পথে বোম্বে ফিরব। কিন্তু "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এবেলা নাকচ হয়ে গেল। কোলভা বীচ, গ্যাসপার ডায়াস বীচ, পণ্ডাতে শ্রী মঙ্গেশ মন্দির, শ্রী শান্তদুর্গার মন্দির, সপ্তকোটীশ্বর মন্দির, নৌকাযোগে মনোরম জুয়ারী নদীতে ভ্রমণ, সেণ্টক্যাথারীন গীর্জা সব, সবই নস্যাৎ হয়ে গেল একেবারে। মানুষ চায় এক, হয় আর এক— যাহোক, "তার' ইচ্ছাই পূরণ হবে", যদিও সব সময় এই চিরন্তন সত্য ও যেন মনে থাকেনা আমাদের। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, আমরা অগৌনে "পুনা—মহাবালেশ্বর" যাব বেড়াতে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কলিকাতা রওনা হব। সুমহান মহাবালেশ্বরের কথা অনেক শুনেছি—যাবার আনন্দে মন উৎফুল্ল—জাগ্রত মহাবালেশ্বর (মহাদেও) সন্দর্শনে চলেছি আমরা পাঁচজন—কতইনা আনন্দ !! ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুনা শহর বেড়ান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত শোভা পরিদর্শন, তীর্থ ভ্রমণ, সবই হবে এক সাথে—খুব মজা নয় কি ?

পুনা—সেকেন্দ্রাবাদ একসপ্রেস যোগে বোম্বে "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস" থেকে আমরা দুপুর ১২।৪০ মিঃ এর সময় রওনা হই। (টিকেট জন প্রতি = দ্বিতীয় শ্রেনী ১২.৫০ পঃ) সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময়ে পুনা পৌছাই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। ষ্টেসনের অনতিদূরে "হোটেল অলঙ্কারে" (তেতলার রুম নং ২৯) অস্থায়ী আস্তানা ঠিক করি—দৈনিক ৪৫্ টাকার বিনিময়ে। উক্ত হোটেলের আসবাব পত্র ও বন্দোবস্ত ভালই। হোটেলের অবস্থান ও পরিবেশ রুচিকর ; ম্যানেজার মিঃ আগরওয়ালার ব্যবহার ও তৃপ্তিকর। অলংকার সিনেমার পাশে বিখ্যাত "শের-ই-পঞ্জাব" হোটেলে "চিকেন-মসলা ও ফ্রাইড রাইসে "রসনা তৃপ্তকরে অগৌণে হোটেলের সুকোমল শয্যায় ধরাশায়ী বা শয্যাশায়ী হই।

প্রাতরাশের পরে ট্যাকসি করে বেড়াতে বের হই ম্যানেজারের

পরামর্শ অনুসারে—পুনা শহরের সমস্ত দর্শনীয় দর্শনের বাসনায়। ২।৩টী সুরম্য উদ্যান (বিশেষ করে চিড়িয়াখানা সংলগ্ন মনোমুগ্ধকর ফোয়ারা শোভিত উদ্যানটী), বাঁধের নিকটে বিরাট নবনির্ম্মিত সেতু, কস্তুরবা সমাধি, (পরিবেশ সত্যি শান্ত ও মনোরম), ছোট্ট কিন্তু জাকজমকপূর্ণ চিড়িয়াখানা বিশেষতঃ "বোটিং" (নৌবিহার) ও "টয়ট্রেন" (খেলনা রেলগাড়ী) ছেলেমেয়েদের পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক। সিন্ধিয়া ছত্রী, পার্ব্বতী মন্দির (+কৃষ্ণমন্দির ও কার্ত্তিক মন্দির), লক্ষ্মী বাজার ও আকর্ষনীয়। "ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি" (জাতীয় প্রতিরক্ষা মহাবিদ্যালয়) দেখবার প্রবেশ পত্র পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করা হয়নি বলে ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। হোটেলে ফিরে আহারান্তে বিশ্রাম ও রাত্রে "কিশোর কুমার নাইট" দর্শনের প্রস্তুতি। বৈকালেই টিকেট সংগ্রহ করি-প্রতি টিকেট ৭্ টাকা হিসাবে। নৈশভোজ সমপনান্তে ৮।।০ টার সময়ে গাড়ী করে রওনা হই মেডিক্যাল কলেজ গ্রাউণ্ডের উদ্দেশে—যেখানে বিরাট জনস্রোত অবিরাম গতিতে চলেছে "কিশোর কুমার নাইটের" জন্য। রাত্রি ৯টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত সমানে চলল—নায়ক, কমেডিয়ান ও প্রডিউসার কিশোর কুমারের গান ও মাঝে ১ প্রখ্যাত কলাকার দীনেশ হিঙ্গুরানীর "ক্যারিকেচার"। হরেক রকম আনন্দ ধ্বনির মধ্যে গান শেষ হল রাত ১২ টায়। অতঃপর বাড়ী ফিরে বিশ্রাম।

পরদিন "শের-ই-পঞ্জাব" হোটেলে লাঞ্চ সেরে ট্যাকসি করে রওনা দেই পুন্যতীর্থ, প্রকৃতির রানী মহাবালেশ্বর। প্রবেশ পথে "লেকের" পাশে গাড়ীতে ৫জন আরোহীর জন্য মোট ১০্ টাকা জমা দিতে হয় মহাবালেশ্বর মিউনিসিপালিটীর টোল কালেকশান আফিসে। বৈকাল প্রায় ৫ টার সময়ে গন্তব্য স্থলে পৌছাই। বাস স্টাণ্ড ও বাজারের নিকটেই "হোটেল রাজেশ", [ফোন নং ২১৪], পাশাপাশি ২২।২৩ নং কামরা নেই দৈনিক জন প্রতি ১৬্ টাকা হিসাবে (খাওয়া-থাকা সহ)। মালিক মিঃ প্যাটেল গুজরাটের অধিবাসী, উদার ও সজ্জন। রান্নাঘরের কাজ সব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মনের দ্বারা সম্পন্ন হয়—হোটেলে খদ্দেরের ইচ্ছা অনুযায়ী টেবিলে পৃথক

ভাবে রসুন বা পিয়াজ সরবরাহ হয় অবশ্য। খাদ্য ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত চমৎকার।

সরকারী "টুরিষ্ট বুরো"তে গিয়ে খবরা খবর করে একখানা "গাইড ম্যাপ" কিনে নেই। প্রাচীন কালের শিবাজী অর্চিত জাগ্রত দেবতা মহাবলেশ্বের (মহাদেবকে) সভক্তি প্রণাম জানাই। গুরুগম্ভীর পরিবেশ, মন্দির গাত্রে রয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতিকৃতি—সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, সর্প, মর্কট ইত্যাদি। এই জন্তু প্রীতির কোন তাৎপর্য্য আছে কিনা জানিনা। আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম এই কথা ভেবে যে এই অতিপুরানো, অপূর্ব্ব সুন্দর শিল্পকর্ম্ম গুলি মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আজও অক্ষত রয়েছে। পুরোহিত ও পরিবেশ মনে দেয় দোলা, পরম প্রপাস্তি আনে মনে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের রমনীয়তা ভোলবার নয়—শীতের ভিতরে ও যেন কোন কঠোরতা নেই, আছে রম্যতা পত্রপুষ্পে, ফলফুলে আর গনমানুষের হৃদয়ে। স্থানীয় লোকের চেহারা, ব্যবহার, পথেঘাটে উদ্ভিন্নযৌবনা রমনীকুলের হাস্য-লাস্য মোটের উপর সবারই ভাল লাগে মনে হয়। হরিদ্বার বা অন্যান্য দুর্গম পাহাড় থেকে আনীত নানা ঔষধ বিক্রয়ের ফেরীওয়ালা, স্থানীয় সম্বর জাতীয় হরিণের চামড়ায় জুতো বিক্রেতাদের সমারোহ, হোটেলে হোটেলে তাদের চমক লাগানো বক্তৃতা কখন কখন বিরক্তিকর মনে হয়।

হোটেল ম্যানেজার মিঃ প্যাটেলের নূতন "অ্যামবাসেডর" চড়ে বৈকালে আমরা বের হই বিশেষ দ্রষ্টব্য "১৪ পয়েন্ট" দর্শনমানসে। (যাতায়াত ভাড়া ৩০্ টাকা)। "লিঙ্গমালা জলপ্রপাত", "কার্টিস পয়েন্ট" (৪৫১০ ফিট), "নিড্‌ল পয়েন্ট", "ইকো পয়েন্ট," "আর্থার সীট" (৪৪২১ ফিট)—এখানেই আছে "ম্যালকম পয়েন্ট" ও "টাইগার স্প্রিং"—"সাবিত্রী পয়েন্ট", "গায়ত্রী নদী", "মারজোরী পয়েন্ট", "এলফিনষ্টোন পয়েন্ট", প্রাচীন মহাবালেশ্বর মন্দির (৪৩৪৪ ফিট), পঞ্চগঙ্গা, "এলিফেন্ট হেড" (৪০৬৭ ফিট), বোম্বে পয়েন্ট (৪২৪৫ ফিট—যেখান থেকে সূর্য্যোদয় এবং বিশেষ করে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোরম ভাবে দৃষ্ট হয়। হোটেল থেকে

সবচেয়ে দূর হল "আর্থার সীট" (৮ মাইল), আর সব চেয়ে নিকটে হল হ্রদ (বোটিং এর সর্ব্বসুবিধা যুক্ত) - এক মাইল, যার পাশ দিয়েই যেতে হয় "কার্টিস পয়েন্টে"। কথিত আছে পল্লবরাজ মাল্লা মহাবালেশ্বরে শিবলিঙ্গ পূজাসমাপন করে ফিরবার সময় এই জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী এর নামরাখা হয় "লিঙ্গমালা" জলপ্রপাত।

কলিকাতার প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও অধ্যাপক ডাঃ এস, কে, দুবে'র সহিত হঠাৎ দেখাহল এই লিঙ্গমালা জলপ্রপাতের সন্নিকটে। সামান্য সৌজন্যালাপের পরেই ছাড়াছাড়ি। আশা আবার দেখাহবে এখানে ও কলিকাতায়। তিনি ছিলেন "প্যারাডাইস হোটেলে, কলিকাতা রওনা হবেন ২২।১০ তারিখে। তার সঙ্গী ও নিকট বন্ধু শ্রী শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (৩৬) সহিত আলাপ হল। বেশ অমায়িক ও গুণীলোক। তিনি অবিবাহিত হলে ও সংসারের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতাই আছে তার। রসিক জনোচিত অনেক কথাই তিনি বললেন—আর জানালেন তার কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) বাড়ীতে যাবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। বেড়াতে এসে তিনি এক বিষম পীড়ায় পীড়িত—কাউকেই বিশেষ কিছু বলতে চান না। আমার ও "হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস" কিছু আছে জেনে আমার নিকট সংক্ষেপে যাহা বললেন—

(১) বিরক্তিকর সর্দ্দিতে ভুগছেন, নাক ঝাড়লেও কোন উপশম হয় না, অথচ মুক্ত বায়ুতে ভাল লাগে।

(২) অল্প আহারে ও মনে হয় গুরু ভোজন হয়েছে, ভুক্ত দ্রব্যাদি যেন ঠেলে উপরদিকে উঠছে, উদর এত পরিপূর্ণ যে সম্মুখ দিকে নত হতে কষ্ট হয়।

(৩) মূত্রনালী ও মলদ্বারে সড়সড় করে, যেন পিপীলিকা ঘোরাফেরা করছে। প্রস্রাব মিষ্টিগন্ধ যুক্ত বোধ হয়।

(৪) রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা স্বপ্নে দেখে প্রায়শই।

আমি তাহাকে "ফেরাম-আইওডেটাম" তিন ডোজ খেতে বলি। ডাঃ দুবেজী নিশ্চয়ই কিছু কিছু ঔষধ সঙ্গে এনেছেন, তার কাছ থেকে ৩।৬।৩০ শক্তি যাহাই থাকুক না, উক্ত ঔষধ তিনঘণ্টা পরে পরে তিনমাত্রা খাবার ব্যবস্থা দেই। পরদিন সকালে আমাদের হোটেলে খবর দিতে বলি—ধারণা ছিল, ঔষধে নিশ্চয়ই উপকার হবে। সত্যি হলও তাই! খুব ভোরে শ্যামলাল বাবু এসে হাজির। একগাল হেসে বললেন, "ফিস্" বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, দু ডোজেই কিস্তি মাৎ, "আরো খাবার দরকার আছে কিনা ইত্যাদি।" আমি তাকে আরো একমাত্রা খেতে বলি পরদিন প্রাতে। আমার কলিকাতার ঠিকানা নিলেন ও তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে চলে গেলেন। কলিকাতায় ফিরে তার সাথে দেখা করি, আর এখন এমন হয়েছে যে মাঝে মাঝে দেখা না হলে মন যেন কেমন কেমন করে। তিনিও বন্ধুত্ব অটুট রেখেছেন তার সুমহান আন্তরিকতাপূর্ণ কৃতজ্ঞতায়। আমি তার বিচিত্র বহু ছোটবড় কবিতা পড়েছি—এত কাজের মাঝে কখন তিনি এসব চর্চ্চার সময় পান তাহা সত্যি বোঝা কঠিন। তার দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনের প্রেমের খণ্ডকাব্যগুলি তেমন সুরুচিকর না হলেও অশ্লীল নয়। তিনি ছন্দকারে বহু পত্রের প্রাপক আর উত্তরও দিয়েছেন নানাছন্দে, নানা আবেগ মূহুর্ত্তে। তার অনুমতি নিয়েই আমি কয়েকখানা থেকে একটু উদ্ধৃতি আপনাদের নিবেদন করছি। রসিকজনের বয়োসন্ধিক্ষণে হয়তো ভাল লাগবে।

I বান্ধবীর কাছ থেকে পাওয়া—

(১) আবার যখন আসবে তুমি
একটু বেশী সময় নিয়ে এসো,
অনেক বেশী সময় নিয়ে গল্প করা যাবে।
জীবনটাকে অনেক বেশী স্বপ্নে ভরা যাবে ॥
এইখানে এই বিছানায়
তুমি বসবে আমার পাশে,
(তখন) সাহস করে হয়ত তোমায় জড়িয়ে ধরা যাবে।

এসেই তুমি এমন করো
যেন আমার চেয়ে কাজই বড়—
যদি না থাকতো কেমন করে জীবন সার্থক হবে ?

(২) শিকল দিয়ে শুধু বাঁধা যায় দেহ
ভালবাসায় বাঁধা যায় মন।
দেহমন উপহারে থেকে যায় স্মৃতি
তাই দেওয়া প্রয়োজন ॥
বাহুর ডোরে বাঁধা যায় ক্ষণিকের তরে
কামনার ধন থেকে যায় দূরে।
মধুর আবেশে শুধু প্রাণের পরশে
হৃদয় মন সব ওঠে ভরে ॥
নিঠুর পরাণে বাজেনা কি ব্যথা তব
ওগো মন-চোর ?
তুমি নীরব নিভৃতে চাহ কি ভুলিতে
নিস্বার্থ এই প্রেমডোর ?

(৩) ভোগসুখ যা কিছু, কভু না রাখিও কালকের তরে।
কত কিছু হতে পারে, পলকে প্রলয় ঘটে গ্রহের ফেরে ॥
অনিত্য জীবন-যৌবন, সবই যেন প্রায় শেষ।
এসো ভুঞ্জি পরমানন্দ, যেন নাহি থাকে ক্লেশ ॥
গোপন মিলনে, উছল আনন্দে ভরেদাও মন এই আকিঞ্চন,
সোনা মোর, করোনা রাগ, এই ক্ষুদ্র আবেদন ॥
অনেক আবোল-তাবোল হল বলা, বিদায় মাগি তাই।
রাগ করোনা আর, এসো পুনঃ আদর জানাই ॥

II বান্ধবীর নিকট প্রত্যুত্তর=

(১) কবিতা কারণে পরমানন্দে জানাই ধন্যবাদ
ওগো গুণী।
লহ, লহ হৃদয়ের বাণী, মধুছন্দে গাঁথা
আমি জানি ॥
সুন্দরী তুমি, ললিত কোমল তব তনুমন।

সপ্রেম কামনায় মিলিবারে চাই অনুক্ষণ ॥
মধুমাসে মনোরম, মনোরমা মনরঞ্জিকায় ।
বিধি বামে বুঝি বিষম হল, এই ছিল হায় ॥
কত আশা ভালবাসা, বৃথা মান অভিমান ।
তৃষিতে মনোলোভায়, মন করে আনচান ॥
প্রতিদিন প্রতিকাজ, মন তোমা চিন্তে অনুক্ষণ ।
কোকিল কুহনে, মধুর গুঞ্জনে ভরে দিও মন ॥
বুঝেও বোঝনা, মম মন যাতনা, ওগো সুনয়না ।
প্রেমের আনন্দে মজিয়ে মজাও, প্রাণ প্রিয় ললনা ॥

(২) পিতার চেয়ে মধুর মাতা,
মাতার চেয়ে বধূ ।
বধূর চেয়ে মিষ্টি শালী,
সবার সেরা মধু ॥
সব বয়সে পরম প্রিয়—
তুলনা নেই কভু ।
মধুর চেয়ে মিষ্টি সে যে—
আমার পরাণ বধূ ॥

(৩) (ক্ষণে মনে হয়) তিলেক না হেরি ও চাঁদ বদনে
মরমে মরিয়া থাকি ।
প্রাণের পরশে মধুর প্রণয় ওগো,
কত কথা, সবই যেন বাকী ॥
কায়মনবাক্যে তোমার পরশ পাই
প্রতি অঙ্গে, নানা রঙ্গে ।
অধরে অধর রাখি, মধুর আবেশে
কত লীলা, কত ছন্দে ॥
চটুল আঁখির চকিত চাহনি,
হানে প্রাণে কামনার বাণ ।
কার সাধ্য তায় রুধিতে পারে—
তনুমন তাই করিনু দান ॥

ভৌমানন্দে দেহমন হইলে অবশ
ক্ষণ কামনার তৃপ্তি।
গোপন মিলন, সব ভালবাসার
গড়ে তোলে দৃঢ় ভিত্তি ॥

আমায় ক্ষমা করবেন—মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে ভিন্ন রাজ্যে এসে গেছি। চলুন ফিরি এবার!

হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে বাস ষ্টেসনে আসি সবাই মিলে প্রাতে ৯টায়। ডিলাক্স বাসে সিট রিজার্ভ করে সরাসরি বোম্বে (দাদার) পৌঁছাই বেলা ৪টার সময়ে। পথে পাহাড়ী নদী—"তয়ালী"র উপর পুল পার হই প্রায় ১০টার সময়—ওরই অপর অংশ বিখ্যাত "সাবিত্রী" নদী। অপর একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সেতুর উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলতে লাগল—জলশূন্য অগভীর নদী। নদী না বলে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি বলাই বোধ হয় সমীচীন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম পূর্ব্বে এই নদীই ছিল রাজ্যের শ্রী ও সমৃদ্ধির উৎস স্বরূপ। "মাহের" বড় বাস জংশন ষ্টেসন—পৌঁছাই ১১.১৫ মিঃ; এখানে গাড়ী থামে ১/২ ঘণ্টা। সানন্দে পুরী, মিঠাই, লস্যি এবং কিছু ফল সহকারে দ্বিপ্রাহরিক ভোজ সমাধা করি। জানালা দিয়ে দেখছিলাম দুপাশের নয়নাভিরাম নিসর্গ দৃশ্যাবলী। ঘন ঘন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন হচ্ছিল। কোথাও পথের দুধারে, কোথাও বা একপাশে সরকারী নয়া "প্লানটেশন"—শাল, মালাতা ও অন্যান্য বৃক্ষের সমারোহ। কখন দেখি সুদূর প্রসারি সোনালী রং এর ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা রাস্তার ধারে "ক্যাক্টাস" গাছের ঝোপ বা বিরাট জলাশয়ে প্রস্ফুটিত শালুকের মেলা গৃহস্থ-বাড়ীতে চালের উপরে বিরাট বিরাট পাকা শশা, কোথাও পুরাণো কালের সুবৃহৎ মসজিদ। বিচিত্র দেশে বিচিত্রতর দৃশ্য দেখে মন পুলকিত হয়। দূরান্তের পাহাড়গুলি যেন একটু কেমন কেমন কৃষ্ণ-নীল—বেশীরভাগই কেন, প্রায় সব পাহাড়গুলিই চূড়াহীন, অর্থাৎ থ্যাবড়া বা সুউচ্চ শৃঙ্গবিহীন। অনেক পাহাড়ের উপরিভাগ

বেশ সমতল দেখা যায়। চলতে চলতে আর একটা জলপ্রপাত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্য্যের আলোয় জলরাশি চিকমিক করছিল। "মিনি নায়েগ্রাই" আমরা বলি—এই চোখ ধাঁধানো, মনমাতানো সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না। স্বল্প উচ্চ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল জল রাশি ভৈরব নিনাদে নীচে পড়ছিল। এই জলপ্রাবাহকে আবার বইয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন খালের মারফতে সেচের উদ্দেশ্যে। প্রপাতের সন্নিকটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য শিলাখণ্ড। ইটাপুর ষ্টেসনে পৌঁছাই ১২।১৫ মিঃ। সরকারী সংরক্ষিত বনের (কর্ণাটীক স্যাংকট্যুয়ারী) ভিতর দিয়ে বাস চলেছে দ্রুতগতিতে (১.৪৫ মিঃ)—হঠাৎ দেখলাম সানুদেশে বিরাজমান এক নয়নাভিরাম "শিবলিঙ্গম", আর চারিদিকে তেঁতুল, আতাফল, আম ইত্যাদি গাছের পুরাণ বাগান। চারিপাশের সমতল পাহাড়ের উপর সুউচ্চ গোলাকার তুঙ্গ পাহাড় ও শিবলিঙ্গের মতই প্রতীয়মান। প্রকৃতির কতই না রম্যরচনা—বিস্ময়াবিষ্ট মনে করুনাময়ের কৃপার কথা ভাবতে ভাবতে আত্মহারা হয়ে যাই। পানভেল ষ্টেসনে সুমিষ্ট "গোল্ডস্পট" ও পরে ইক্ষুরস-সুধায় তৃপ্ত করি রসনা। বোম্বের "ব্যাক-ওয়াটারস" দেখে বুঝতে পারি যে বোম্বের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। সহরের উপকণ্ঠে গগনচুম্বি হর্ম্যরাজি এখান থেকেই দৃষ্টি গোচর হয়। "থানা" পৌঁছাই ৩।১০ মিঃ আব দাদার ৩।৫০ মিনিটের সময়। শীতের (?) পড়ন্ত রোদে যেন একটা বিষাদের সুর বেজে ওঠে। সারাদিন বাসভ্রমণ এখানেই শেষ। সেখান থেকে ট্যাকসি করে যাই "চেম্বুর" সন্ধ্যার প্রাক্কালে—তাড়াতাড়ি বোম্বে ফেরার জন্য সবাই সেখানে খুশী !!

চেম্বুরে আমাদের ফ্লাটের নীচের তলায় এক গুরুজী মহারাজ এসেছিলেন তার শিষ্য বাড়ীতে। দৈনিক বহু শিষ্য ও শিষ্যা তার দর্শনে, আশীর্ব্বাদে ও প্রসাদে ধন্য হতেন। একদিন "অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন" (+ তুমুল হৈ-চৈ) এবং তার সমাপ্তিতে বিরাট ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ—সে এক তুলকালাম কাণ্ড। জনস্রোত যেন আর কমেনা!

গুরুজী মহারাজ একদিন তার এক শিষ্যের গাড়ীচড়ে গেলেন—ফিরলেন পরদিন। আমাদের পুনঃ পুনঃ ওখানে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য যেতে পারিনি। তবে আমাদের ঘরের জানালাপথে প্রতিনিয়তই তার দর্শন মিলত। তিনি সর্ব্বদা ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত থাকতেন। শিষ্য-শিষ্যা অগুন্তি এবং সবাই বেশ ধনী বোঝা যায়। তার এক মুখ্য শিষ্যের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল—তার নিকট জানিতে পারি যে গুরুজী মহারাজ জড়তা ও মূর্খতা বর্জন করে সবাইকে উদারতা অবলম্বন করতে বলেন—আর উপদেশ দেন সত্য-প্রেম-পবিত্রতার সহিত প্রার্থনা করতে, ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করতে। তার চেহারা ও বাণীগুলি সবই ভাল, কি বলেন ?

এরই মধ্যে একদিন আমরা কয়েকজন মিলে দেখে এলাম ওয়াদিয়া-ব্রাদার্সের "বসন্ত-ষ্টুডিও"। আমাদের ফ্লাটের উল্টাদিকে রাস্তার অপর পাশে অবস্থিত এই বিরাট "ষ্টুডিও"—সুবৃহৎ বাগান বাড়ী, ভিতরে আছে পৃথক পৃথক স্টুডিও হল, ছোট্ট পাহাড়, রঙীন ঝরণাসহ সুসজ্জিত কমল কানন, ক্যান্টিন, নিভৃতকুঞ্জ, পানশালা, আরো কত কি! "মেক-আপ-ম্যান" মিঃ ঠাকুরের সাহায্যে অনায়াসে আমরা সিনেমা সুটিং দেখবার জন্য পাশ সংগ্রহ করি। বহু দেবদেবীদের পশ্চাদপটে রেখে শ্রীমতী অনীতা গুহ লক্ষ্মীদেবীর অভিনয়ে ক্রন্দনরতা: "তুলসী-বিবাহ" ছবির অপূর্ব্ব দৃশ্য। ঐদিন আরো কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীও ষ্টুডিওতে হাজির ছিলেন দেখলাম। আলোয় আলোময়—সে এক এলাহি ব্যাপার।

বোম্বেতে দুদিন বিশ্রাম নেবার পরে কলিকাতা মেল (ভায়া নাগপুর) যোগে হাওড়া রওনা হই শুক্রবার ২৩।১০ তারিখে সন্ধ্যায় প্রাক্কালে। "স্লিপার কোচে" আমাদের শয়ন স্থান সংরক্ষিত ছিল (৪২-৪৬) বলে কোন অসুবিধা হয়নি। নৈশভোজ করি গাড়ীতে বসেই—বাড়ীর তৈরী নানাবিধ মুখরোচক খাবার ও মিষ্টি দ্বারা। পরিমাণ প্রচুর ছিল বলে মিষ্টি তারপরদিনের জন্য ও কিছু থেকে গেল। পরদিন প্রাতে "বাদনারা" ষ্টেশনে প্রায় ৭-৩০ মিনিটের

সময় জলযোগ সম্পন্ন করি সোল্লাসে। এখানেই আমাদের কামরায় আলাপ হয় মিঃ এ, কে, ব্যানার্জীর সাথে। (বাড়ী পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা)। তিনি প্রায় এগারো বৎসর বিলেতে থাকার পর চাকুরী নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন চারিমাস পূর্ব্বে। ভালমন্দ কথা, গল্প-গুজব, বৈদেশিকি, হালফিল খবর, নানাপ্রকার কথায় বেশ কেটে গেল সারাদিনটা। মিঃ ব্যানার্জীর "মুখরোচক গল্পগুলি" বেশ মজার। তিনি ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তার কাছে শোনা এক অদ্ভুত গল্প যতটা মনে পড়ে বলছি। সরকারী চাকুরীরত এক দক্ষিণ দেশীয় ভদ্রলোক (হিন্দীভাষা তার ভাল করে রপ্ত হয়নি) বিহারে গিয়েছিলেন। এক বাদলার দিনে তিনি পাটনার মহাফেজখানার সামনের রাস্তায় যাবার সময়ে দেখলেন তার পাশাপাশি এক সুন্দরী মহিলা জলে ভিজে পথ চলেছেন। সৌজন্যের খাতিরে তিনি মহিলাটিকে অনুরোধ করলেন—"আইয়ে, মেহেরবানি করকে হামারা ছাতিকা অন্দরমে আইয়ে"। শুনেই মহিলা তার ছাতা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোককে কয়েকঘা বসিয়ে দেন। ভদ্রলোক হতভম্ব, নির্ব্বাক! পরে যখন জানলেন যে হিন্দীতে "ছাতা" মানে "বুক", তখন তিনি "উজবুক" বনে গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনো কোন কাজে ওমুখো হবেন না। সত্যিতো, যে ভাষায় 'ছাত"কে আকার-ইকার-উকার যোগদিলে মানে বদলে এমন বিপর্যয় হয়, সে মুল্লুকে আবার মানুষ যায়?

কথায় কথায় রাজনীতিও এসে পড়ে—রসিয়ে কথা বলার কায়দা মিঃ বানার্জীর আয়ত্বের ভিতরে। তিনি বলেছিলেন—আজকাল গান্ধীবাদ থেকে সুরু করে সব-বাদই প্রায় ধরবাদ; কেবল বিয়ে বাদে। বর বাদ দিয়ে বিয়ে একেবারেই হয় নাকি!! সিনেমা জগতে বিদেশে ও এদেশে "চুম্বন" নিয়ে কত সোরগোল! কিন্তু তাহার মতে চুম্বন ও তার ক্রিয়া দেহে-মনে, গানে-কাগজে সর্ব্বত্রই ছিল, আছে ও থাকবে। উদ্ধৃতি দিলেন—

(১) "নয়নের কাজল বয়ানে লেগেছে"—কৃষ্ণচন্দ্র দে,

(২) "আগে ফাগু নাগরী নয়ানে"

অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে। ব্রজভাষায় কীর্ত্তন। আরো অনেক আছে।

দ্বিপ্রহরে "লাঞ্চ" (রামপাখীর মাংস—ভাত ইত্যাদি), বৈকালে চা-পান, রাতের আহার—সবই রেল কোম্পানীর কেটারিং এর কৃপায় গাড়ীতে বসেই সেরে নেই। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত চা, ফল, মিষ্টিতো আছেই পৃথক ভাবে, বিভিন্ন ষ্টেসনে। কেন জানিনা, প্রথম রাত্রে ঘুম হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় রাতে বেশ ঘুমিয়েছি উপরের বাংকে। পরদিন প্রাতে (রবিবার ২৫শে অক্টোবর হাওড়া পৌছাই ১০।১০ মিঃ এর সময়—নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুঘন্টা পরে। অতঃ কিম ? এখান থেকেই বাড়ী ফিরি।

ভারত পরিক্রমা

১। মুখবন্ধ,
২। আগ্রার পথে,
৩। আগ্রা (+ ফতেপুরসিক্রি),
৪। ঝাঁসি,
৫। খেজুরাহো,
৬। জবলপুর,
৭। গোয়ালিয়র,
৮। জয়পুর,
৯। কিম্বদন্তীর দেশ,
১০। আজমীর (+ পুষ্কর ও সাবিত্রী),
১১। পথের সাথী,
১২। চিতোর,
১৩। উদয়পুর,
১৪। মাউন্ট-আবু (+ দিলওয়ারা),
১৫। ভেরাবল (+ সোমনাথ ও প্রভাস),
১৬। দ্বারকা (+ ভেটদ্বারকা),
১৭। বোম্বে,
১৮। এবার পূর্ব্বাভিমুখে,
১৯। তিরুপতি (+ তিরুমালাই)।
২০। মাদ্রাজ (+ মহাবলীপুরম্ ও পক্ষীতীর্থম),
২১। পণ্ডিচেরী,
২২। ত্রিচিনাপল্লী (+ তাঞ্জোর)
২৩। রামেশ্বরম্,
২৪। মাদুরাই,
২৫। ত্রিভেন্দ্রাম,
২৬। কন্যাকুমারী,
২৭। সুচীন্দ্রম্,
২৮। এর্ণাকুলাম্ (+ কোচিন ও গুরুভাইয়ুর),
২৯। প্রত্যাগমন পর্ব্ব,
৩০। ভারতপরিক্রমা যাত্রাপথের ম্যাপ।

গমনে বামনশ্চৈব সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবম্।

১। মুখবন্ধ।

জল্পনা কল্পনা অল্প না হলেও কম হয় নি। সময়োপযোগী যুক্তিসহ আলোচনায় লাভ আছে বৈকি॥ মোটামুটী স্থির হয়েছিল যে আমাদের ভ্রমণে কোন পিছুটান থাকবেনা, থাকলে চলবেনা - এই স্বল্প কালের সফরে, সর্ত আরোপ করা থাকবেনা এবং অভ্যাসের দাসত্বও মানা চলবেনা। সত্য কথা বলতে কি, আমরা কোথায় কোথায় ঠিক যাব তাও সুনিশ্চিত হয় নি—আমাদের কাছে দেওঘর আর দ্বারকা, নাগপুর আর নৈনিতাল, কাশী আর কাঞ্চীতে কোন প্রভেদ নেই। তবে নূতন জায়গা দেখার কৌতুহল অবশ্যই ছিল সবার—এখানে সবাই এক। ঘুরে বেড়ানই বোধ হয় ভ্রমণ, যেটার লক্ষ্য কিছু নেই। ভ্রমণের আনন্দ চিরকালই ছিল, আছে ও থাকবে—অনেকের আবার নূতন দেশ দেখার ইচ্ছাটা যেন নেশার মত। যা হোক অবশেষে আমরা রবিবাব, ১৩ই অক্টোবর তারিখে শুভযাত্রা সুরু করি সিদ্ধিদাতা গনেশের নাম স্মরণ করে। ছয়জনের ছোট দল; "কম সামান, বহুৎ আরাম" রেলকোম্পানীর এই বহু প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি মনে রেখে যথাসম্ভব কম মালপত্র নিয়ে, প্রথমে আমরা আগ্রা অভিমুখে ছুটলাম। "পথের কথা পথই বলে দেয়" এই প্রবাদ বাক্যটীর বাস্তবতা ও সারমর্ম্ম আমরা পুনরায় সম্যকভাবে উপলব্ধি করলাম আগ্রা পৌছেই। ঠিক হল, আগ্রা থেকে রাজস্থানের দিকে অগ্রসর না হয়ে আমরা মধ্যপ্রদেশে যাব এবং সেখান থেকে পুনরায় আগ্রা হয়ে আমরা পূর্ব্ব-পরিকল্পনানুযায়ী (?) রাজস্থানে গমন করব। সুসাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের লেখায় পড়েছিলাম ট্রেনের কামরায় অস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারলে তিনি খুব আনন্দ পান। অসংখ্য নরনারী, ছোট ছোট কাহিনী, তার মনে লিপিবদ্ধ করে চলে যায়। নাম পরিচয় কিছু নেই, শুধু মানুষ—মানুষের ছোট ছোট গল্প ইত্যাদি। জানিনা কেন, আমার মনেও বারবার এই কথাই উঠছিল।

ভারত পরিক্রমা বলতে সঠিক যাহা বোঝায়, এ কাহিনী তাহা নয়। অল্প কথায় উত্তরখণ্ড ও পূর্ব্ব খণ্ডের বিবরণ এখানে নেই—পৃথকভাবে তাহা বলবার আশা রইল।

২। আগ্রার পথে।

তৃতীয় শ্রেণী সংরক্ষিত শয়ন কামরায় আরামেই আমরা টুনডলা পৌছাই ১৫ই অক্টোবর ভোর ৪।৩০ মিঃ এর সময়। গাড়ী বদল করে বেলা ১০।১৫ মিঃ এর সময় আমরা আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট, (১২৬৭ কিঃ মিঃ, ভাড়া মেল তৃতীয় শ্রেণী, টাকা ৩৪।২৫ পয়সা)। গাড়ীতে চড়লেই যেন সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার উদ্রেক হয়, হজম হতেও দেরী হয়না কিন্তু। কিউল, মোকামা, দানাপুর, মির্জাপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি যে ষ্টেসনে যাহা পাওয়া যায়, কিছু কেনা চাই, আর মন্দও লাগেনা। এই যন্ত্রের যুগে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তা ভাবনার সময় ফুরিয়ে গিয়েছে, ইচ্ছা মরে গিয়েছে। এ যেন একটা নূতন যুগ, নূতন মানুষ—মৌমাছির মত শুধু মধু আহরণেই ব্যস্ত সারাদিন। কিসের জন্য এ মধু সঞ্চয়, সে প্রশ্ন মনেই জাগেনা। জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ এসব অবান্তর চিন্তা! এই হালকা হাওয়ায় যেন নেশা আছে, নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিতে ভালই লাগে, কি বলেন ? আনন্দের কথা, ভাগ্যের কথা ও বটে—আমাদের কামরার সাথী, শর্ম্মাজী ও তার পরিবার ; সাধারণ ভাবে একটি ব্যতিক্রম বলা চলে। তিনটি ছেলেমেয়ের বড়টীর বয়স এখনও পাঁচ হয়নি। বহু বিঘোষিত পরিবার পরিকল্পনার "দো ইয়া তিন বাস্" মনে হয় যেন আরো বেশী করে কার্য্যকরীভাবে প্রচার দরকার। শ্রীমতী শর্ম্মার আবার ও শরীর খারাপ—স্বাভাবিক কারণেই—তিনি যাহা বললেন। তিনি কিন্তু বেশ মিশুক ও সদালাপী—তাঁর চেহারার ও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। ডাক্তার এন, সি, ঘোষের কম্পারেটিভ মেটেরিয়া মেডিকায় পড়েছিলাম—ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগীর শরীর গঠনের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন

Fair, Fatty and Flabby ($=F^3$) বিদ্যমান থাকলে অন্যান্য লক্ষণগুলি বিচার করে ঐকটি নির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে আশু উপশমের সম্ভাবনা থাকে। শ্রীমতী শর্ম্মার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র আমার কিন্তু ঐ "F^3" 'র কথা মনে পড়ে। বয়স মাত্র ২৮ তিনি বললেন বিনা দ্বিধায়; বাংলা ও ইংরাজী বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না। তারা দিল্লী যাবেন বেড়াতে, চাকুরীস্থল কলিকাতা। শর্ম্মাজী কিন্তু সহজে থামবার বা দমবার পাত্র নন। আধুনিক কালের জীবনদর্শন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা তিনি বললেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ঠাকুর কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক বই তিনি পাঠ করেছেন এবং কথায় কথায় উদ্ধৃতি ও দিতে তিনি পারঙ্গম দেখলাম। কথার মাঝে তিনি বলেছিলেন যে গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময়ে আগে আগে উঠা ভাল, কিন্তু নামবার সময়ে কোন জিনিষ ভুলে গিয়েছে কিনা দেখে সকলের শেষে নামতে হয়, এটাই মহাজনবাক্য। বেশ খাঁটি কথা নয় কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "সংসার সংগ্রামের অর্থ ইন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ। ইন্দ্রিয়দের দমনের জন্য মনকে বিশেষভাবে তৈরী করতে হয়—মনই সব। বাইরের শত্রু জয়করার চেয়ে মনের শত্রু জয়করা শক্ত। সংসারে থাকার অর্থ আর কিছু নয়, কেবল সংসারকে অতিক্রম করার প্রস্তুতি।" সাধারণ সংসারীদের জন্য স্ত্রীভোগ বিষয়ে ও ঠাকুরের নির্দ্দেশ ছিল—২।৩টি ছেলেমেয়ের পর স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। একথাটির অর্থ সুদূর প্রসারিত—যেনমটি ছিল তখন, এখনো তেমনটি আছে, বরং আরো বেশী সত্য নানাবিধ কারণে। আমাদের জাতীয় সরকার ও হালে এই নীতিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বহুভাবে ইহার প্রচার পরিকল্পনা করছেন। মানুষই পারে ইহা করতে, পশু পারেনা। কিন্তু তার জন্য চাই জ্ঞানীর দৃষ্টি ও বিজ্ঞানীর অনুভব। শর্ম্মাজীর বাচন ভঙ্গি সত্যই অদ্ভুত। আলোচনায় বেশ আনন্দ পাই, কত কথাই তিনি বললেন। গৃহস্থ ধর্ম্মের সাধনা সন্ন্যাসের প্রস্তুতির জন্য। তার মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় ঈশ্বরকে—আর সেই পাওয়াই

সবচেয়ে বড় সত্য। এই সত্যের পথ শংকর দেখিয়েছেন জ্ঞানের মধ্যে, চৈতন্য দেখিয়েছেন ভক্তির মধ্যে, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন ত্যাগের মধ্যে। তিনি বলেছেন, ত্যাগ না হলে কিছুই হয়না, জন-সেবাও না, ঈশ্বরতো দূরের কথা। শম্মাজীর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি, কেমন ?

৩। আগ্রা (+ ফতেপুরসিক্রি)।

গতবৎসর ও আমরা দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, এলাহাবাদ, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, কাশী, হরিদ্বারও হৃষিকেশ গিয়েছিলাম বলে আগ্রায় অতিরিক্ত সময় না কাটিয়ে "ঝটিকা সফর" ঠিক করে আমরা সেমত প্রস্তুতি নিয়ে গাড়ী করে নিম্ন-লিখিত স্থানগুলি প্রত্যক্ষ করি ঃ—

প্রবাসী বাঙ্গালী হোটেল—মণ্টুবাবুর, "দি ক্যালকাটা হোটেল", ছিপিতলা, আগ্রাতে আস্তানা নিয়ে নরসুন্দরের সাহায্যে সুন্দর হবার চেষ্টা করি। সেখানে শ্রীসূর্য্যকুমার সিংহ (ওরফে বক্‌বক্‌-বাবু) নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের (?) সাথে পরিচয় হয়। এই নামটি (বক্‌বক্‌বাবু) প্রথমে উল্লেখ করেন আমাদেরই দলের এক সহযাত্রী এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহা অনুমোদিত হয় সোল্লাসে! কেন যে এধরণের লোকদের হোটেল কর্তৃপক্ষ হোটেলে এসে নানা-প্রকারে উৎপীড়ণ করতে বাধা প্রদানে বিরত থাকেন, তাহা ঠিক বুঝতে পারিনাই। স্বল্পস্থায়ী ভ্রমণ বিলাসীরা তার নাগালের ভিতরে আসবেই, আর হয়তো উভয় পক্ষেরই অল্পবিস্তর লাভ-লোকসান জড়িত আছে ইহার ভিতরে—একবার ভেবে দেখবেন। তিনি একাই বহুরূপে দেখা দেন যাত্রীদের কাছে—তিনি একাধারে জ্যোতীষি, ডাক্তার, কালীভক্ত ও শহরের সবজান্তা প্রখ্যাত ব্যাক্তি। তাকে পাশ কাটিয়ে চলতে বিশেষ বেগ পেতে হয় যাত্রীদের, আর তার খপ্পরে পড়লে অর্থব্যয় অনিবার্য্য মনে করি। সার্থক—নামা "বকবকবাবুর" অধিক প্রয়োজন গল্প শোনবার ও আদায়দেবার মত নবাগত লোকের !

১। "তাজমহল-কালের কপোতলে শুভ্র সমুকুল।" সম্রাট শাজাহান তার প্রিয় মহিষী মমতাজের সমাধির উপরে ৩০০ কোটি টাকা ব্যায়ে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে উহা তৈরী করেন। এই মর্ম্মর সৌধ তৈরী করতে ২০ বৎসর সময় লেগেছিল। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য জিনিষের মধ্যে তাজমহল অন্যতম।

কালের কপোলতলে রহে চিরউন্নত শির।
ভালবাসা ছিল—আছে—থাকবে, জানত যে বীর॥
সৌন্দর্য্যের আকর—এযে পরমাশ্চর্য্য সমাধি।
দেশ বিদেশের গুণীরা তাই মুগ্ধ নিরবধি॥
কত অর্থ মেহনৎ ব্যায়ে এই প্রেমের প্রতীক।
শাশ্বত সার্থক হোক হে সম্রাট নির্ভীক॥

২। অমর সিংহদ্বার (কেল্লা),

৩। খাসমহল (কেল্লা) সম্রাট শাহজাহান ইহা তৈরী করেন ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে।

৪। ইতমাদ্ উদ্দৌল্লা কা মকবরা। সম্রাট আকবর আরম্ভ করেন এবং তৎপুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন ১৪ বৎসর পরে। মোট ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় তৈরীতে।

৫। আকবর বাদশাহের সমাধি—সিকান্দারা। সম্পূর্ণ সাদা মারবেল পাথরে তৈরী। নুরজাহান তার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে উহা তৈরী করেন ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে যমুনা নদীর বামতীরে।

৬। বুলান্দ-দরওয়াজা, ফতেপুরসিক্রি। ভারতের অতি বিশাল সুউচ্চ তোরণ। সম্রাট আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ইহা তৈরী হয়।

৭। শেখ সলিম চিস্তির দরগাহ্, ফতেপুরসিক্রি। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তৈরী কাঠের উপর অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত এই সমাধি।

৮। দয়ালবাগ, আগ্রা। অপরূপ শ্বেতপাথরের মন্দির ও সৌধ। ইহার নির্মাণকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। দর্শনার্থীদের মন ভরে দেয় ইহার গঠনশিল্প, ভাস্কর্য্য ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আধুনিক শিল্পীদের শিল্পচাতুর্য্য।

(৪) ঝাঁসি

আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেসন থেকে পাঞ্জাব মেলযোগে দুপুরে রওনা হয়ে বৈকালে আমরা পৌছাই বেত্রবতী নদীতীরস্থ শহর ঝাঁসিতে। বর্ত্তমানে গাড়ীভাড়া তৃতীয়শ্রেণী, মেল জনপ্রতি ৭.১৫ পয়সা॥

ঝাঁসি নামটীর একটি মোহ মদিরতা আছে। ঝাঁসির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি মহিলার অসম সাহসের ইতিহাস। যত পুরা-কীর্ত্তিই এখানে থাকুক না কেন, এই ক্ষুদ্র শহরটির একমাত্র প্রাধান্য হল একটি বীর্য্যবতী রমনীর জীবন-মৃত্যুর ঐতিহাসিক খেলা, সেখানে লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। দু'শ বৎসর পূর্ব্বে পলাশী ও একশ বৎসর পূর্ব্বে ঝাঁসি একটি সংগ্রামের কাহিনী ইংরেজের ইতিহাসও ভুলিবেনা কোনদিন। এটা বড়ই আনন্দদায়ক যে বাঙ্গালীর সাহিত্যে ঝাঁসির রানী ও অন্যান্য বীর রমনীগণের গৌরবগাঁথা সকলের আগে প্রথম কীর্ত্তিত হয়। শাক্ত বাঙ্গালী চিরকালই শক্তির মূল্য দিয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিই হল "ঝাঁসির রানী ব্রিগেড" সৃষ্টি করা। নবভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে রানী লক্ষ্মীবাইকে এতবড় গৌরবদান আর কোন নেতাই করেননি। চট্টগ্রামের প্রীতিলতা, আসামের গুইডেলো, মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা, এরা সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া। কিন্তু লক্ষ্মীবাইএর এত রং, রস, আনন্দ বেদনা প্রচলিত আছে যে রানী দুর্গাবতী বা সুলতানা রিজিয়া পর্য্যন্ত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছেন।

রেলওয়ে রিফ্রেস্‌মেন্ট রুমে আমরা জলযোগ ও পরে "স্থুলযোগ"

সমাধা করি ॥ টাঙ্গা করে শহর ঘুরে বেড়াই। উল্লেখযোগ্য যেগুলি আমরা দেখেছি—

নেহেরু মিউজিয়াম,
রানী-কি-ঘোড়া,
কেল্লা, এবং
লছমীদেবী মন্দির, ইত্যাদি।

ঝাঁসির রানীর বীরত্ব আমাদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত। পথচলা-কালীন একটা বিশেষ ধরণের জামা পরিহিত কয়েকজন স্থানীয় মহিলাকে দেখলাম; গৃহস্থ পরিবার, নিশ্চয়ই কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে বাইরে যেতেছিলেন। উর্দ্ধাঙ্গে তাদের সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত একটী করে বিশেষ জামা স্কন্ধদেশ থেকে কটীদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান—এককথায় বলিতে গেলে কুচযুগ শোভিত পীনোন্নত বক্ষদেশের সামান্যতম অংশই আচ্ছাদিত, আর বাকীটা অনাবৃত। চলন দেখে মনে হল তাহারা স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল দেহ প্রায় অনাবৃত রেখেই পথচলতে অভ্যস্থ।

(৫) খাজুরাহো

ঝাঁসি থেকে রেলগাড়ী চড়ে হরপালপুর (ভাড়া জন প্রতি ১'১০ পয়সা, তৃতীয় শ্রেণী)—আর সেখান থেকে প্রাতে (১৭ই অক্টোবর) বাসে করে যাই খাজুরাহো --বিখ্যাত মধ্যযুগীয় মন্দির সমষ্টি দর্শন-মানসে। প্রাক্তন বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল রাজাদের রাজধানী ছিল এই খাজুরাহো (খাজুরাহ্ বা খজুরাবটক্) বর্ত্তমানে ইহা মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত তীর্থস্থান। মধ্য রেলওয়ের হরপালপুর ও পাটনা ষ্টেশনের সহিত পাকা বাস রাস্তাদ্বারা যুক্ত। রাজা যশোবর্দ্ধনের পুত্র রাজা ঢাঙ্গার রাজত্বকালে কয়েকটি বৈষ্ণব মন্দির তৈরী হয় ইংরেজী ১০০০ খৃষ্টাব্দে (সিরকা ৯৫০)। এই চাণ্ডেল রাজবংশ সম্বন্ধে একটী জোরালো কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে চন্দ্রমা (চন্দ্রদেবতা) ও বারানসীর

রাজপুরোহিত হেমরাজের কন্যা হেমবতা থেকেই এই বংশের উদ্ভব। কুমারী হেমবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্রদেব একদা তাহাকে রতি-তালের (স্নানাগার) নিকট আলিঙ্গন করে নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন এবং দুজনে দুজনার মন দেয়া-নেয়ার কাজ গোপনেই সম্পন্ন করেন। যথাকালে চন্দ্রদেব চলে যাবার সময়ে তাকে বলে যান যে কর্ণাবতা নদীতীরে তার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাকে খাজুরাহো নিয়ে গিয়ে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করবে - মাহোবা রাজ্যস্থাপন করে সে সুখেশান্তিতে রাজত্ব করবে। সে কালিনজারে দুর্গ তৈরী করবে এবং ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে সে যজ্ঞসমাপনান্তে তোমার সমস্ত কলঙ্ক মোচন করবে। ছেলেই চন্দ্রবর্মা—খর্জুরপুরে যজ্ঞ সমাপনান্তে মহোবাতে অভিষেক উৎসব পালন করে রাজত্ব করতে থাকেন এবং খাজুরাহোতে ৮৫টী মন্দির স্থাপন করেন। বাইরে থেকে সহসা বুঝিতে পারা যায়না কি বিপুল ঐশ্বর্য্য উৎকীর্ণ রয়েছে খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে। কেবলমাত্র যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের জন্যই পৃথিবীর শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইহা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে তাহা নহে, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ বিচারকগণ এদেশে এসে ইহার আঙ্গিক কৌশল ও বিশেষ ভাব প্রকাশের বিস্ময়কর ভঙ্গিগুলি দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করে যান। খাজুরাহোর প্রতিষ্ঠা সত্যই জগৎ-জোড়া। ছাতারপুরের মহারাজা তার স্ত্রীপুত্রসহ এখানেই বাস করেন। সরকার থেকে "প্রিভিপার্স" পান—তাহাতেই খরচ চলে যায়। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ বিশ্বনাথ সিং বৃন্দাবনে গিয়ে বাংলার অদ্বৈত বংশের নীলমনি গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ছাতারপুরের রাজধানী রেওয়াতে এখনও রেলগাড়ী যায়নি, তবে প্রদেশের সর্ব্বত্রই মোটরপথের জালবোনা আছে। রূপকথার গল্পেরমত এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে—আধুনিক কালের বহিরঙ্গ, আর্ত্তনাদ ও ভালমন্দ বিন্ধ্যপ্রদেশে এখনো তেমন পৌঁছায়নি।

খাজুরাহোতে বহু হিন্দু ও জৈন মধ্যযুগীয় মন্দির বর্ত্তমান।

ভারতের অন্যান্য মন্দির থেকে এই স্থানের মন্দিরগুলি ভিন্ন ধরণের—ভিতরে বাহিরে মন্দিরগাত্রের কাজ নিশ্চয়ই পৃথক শিল্পীগোষ্ঠীর তৈরী—ভাস্কর্য্য, সৌন্দর্য্যবোধ, দেবদেবীর মূর্ত্তি, নাগমূর্ত্তি, যক্ষ-যক্ষিনী, শার্দ্দুলমূর্ত্তি, মিথুন ইত্যাদি সবই একটি পৃথক সত্ত্বা প্রকাশে ব্যস্ত। আলিঙ্গনবদ্ধ স্ত্রীপুরুষ, বিভিন্ন ভঙ্গীতে মিথুনরত নায়ক-নায়িকা তদানীন্তন রুচিবোধ ও বাস্তববাদই প্রমাণ করে। যতগুলি মন্দির কালের গতি ঠেকিয়ে আজও ভাল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে এইগুলি প্রধান বলে অনুমিত হয়ঃ—

(১) পশ্চিমদিকে—	(২) পূর্ব্বদিকে—	(৩) দক্ষিণদিকে
মাতঙ্গেশ্বর মন্দির,	পার্শ্বনাথ মন্দির,	দুলদেব মন্দির (প্রায় ৩মাইল দূর),
লক্ষণ মন্দির,	আদিনাথ মন্দির,	চতুর্ভূজ মন্দির ও
কাণ্ডারিয়া মহাদেব,	শান্তিনাথ মন্দির,	
জগদম্বা মন্দির,	(মূর্ত্তি ১৪´-০০" দীর্ঘ)	বিষ্ণু মন্দির
চিত্রগুপ্ত মন্দির,	জয়ারী মন্দির ও	(মূর্ত্তি ১১´-০০" উচু)।
বিশ্বনাথ মন্দির,	ব্রহ্মা মন্দির।	

ও সরকারী মিউজিয়াম—

(কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুনা সেন ইহার দ্বারোৎঘাটন করেন গত ১৮।১১।৬৭ তারিখে)।

পশ্চিমদিকে লক্ষণ মন্দির, কাণ্ডারিয়া মহাদেব, জগদম্বা মন্দির ইত্যাদি প্রবেশের পূর্ব্বে মুখ্যফটকের পাশের প্রকোষ্ঠে টিকেট কিনতে হয়—জন প্রতি ২০ পয়সা। কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরটিই সর্ব্ব-বৃহৎ এবং স্থপতি বিদ্যার বিশেষ নিদর্শন। ইহা ১২০-০" লম্বা চওড়া ৬৬´-১০" এবং উচ্চতা ১০১´-৯" আর মোট ৬৩০টী মূর্ত্তি খোদিত আছে এই মন্দিরে। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বহু পূর্ণাবয়ব অপ্সরা-অপ্সরীদের প্রেমাষ্পদ যুগলের, নৃত্যের, মিথুনের ও নানাবিধ ভাবধারার খোদাইকরা জীবন্তরূপ বর্ত্তমান। ভাস্কর্য্য অপরূপ ও অবিস্মরণীয়। দেখতে দেখতে মনে হয় যেন তাহারা সব নির্নীমেষ নেত্রে আমাদিগকেই নিরীক্ষণ করছে। বহির্দ্বারে

মকরবাহনে গঙ্গা, কুর্ম্মবাহনে যমুনা, খোদিত আছে—অন্তপ্র্কোষ্ঠে আছে মহাদেবের প্রতীক চিহ্ন—শিবলিঙ্গ। মোট দ্বাবিংশ মন্দির আছে এখানে, তবে সবগুলি আর মন্দির নেই এখন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত কয়েকটী, বাকী ১৩।১৪টী মন্দির (যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে এখনও মন্দির আখ্যা দাবী করে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এখানে অনেক হোটেল, বার ও লজিং আছে। বাসযোগে পুনরায় ঝাঁসি পৌঁছাই।

৬। জবলপুর।

ঝাঁসি থেকে জবলপুর যাই বাসে করে, সময় বাঁচাবার জন্যই বলা ঠিক। জবলপুর সিটি পর্য্যন্ত ২৩৫ মাইল—আর এখান থেকে "মারবল রক" আরো ১৩ মাইল—যানবাহনের সুবন্দোবস্ত আছে। পথে সাগর, ললিতপুর, দামো, প্রভৃতি শহর দেখলাম—মনে রাখবার মতই বটে। ললিতপুরে বাস থামলে বহু যাত্রী ওখানে ভোজন পর্ব্ব সমাধা করেন—বিশ্রামের জন্য গাড়ী প্রায় একঘন্টা থামে এখানে ১-১৫ মিঃ থেকে। মহকুমা শহর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন দালান নির্ম্মিয়মান দেখলাম। সাগর একটী জেলা শহর, সাগরের দুপাশ ঘিরেই বাসরাস্তা—জলাশয়টী সত্যই সাগরের মত বিশাল ও মনোরম। ছোট ছোট ঢেউ অবিরত প্রবহমান, কয়েকখানি ডিঙ্গিতে স্থানীয় লোকেরা মৎস্য শিকারে রত। "দামো", অন্যান্য কয়েকটী বড় জায়গার মত এটীও বেশ বড় বাস ষ্টেশন। হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, চা-পান-সিগারেটের দোকান সবই আছে। মাইকযোগে যাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন বাসের আসা-যাওয়ার সময় জানিয়ে দেওয়া হয় অনবরত। এখানে একটি নূতন "গ্রহ" নয়নগোচর হল—বড় বড় অক্ষরে হিন্দীতে পরিস্কার লেখা আছে রেষ্টুরেন্টের দরজার উপরে "জলপান গ্রহ" (গৃহ নয়)— মজার নয় কি ?

পথের শোভা নয়নাভিরাম। পথক্লেশ ভুলে প্রত্যেকেই, মনে হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মত্ত হয়—শারিরীক কোন গ্লানি

থাকিলেও তাহা হঠাৎ কেমন করে মিলিয়ে যায়। মনেপ্রাণে একটা নূতন উন্মাদনা আসে, যাহা ভাষায় সম্যক প্রকাশ করা কঠিন। রাস্তার পাশেই বনসংরক্ষণ বিভাগীয় কার্য্যালয়—দুধারে ফিকে-নীল কৃষ্ণনীল, ঘনহলুদ ও রক্তিম পাতাসহ বিবিধ প্রকারের বৃক্ষনিচয় প্রকৃতির অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার করছে। দূরান্তে বনানীর সবুজ শোভা শুধু মনোহর নয়, মনকে এক অনাস্বাদিত পথে রাঙ্গিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা, গৃহস্থ বাড়ীতে গোলা ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভর্ত্তি মাছ এখন কাবাকথা বলা চলে॥ কালের প্রভাবে মানুষ গ্রাম ভুলেছে, ভুলেছে গ্রাম্য সরস সরলতা, স্নিগ্ধতা ও শান্তি। এখন সবাইর মন শহরমুখী, কামনা শহরের বিলাসিতা ও ভোগ, যার অবশ্য সাথী অতৃপ্তি ও অশান্তি। যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের দিয়েছে আবেগের বদলে গতি, কিন্তু কোন দিকে? সময়ই সব নির্দ্দেশ দেবে ভবিষ্যতে! যতদূর জানি বাংলার মায়েরা দেবতার কাছে বিশেষ কিছু চান না, তারা চান না নিজের জন্য কোন মঙ্গল আশীষ। শুধু চান, তার সন্তান যেন ফলে-ফুলে চলনসই পরিপূর্ণতা লাভ করে। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে" এহলেই ওদের সব পাওয়া হয়ে যায়—সব কামনার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু জীবন-যুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত যে মায়েদের হৃদয়, তাদের চাওয়া কি বিরাট? না, তাদের চাওয়া অতি ছোট, অতি সামান্য। কিন্তু স্বার্থান্বেষী সমাজের কাছে এটুকু চাওয়াও বিরাট আকার ধারণ করে—এটুকুও তাদের গলকণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। যাক, মধ্যপ্রদেশে যেন কিন্তু ব্যতিক্রম মনে হয়। শত শত গোধন মাঠে চড়ছে, ২।১টি রাখাল বালক পাহাড়ায় আছে। দলের মধ্যে কোথাও বা ২।৩টি মহিষ ও আছে। গোধন কম না হইলেও যেন ভগ্নস্বাস্থ্য! গ্রামীন মানুষের চেহারা বেশীর ভাগ নিকষ কাল, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, একটু খর্ব্বকায় কিন্তু সাহসিকতায় ও বিশ্বস্ততায় সবার সেরা। মাঠে মাঠে সোনার ফসল ঘরে তোলার কাজে ব্যস্ত সবাই—স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সাথে কাজের সমান

অংশীদার—বোধ হয় বেশীই। এরা এখনও তেমন শহরমুখী হয়নি. আর সরকারী উদ্যমে গ্রামীন উন্নতির কাজ পুরাদমে চলছে দেখে খুব ভাল লাগল। সাগরের পারে বিশ্রামের সময় বৃষ্টি সুরু হলো, ঘনঘটা ও গর্জ্জন সত্ত্বে ও তেমন বর্ষণ হলোনা—বাসের ছাদে রক্ষিত আমাদের "হোল্ডল", "ট্রাঙ্ক" ইত্যাদি বেশগুছিয়ে ত্রিপলদ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলে আমরা নিশ্চিন্তে ছিলাম, তবু একবার উপরে উঠে গিয়ে ঠিক আছে কিনা দেখে এলাম। সাগরের দৃশ্য বর্ষনান্তে যেন আরো মনোহর—প্রকৃতি মায়ের কোলে আমরা লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত, তাহার স্নেহ—ভালবাসা দানের কথা বলে শেষ করা যায়না। রাত্রি ৮ ঘটিকায় আমরা জবলপুর পৌছিলাম—নিকটেই "রিপাবলিক ইনডিয়া হোটেল" নৌদ্রাব্রিজ, জবলপুরে আশ্রয় নিলাম। উত্তম রান্না ও পরিবেশের জন্য এই হোটেল বিখ্যাত। হোটেলের নেপালী ও স্থানীয় বয়গুলি বেশ চটপটে ও মিষ্টভাষী—কিছু কিছু ইংরেজী এবং বাংলা ও বলতে পারে। হোটেলের ম্যানেজার স্থানীয় লোক হলেও বেশ বুদ্ধিমান ও অমায়িক মনে হল। তিনি বাঙ্গালীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—তিনি বলেছিলেন যে বাঙ্গালীই ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান—বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে ও করে, অন্যরাজ্যে কাল তাহা নকল করে থাকে—বাঙ্গালী নিরীহ কিন্তু নির্ভীক, তারা শান্তভাবে হত্যা করতে পারে, হাসিমুখে মরতে জানে। ফাঁসীর মঞ্চে সে গান গেয়ে ওঠে।

পরদিন প্রাতে প্রথমে যাই "ধুয়াধার ফলস্" (নর্ম্মদার জলপপাত) দেখতে গাড়ীকরে। প্রায় ১৫০'-০" উপর থেকে এই জলধারা পতনের ফলে এক আশ্চর্য্য মনোরম দৃশ্যের অবতারণা, জল ফেনিল, জলকনা বিভিন্ন রংএ প্রতিভাত হয়ে দর্শকের মনোহরণ করে। মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য আবর্ত্তের টানে রঙীন জলরাশি ছত্রাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সূক্ষ্ম মেঘবিন্দুর আকারে। গভীর শব্দে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত—হেলে দুলে ফেনিল জলরাশি ঘোরগর্জ্জনের সহিত বিশাল পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দুর্ব্বার গতিতে নীচের দিকে চলেছে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ। অদূরেই বিখ্যাত "মারবল রক" (বিশাল

সমুন্নত শ্বেতবর্ণ পাহাড়)। আর দুদিকের সুউচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা। এখানে নর্ম্মদার গভীরতা ১৫০'-০" থেকে ৭৫০-০" পর্য্যন্ত কোন কোন জায়গাতে। সরকার বাহাদুর এখানে দুই ফারলং জায়গাতে নদীপথে নৌকাবিহারের সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতায়াতে প্রায় ৪৫ মিঃ সময় লাগে। অতীব মনোরম বলেই বহুকষ্ট করে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় দৈনিক। নৌকা-বিহারের মাঝপথে "ভুলভুলাইয়া" (বা গোলকধাঁধাঁ) সত্যই অবিস্মরণীয়। পুণ্যসলিলা নর্ম্মদার স্নানঘাটে ছোটবড় মৎস্যের আনাগোনা অনেক আনন্দ দেয় যাত্রীদের। অনেকে এখানে স্নানান্তে তর্পনাদি করেন, নৌকাবিহারের পরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে আরোহণ করে পূজা সমাপন করেন। স্নানঘাট থেকে প্রায় এক-মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত, ১০৮টি সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরে উঠতে হয়। কথিত আছে, রেবারাণী ঐ স্নানঘাটে তর্পনাদি পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেন ও ভবিষ্যতে এই পুণ্যতীর্থে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান স্নানঘাট ও সহজপথ (ধাপে ধাপে নামিবার সুগম পথ) তৈরী করে দেন। পাণ্ডারা তাই বলেন।

"মাতঃ নর্ম্মদে ত্বম্ জগত্তারণ, কষ্ট নিবারিণী;
দরশন কিয়েসে পাপ কাটে, দুঃখ দূর ভয়ে রেবারাণী॥"

নর্ম্মদার গতিপথ ও অরণ্যময়, দ্বীপময়, বনময় এবং আগাগোড়া যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় কাব্যময়। মাঝে মাঝে কুঞ্জবন, মাঝে মাঝে রঙীন পাখীরা গান গেয়ে ওঠে—অনন্ত শান্তি চারিদিকে। স্নানঘাটে শহরের দোকানে দোকানে বহু শ্বেতপাথরের ও রঙীন পাথরের তৈরী ছোটবড় নানা আকৃতির খেলনা, দেবদেবীমূর্ত্তি ও সংসারের ছোট ছোট কাজের জিনিষ তৈরী ও বিক্রী হয়। এটাও কুটিরশিল্প—এখানে শিশু, বৃদ্ধ, আবালবনিতা নির্বিবশেষে এইকাজ করে অর্থোপার্জ্জন করে।

৭। গোয়ালিয়র।

জবলপুর থেকে কাসে করে যাত্রা করি সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায়, আর গোয়ালিয়র পৌঁছাই আমরা প্রত্যুষে ৫।৩০ মিনিটের সময়। নেমেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সুরু "ঝটিকাসফর"। এটা আমাদের "ফাউ" কারণ আমাদের প্রোগ্রামে গোয়ালিয়রের স্থান পূর্ব্বে ছিলনা। গেয়ালিয়রের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষন দুর্গ (বা কেল্লা)। ইহা একটি টিলা পাহাড়ের উপর অবস্থিত, লম্বা প্রায় দেড় মাইল এবং চওড়া আধ মাইলের ও বেশী। কিম্বদন্তী আছে যে সূর্য্যসেন নামে এই অঞ্চলে একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ কিন্তু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। একদা শিকারের লোভে একটি মৃগশিশুর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি একটি টিলা পাহাড়ের আড়ালে চলে যান। রৌদ্র ও পথশ্রমে কাতর হয়ে সূর্য্যসেন তৃষ্ণার জল অন্বেষণ করতে করতে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসী দয়াদ্র চিত্তে অবিলম্বে তাহাকে একটি কুণ্ডের ধারে এনে পানীয় জলের উপর মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাকে পান করতে বলেন। জলপানের অব্যবহিত পরে সূর্য্যসেন দেখতে পান যে তার কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে। তখন সে ত্রাণকর্ত্তা সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চান এবং সন্ন্যাসীর যে কোন আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করতে প্রস্তুত বলে জানান। সন্ন্যাসী নিজনাম "গোয়ালিপা" বলে প্রকাশ করেন এবং (১) ঐ কুণ্ডটিকে জলাশয়ে পরিণত করা এবং (২) ঐ পাহাড়ে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর কালক্রমে ঐ জলাশয়টির নাম হয় সূর্য্যকুণ্ড এবং বলা বাহুল্য গোয়ালিপার নাম থেকে হয় গোয়ালিয়র। গোয়ালিপার নির্দ্দেশে সূর্য্যসেনের নূতন নামাকরণ হয় সূর্য্যপাল— এই পালবংশের রাজত্ব শেষ হয় মহারাজা তেজকরণের সময়। তিনি তার এক পারিষদ, পরিমলদেব প্রতিহারের নিকট শাসন-কার্য্যের ভার অর্পণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিবাহ করতে যান। বছরখানেক পরে মধুযামিনী যাপনের পরে সস্ত্রীক ফিরে এসে আর রাজ্যের দখল তিনি পান নি।

এখানে আমরা "টিপু টম্ব" (টিপু সুলতানের সমাধি, কেল্লা, রাজপ্রসাদ ইত্যাদি দর্শনান্তে ভিন্ন বাসে আগ্রা রওনা হয়ে দুপুরবেলায় আগ্রা পৌঁছাই। গোয়ালিয়রে বাসষ্টেসনে জনতার যেন শেষ নেই—সরকারী ও বেসরকারী প্রচুর বাস বিভিন্নস্থানে নিয়মিত যাতায়াত করে। বাচ্চা-বুড়ো ফেরিওয়ালারা ছোরা, ছুরি, কাঁচি, "ভারতবাদাম," ইত্যাদি বিক্রয় করে সারাদিন। মনে হয় এরদ্বারা যাহা উপার্জ্জন হয় তাতেই তাদের সংসার চলে যায় মোটামুটি ভাবে।

৮। জয়পুর ঃ

আগ্রা থেকে ট্রেনে উঠে রাত্রি ৮৷৩০ মিনিটে, জয়পুর পৌঁছাই ভোর ৪৷৩০ মিনিটের সময়ে। ষ্টেসনের বাহিরে "মহেন্দ্র হোটেলে" (লজিং) ঘরভাড়া নেই। ছোট্টঘর কিন্তু সুন্দর এবং "ফার্নিশড্"। কয়েকখানা ঘর তখনও খালি ছিল-যা পরদিন ভর্ত্তি হয়ে যায়। রাজপুতানার (অধুনা রাজস্থান) জয়পুর নানা কারণেই বিখ্যাত শহর—ঐতিহ্য ও অনেক। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বহুবর্ণা রূপ-নগরীর সার্থক পরিকল্পনা এবং এই নগরীর প্রতি অঙ্গ নির্ম্মাণের মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। আজ মহানূতন ডাক দিয়েছে যেন সবাইকে—জীবনের সর্ব্বব্যাপী চঞ্চলতা যেন প্রবল চেহারায় দেখা দিয়েছে। গাইডের নিকটে—শুনলাম যে শহরের লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষের মত আর আয়তন ও প্রায় ১০ বর্গমাইল। ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই শহর প্রায় ১৪৫০´-০০ ফুট উঁচু সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে। যোগাযোগের সর্ব্বসুবিধাযুক্ত এই স্থানে বিমানবন্দর, রেলষ্টেসন, ও পাকা বাসরাস্তার সুবন্দোবস্ত আছে। দিল্লী, আগরা, যোধপুর, প্রভৃতি স্থানে দৈনিক বাস যাতায়াত করে। ট্যাক্সি ও টাঙ্গাগাড়ী প্রচুর পাওয়া যায়। রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেলের অভাব নেই আবার রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, টুরিষ্টবাংলো, ইয়ুথ হোষ্টেল ও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে।

বাংলাদেশে বাই (বা বাঈ) শব্দটি সম্মানসূচক নয়; বাইনাচ ও বাঈজীকে আমরা অন্যচোখে দেখি। রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রে বাই (বা বাঈ) মহিলার উপাধি—যেমন মীরাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ। বাঈজী না বলে বাঈসাহেব বলারই বোধ হয় রীতি এখানে। জয়পুর, যোধপুর, মারওয়ার প্রভৃতি স্থানের লোকদের সাধারণতঃ মাড়ওয়ারী বলা হয়। তাদের পোষাক ও ভিন্ন ধরণের। পুরুষেরা মাথায় লাল মখমলের পাগড়ি, তাতে জরির কাজ ও চুমকি, পরণে বেলদার পাঞ্জাবী (রূপার চেনবাঁধা বোতাম সহ)। তার উপর কেহ কেহ বেগুণী মখমলের জ্যাকেট পড়েন। পাদুখানা ধূলায় ধূসরিত কিন্তু জরিবাঁধান নাগরা পরিহিত। মেয়েদের পোষাক বর্ণ-বৈচিত্রভরা, মুখখানি প্রায়ই ফুরফুরে ওড়নায় ঢাকা। ওরই ভেতর থেকে কখনও একটি বৃহৎ চক্ষুতারকার বিদ্যুৎঝলক বের হয়। মহিলারা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবতী ও লম্বা—আর তাদের স্বাস্থ্যের উপরিভাগ ঢাকা থাকে রেশমি কাঁচুলিতে—নিম্নভাগের নাভিদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত। কিন্তু ওরা জানে, সেই অনাবৃত অংশটায় মোহমদিরতা কম, কেহই সেদিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়না। দুই বাহুর সজীব স্বাস্থ্য দেখতে চমৎকার লাগে। শুধু আঙ্গুলের নখ নয়, আঙ্গুলগুলিও রং করা, চোখে কাজল আর পায়ে রং। রং কোথাও নেই রাজস্থানে কিন্তু রং নিয়ে মাতামাতি করে রাজস্থানীরা!

এখানে বহু দর্শনীয় সৌধ, মন্দির, বাগিচা ইত্যাদি যাত্রীদের মনোহরণ করে। আমরা যা যা দেখবার সুবিধা পেয়েছি সেগুলির বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করছি ঃ—

১। সিটি প্যালেশ (জনপ্রতি প্রবেশমূল্য ৪·০০ টাকা),

২। চিতোলিয়া গার্ডেনস্,

৩। জলমহল,

৪। হাওয়ামহল,

৫। আমের (অম্বর রাজবাড়ী ও জয়গড় কেল্লা),

৬। দেবী যশোরেশ্বরী মন্দির (শিলাদেবী),

৭। গলতাজীর মন্দির (প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে) ঋষি

গালবের নামে একটি সুবৃহৎ কুণ্ড আছে এখানে।

৮। গ্যাটোর ছেত্রী (৮ কিঃ মিঃ দূরে) অবস্থিত। জয়পুর মহারাজের স্মৃতিফলক, পূর্ণাকৃতি মর্ম্মরমূর্ত্তি ও দেবদেবীর বিগ্রহ আছে এখানে। রকমারী দর্শনীয় জিনিষগুলির মধ্যে বিভিন্ন মহারাজাদের বিরাট তৈলচিত্রগুলি সত্যই খুব আকর্ষণীয়।

ক) মহারাজা ইজ্জৎ সিং জয়পুরী,

খ) " রাম সিং,

গ) " মাধো সিং (প্রথম),

(তাহার বুকের ছাতি ছিল ৪'—৭")।

ঘ) মহারাজ প্রতাপ সিং এবং

ঙ) মহারাজা মাধো সিং (দ্বিতীয়)।

এখানে মন্দিরেব ভিতরে এক অখণ্ড জ্যোতি রক্ষিত দেখলাম। একটি সুবৃহৎ তালাবদ্ধ পাত্রের ভিতরে উহা রক্ষিত আছে—ছোট্ট সূচীছিদ্রপথে উহা দেখান হয়।

৯। গোবিন্দজি কি মন্দির—প্রত্যহ বেলা বারটার সময় উহার দরজা বন্ধ হয়। আমরা কীর্ত্তন ও ভজন শ্রবণান্তে প্রসাদ পাই এখানে। আজও ইহা বাঙ্গালী পূজারীদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বাঙ্গালীবটে তবে তাদের রাজস্থানী বললে বোধ হয় তেমন ভুল হবেনা। এই মন্দির বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী আছে—তাহা পরে বলছি।

১০। জয়পুর মিউজিয়াম—এই বিশাল সৌধের দরজায় উৎকীর্ণ আছে

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু কলারূপেন সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

দেয়ালের গায়ে একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ মহারাজার বিরাটাকার জীবন্ত ছবিগুলি সত্যই সুন্দর।

১১। যন্তর—মন্তর (মানমন্দির)। গণিতবিদ ও জ্যোতীষ বিদ্যা বিশারদ মহারাজা জয়সিংহ পাঁচটি মানমন্দির নির্ম্মান করেন—দিল্লী, কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও জয়পুর। এদের মধ্যে জয়পুরের মানমন্দিরটিই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জয়পুরের কথা বলে শেষ করা যায় না। সুসাহিত্যিক শ্রী সুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। জয়পুর শহরটি ছবির মত বলব কি? ছবির মত বললে কোন মানে হয়? মুখ হয় পদ্মের মত, চাঁদের মত, কিন্তু শহর কখনও ছবির মত হয়? ছবি কি বিশেষ কোন জিনিষ—ছবিতো সব জিনিষেরই হয়। লোকে বলে মহারাজ জয় সিংহ নাকি অনেক বিদেশী শহরের নক্শা এনে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের শিল্পশাস্ত্র মতেই শহরের পত্তন করেছিলেন। অনেকানেক কিম্বদন্তী প্রচলিত এখানকার নানা প্রাসাদ বা মন্দির বিষয়ে। কয়েকটা সম্মন্ধে কিছু বলছি ঃ—

১। অম্বর রাজপ্রাসাদ (বা আমের)—সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজ মানসিংহ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু পরের শতাব্দীতে সোয়াই জয় সিং ঐ কাজ শেষ করেন। অম্বর নামকরণ শিবের অম্বিকেশ্বর নাম হইতে; আবার কেহ বলেন আযাধ্যার রাজা অম্বরীশের নাম হইতেই এই নামের উৎপত্তি।

২। দেবী যশোরেশ্বরী মন্দির (শিলাদেবী মন্দির)। প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ—অম্বরে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এ বিষয়ে নানামুনির নানা মত বিদ্যমান ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আমরা শিলাদেবীর নাম পাই। প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন ঃ—

শিলাবতী নামে ছিলা তাঁর ধামে

অভয়া যশোরেশ্বী।

পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া

তাহারে অকৃপা করি॥

এই শিলাদেবীর কাহিনী একাধিক বইতে পড়েছি। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জয়পুর ভ্রমনের রোজনামচায় লিখেছেন যে শিলাদেবী শিলারূপে ছিলেন মথুরাতে কংস রাজার রঙ্গস্থলে। দেবকীর সন্তানদের ঐ শিলার উপরে—নিক্ষেপ করে মারা হত। যোগমায়াকে যখন মারতে গেল, তখন শিলাস্পর্শেই দেবী অষ্টভূজা হয়ে অন্তরীক্ষে প্রস্থান করেন। প্রতাপাদিত্য নাকি মথুরায় এসে ঐ পাথরেই যশোরেশ্বরীর বিগ্রহ নির্ম্মান করান। এই মূর্ত্তি আজ মানসিংহের অম্বর প্রাসাদে বিরাজমান। তিনি আরও বলেন যে সে সময়ে দেবীর সামনে নরবলি হত; জয়সিংহ এই নরবলি বন্ধ করেন বলে দেবী রুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়েছেন।

৩। আর একটি প্রচলিত মজার কাহিনী আছে গোবিন্দজীর মন্দির বিষয়ে। গোবিন্দজীর মন্দিরে নাকি রাজকন্যার মূর্ত্তি আছে পানের বাটী হাতে। এই রাজকন্যা মহারাজ জয়সিংহের কন্যা। মন্দিরাভ্যন্তরে তার মূর্ত্তিস্থাপনের কাহিনীটিই হল অলৌকিক। রাজকন্যার জন্ম লক্ষ্মীর অংশে—কাজেই তার প্রয়োজন ৺নারায়ণজীর। যখন দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব হুকুমদেন বৃন্দাবনের সব মন্দির ভেঙ্গে দেবার জন্য, তখন জয়সিংহ তাড়াতাড়ি সমস্ত বিগ্রহ জয়পুরে আনয়ন করেন এবং গোবিন্দজীর মন্দিয় প্রতিষ্ঠা করেন অন্দর মহলে। এদিকে গোলমাল বেঁধে গেল রাজকন্যাকে নিয়ে—তার বয়স ষোল, কিন্তু বিবাহে সম্মতি নেই। পরে জানা গেল, রাত্রে গোবিন্দজী থাকে রাজকন্যার কাছে। সকালে তার শয্যায় কখনও গোবিন্দজীর নূপুর বা অন্যান্য অলঙ্কার পড়ে থাকে। একদিন স্বয়ং মহারাজা তাদের এক সঙ্গে নিদ্রিত দেখে

নিজের গায়ের চাদরে তাদের ঢেকে দেন। প্রাতে এই চাদর দেখে রাজকন্যা লজ্জায় গোবিন্দজীকে বললেন যে সবই যখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন আর এদেহ রাখা উচিত নয়। কেহ বলেন যে মহারাজাই কন্যাকে বলেছিলেন সাবধান হতে, নচেৎ সমূহ বিপদ। আর রাজকন্যা গোবিন্দজীর কাছে কলঙ্ক মোচনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন—গোবিন্দজী তাকে শ্রী অঙ্গে লিপ্ত করে উদ্ধার করেন।

৪। প্রখ্যাত যন্তর-মন্তর ও তার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়সিংহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে—আমি জয়পুর বিষয়ে আপাততঃ শেষ করব, কি বলেন ? সুপণ্ডিত জয়সিংহ বড় কৌশলে তার বিদ্রোহী ভাই বিজয়সিংকে বন্দী করেছিলেন, মস্তবড় কাহিনী সে সব। এমন সুন্দর শহরের প্রতিষ্ঠাতা, এমন অদ্ভুত যন্তর—মন্তরের আবিষ্কারক এমন গুণী—জ্ঞানী মানুষ কেন সত্যাশ্রয়ী হবেনা, ভাবতে ভাবতে অবাক হতে হয়। এই যন্তর—মন্তর বিয়য়ে ও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। দিল্লীর মত এখানকার মানমন্দিরকে লোকে যন্তর—মন্তর বলে আর "গাইডকে" বলে ব্রাহ্মণ। এই যন্তর—মন্তরে যন্ত্রের অভাব নেই– সূর্য্যঘড়ি, যন্ত্ররাজ, সম্রাটযন্ত্র, রামযন্ত্র, জয়প্রকাশ যন্ত্র, আরও কত যন্ত্র। সমস্ত যন্ত্রই পাথর বা ইটের গাঁথুনী, ধাতুর ব্যবহার ও কিছু আছে। প্রত্যেক যন্ত্রের গায়ে তার পরিচয় লেখা আছে ইংরাজী ও হিন্দীতে। কোনটা উচ্চতায় কয়েকতলা বাড়ীর সমান উচু, আবার কোনটা কুয়োর মত গভীর। একটা যন্ত্র বাঁধান টেনিস কোর্টের মত দেখতে। ফলকে উৎকীর্ণ আছে শ্রী গোকলচন্দ্র ভবন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে সঠিক আছে বলে নির্ণিত হয়েছে। জয়সিংহ নিজে নক্শা তৈয়ার করিয়েছিলেন এই সব, আর যন্ত্রগুলি যে নির্ভুল হয়েছে তার ও পরীক্ষা করিয়েছিলেন নানাভাবে। তুর্কীস্থানের বিখ্যাত জ্যোতীর্বিবদ টুলুক্ বেগের ও পর্ত্তুগালের প্রখ্যাত জ্যোতীষী সোতিযায়—ডি—সিলভার অনেক যন্ত্রপাতি ছিল ; সেগুলির তিনি পরীক্ষান্তে ভুল বের করে চমৎকৃত করেছিলেন। জয়সিংহ এই

জ্যোতীষ শিখেছিলেন বিদ্যাধর নামক এক বাঙ্গালীর কাছে। তিনি জয়সিংহকে শুধু জ্যোতীষের জ্ঞানই দান করেন নি, জয়পুর শহরের "প্লান" ও তৈয়ার করে দিয়েছিলেন প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুসারে। দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের অনুরোধে তিনি নাকি পঞ্জিকা সংস্কার করে দিল্লী থেকে প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শুনে আনন্দে মন ভরে ওঠে ; বাঙ্গালীর গৌরব যেমন ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ; কি বলেন ?

৯। কিম্বদন্তীর দেশ।

রাজস্থানে বেড়ান	প্রাণ মাতোয়ারা।
জয়পুর, চিতোর	আজমীর আলোয়ারা॥
যোধপুর উদয়পুর	প্রাণে দেয় সারা।
বল-বীর্য্য সাহসে	কে না দিশেহারা ?
অন্তরের অন্তরেতে	আছ তুমি ঘেরা।
দেশপ্রেমের মহামান	সকল দেশের সেরা॥
আরাবল্লীর প্রান্তরেতে	হে চীরনবীন।
অন্তরের অর্ঘ্যে	নহি মোরা দীন॥
শৌর্য্য ও বীর্য্যের	যত কীর্ত্তি গাঁথা।
চিরবরেণ্য যত	আছে হৃদে আঁকা॥
আবু পাহাড়ের	দিলখুস দিলওয়ারা।
ভারতের গৌরব	জৈনমন্দিরের সেরা॥
পাথরের ভাষায়	কত না বলা বাণী।
বলিবারে চায়	কত কাব্য কাহিনী॥
অভিনব সাজে	আহা মরি লাজে।
কাঠিন্যের অভ্যন্তরে	চিরশান্তি রাজে॥
অপরূপ ভাস্কর্য্য	শ্রদ্ধানত শির।
সার্থক দেশপ্রেম	ধার্ম্মিক ও বীর॥
নানাধর্ম্ম নানাবেশ	অদ্ভুত পরিবেশ।
মন্দিরময় এ ভারত	কিম্বদন্তীর দেশ॥

১০। আজমীর— (পুষ্কর ও সাবিত্রী)।

জয়পুর থেকে তারপরদিন ২২ শে অক্টোবর প্রাতে ট্রেনযোগে আমরা আজমীর (বা আজমের) যাই। এশহরটি ও বড় কম নয়, ১৭ বর্গমাইল এর আয়তন, লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ, বসতির আনুপাতিক হার অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় ১৬০০'-০" উচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই অতি পুরাতন শহর যাহার চতুর্দ্দিকেই প্রায় আরাবল্লী পর্ব্বতমালায় ঘেরা। ভাল পাকা রাস্তা আছে এবং সরকারী বাস নিয়মিতভাবে বহুদূরে অবস্থিত শহরাঞ্চলে দৈনিক যাতাযাত করে। হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, ডাক বাংলো, ধরমশালা রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, সবই আছে এখানে। আর আছে যাত্রীদের সুবিধার জন্য "টুরিষ্ট" আফিস ও বাংলো।

পূর্ব্বে এখানে ছোট ছোট প্রান্তরে হরিণের পাল ও ময়ূর ময়ূরীয়া নিঃশঙ্কচিত্তে চড়ে বেড়াত। রেলগাড়ীর আওয়াজে হরিণের পাল দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে ছুটত। ময়ূরেরা পথেঘাটে আর ঘোরেনা, তারা থাকে বনবাগান আর ঝোপজঙ্গলের নিরিবিলি ছায়ায়—অনেকটা যেন লোক চক্ষুর বাইরে।

গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারী আফিসগুলি সব বন্ধ ছিল দীপাবলী উপলক্ষে। কিন্তু আলোকসজ্জা কালকের চেয়ে আজ অনেক বেশী। সবাই বলে কাল ছিল "ছোটি দেওয়ালী", আর আজ দেওয়ালীউৎসব পুরা। কলিকাতার বেহালা কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রী ডি, সি, মুখার্জী ও তার স্ত্রী শ্রীমতী মুখার্জীর সঙ্গে (শিক্ষিকা— কলিকাতা) এখানে সদ্য পরিচয় ঘটে। আমরা একসাথে সবাই মিলে "আলোকোজ্জ্বল আজমের" দেখে বেড়াই সারা সন্ধ্যা। সে সময়ে মনে হয় বাড়ীতে কেহই বসে থাকেনি, সারা শহর যেন রাস্তায়, কি শিশু, কি বৃদ্ধ, গরীব ভিক্ষুক বা কোটিপতি মারওয়ারী— সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতরে ও যেন

সবাই মহানন্দে চলেছে "কপোত কপোতি যথা…… …" চলেছে এখানে সেখানে। খোকা-খুকী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা বদ্ধ ঘরে কেহ বসে নেই এই উৎসবে। এখানে একটা মজার কিম্বদন্তী শুনলাম—দেওয়ালীর দিনে কেহ কাহাকেও কোন টাকা পয়সা দেয়না বা নেয়না। অনাগত কাল থেকে চলে আসছে এই রীতি। বর্ত্তমানে অবশ্য ইহার খানিকটা রদবদল হয়েছে। নগদ দেনা-পাওনার কাজ তারা হয় আগের দিন না হয় পরের দিনে সেরে নেন। একজন রেলের টিকেট কলেক্টর এক বিনাটিকিটের যাত্রীর কাছ থেকে এদিন যথানিয়মে টাকা আদায় করেছিলেন বলে জনসাধারণের নিকট তাকে জবাবধিহি করতে হয়েছে --প্রকৃতপক্ষে তিনি ধিকৃত হয়েছেন তার এই অন্যায় (?) কাজের জন্য। জানিনা রেল-কোম্পানী তার প্রভুভক্তির জন্য তাকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন কিনা !

এখানে ডাঃ বণিক ও তার স্ত্রী শ্রীমতী বণিকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। শ্রীমতী বণিক ঢাকার "কণ্ডুদাবানল" খ্যাত শঙ্খনিধি পরিবারের লোক। তারা আমাদের সাথে মাউণ্ট আবু পর্য্যন্ত যান। রং আর তুলি কাছে থাকলে শিল্পীর যেমন ছবি আঁকার ভাব আপনা থেকেই জেগে ওঠে, সেইরূপ প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা থাকলে ভাবের অভাব ঘটেনা। তবে আতিশয্য কোনটারই ভাল নয় মনে হয়। যাক, তবু তাদের সাহচর্য্য, মনখোলা আলাপ-আলোচনায় আমরা আনন্দিত ও গর্ব্বিত।

আজমীরের দর্শনীয় যাহা কিছু, তাহা বোধ হয় আমরা সবই দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তরুণ বয়সের প্রবল উদ্দীপনা এবং উৎসাহ আজ নেই, সেজন্য গতি আজ আমার কিছু মন্থর। কিন্তু ঔৎসুক্যের কি মৃত্যু হয় ?। স্থির থাকতে দেয়না অন্তহীন সেই আদিম কৌতুহল। মন তেমনি ছুটে চলে—কিন্তু দেহ তার সাথে তাল রেখে ছুটতে ছুটতে জন্তুরমত জিহ্বাগ্র বের করে হাঁপায়। সব দেখা চাই,—জানা চাই, সে এক দুর্ব্বার আগ্রহ যেন সবাইর।

১। আন্নাসাগর লেক (ইহার বিরাটত্ব প্রথমেই মনে করিয়ে দেয় উদয়পুরের জয়সমুদ্র, কাশীর অতল্যাবাঈর ঘাট, মথুরার বিশ্রামঘাট অথবা পুষ্কর হ্রদের সেই বিশাল পুণ্যঘাট),

২। আধাই-দিন-কা ঝোপড়া—(সুবৃহৎ মসজিদ),

৩। দরগাহ্ খাজা সাহেব (সাধক ও মহাপুরুষ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি সাহেবের পবিত্র ও বিখ্যাত সমাধি),

৪। আকবরের দুর্গ,

৫। তারাগড়,

৬। মিউজিয়াম,

৭। সুভাষবাগ (দৌলতবাগ),

৮। লছমীবাগ (মহিলাদের জন্য পৃথক পার্ক),

৯। সাবিত্রী মন্দির—(প্রায় ২৫'-০" ফুট উঁচু শ্বেতবর্ণ মন্দির) বাঙ্গালী সমাজে সাবিত্রীর স্পর্শকরা শাঁখা-সিঁদুর ও নোয়া বিশেষ ভাবে সমাদৃত। সাবিত্রী-দেবীর বামপাশে মহাশ্বেতার সুন্দর মূর্তী বিরাজমান।

১০। তীর্থরাজ পুষ্কর (দূরত্ব ১১ কিঃ মিঃ)। এখানেও টুরিষ্ট বাংলো আছে। আজমীর থেকে সর্ব্বদা বাস যাতায়াত করে। বহু মন্দিরের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু মন্দির, ব্রহ্মা মন্দির, গায়ত্রী মন্দির ও গোবিন্দজীর প্রধান। এখানে তর্পনাদি পারলৌকিক কাজ, দান-ধ্যান করে জনগণ অক্ষয় পুন্যের অধিকারী হন।

যতই দেখি ততই ভাবি এই মন্দিরময় দেশের কথা, বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদ ও বর্ত্তমান শতাব্দীর সঙ্গে তার সমন্বয়ের কথা। এ ভাবার যেন শেষ নেই। যেখানেই জৈনমন্দিব, পাশেই তার আছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। মহাবীরের মন্দিরের পাশেই বিষ্ণুমন্দির এবং তার পাশে আছে গণেশ আর হনুমানজী। মহাবীর হল হিন্দু দর্শনের একটা মতবাদ, যেমন মতবাদ গৌতমের, নানকের, কবীরের, রামানুজের। এদের মতবাদ বিশেষ

কালের বিশেষ আবহাওয়ার—এদেরই ধারাবাহিক পরিণতি হল বর্ত্তমান যুগে গান্ধীর মধ্যে। দর্শনের একই মহীরুহ, কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ হল তার শাখা-প্রশাখা। সেই কারণে গান্ধীবাদকে কেহ হিন্দুদর্শনের ব্যতিক্রম বলে ভুল করবে না। গান্ধীদর্শন হল মুখ্যভাবে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই অঙ্গ। সুসাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলেছেন।

১১। পথের সাথী

প্রফেসর মুখার্জী ও তার স্ত্রীর কথা পূর্ব্বেই বোধ হয় বলেছি। তাদের যেমন দেখেছি ও আমরা যাহা পেয়েছি তাদের কাছে, তা সগর্ব্বে মনে রাখবার মত এবং তাই কিছু কিছু আপনাদের নিকট উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। কি চেহারায়, কি গুণে, তারা উভয়েই অন্যের মন কেড়ে নেয় প্রথম দর্শনেই। উভয়েই শিক্ষক, নিঃসন্দেহে গুণী ও বাকপটু। প্রফেসর মুখার্জীর ব্যবহার মধুর, মনোহর তার যৌবনসুলভ রূপ, আর ততোধিক মনোহর বা সুন্দরী তার স্ত্রী—শিক্ষিকা শ্রীমতী মুখার্জী। দীপাবলীর মনোরম আলোকিত সন্ধ্যায় তাদের সাহচর্য্যে আজমীরের প্রধান সড়কে, নয়াবাজারে ও তিগগী-বাজারে খুব বেড়িয়েছি, অনেক আলাপ-আলোচনা করেছি। তারা যেমন রসাল মুখরোচক আলোচনায় মুখ্যবক্তার আসন পরিগ্রহ করতে পারেন তেমনি পারেন জ্ঞানমার্গের আলোচনায়, রামকৃষ্ণ দর্শন বিষয়ে সমালোচনায়। বেদান্ত দর্শন বিষয়েও প্রফেসর মুখার্জীর বেশ গভীর জ্ঞান আছে বুঝলাম। এককথায় তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বর্ণচোরা সাধারণ মানুষ বলা চলে। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে যে কৃষ্ণানন্দ যোগাশ্রম আছে (হাউস কাটোরা) সেখানে তার বিশেষ জানাশুনা আছে। শুধু তৃতীয় নয়নই তৃয় নয়ন দেখতে পারে—চলতি কথায় জহুরী জহর চেনে, আর কি!

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন যে "ঈশ্বরলাভই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। তিনি সবেই রয়েছেন, তবে মানুষে তার বিশেষ প্রকাশ। মানুষ—ঈশ্বর চিন্তা করতে

পারে, অন্য জীবজন্তু পারেনা। অন্য জীবজন্তু, গাছপালার ভিতরে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন, কিন্তু মানুষে বিশেষ প্রকাশ। ঈশ্বর এক এবং তিনিই বহু। অগ্নিতত্ব সর্ব্বভূতে আছে তবে কার্যোতে বেশী প্রকাশ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—ইন্দ্রিয়ের অতীত ব্রহ্ম। তিনি নিরাকার ও বিস্ময় স্বরূপ তাকে জানতে গেলে সৃষ্টিকে জানতে হবে। সৃষ্টির অর্থই সমন্বয়। তবে তা দুটো একই শক্তির সমান নয়—দুটো বিরুদ্ধ শক্তির সমাহার। নিত্যসত্য ও মায়ার সমন্বয়ে হয় সৃষ্টি। সৃষ্টি তার শক্তি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তিনিই করেছেন। সৃষ্টিই হল তার শক্তি, তার ক্রিয়া। শক্তি ও তিনি ভিন্ন নন। শক্তি বলতে যাহা বোঝায়, ব্রহ্ম বলতেও তাহা বোঝায়। ব্রহ্ম শক্তিতে নিহিত, আবার শক্তি ব্রহ্মে নিহিত। ব্রহ্মের আর একটি নাম সৎ-সত্য বা নিত্যচিৎ জ্ঞান এবং আনন্দ-আহ্লাদ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এই তিনটি ভাবের সমন্বয় ব্রহ্ম। ভাব স্বতন্ত্র কিন্তু যেখান থেকে ভাব উৎপন্ন হয় তা স্বতন্ত্র নয়। কালী, কৃষ্ণ, শিব সব স্বতন্ত্র ভাব কিন্তু ব্রহ্ম এক। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস সবাই এই ভাবের তন্ময়তা প্রকাশ করেছেন। রাম, কৃষ্ণ, কালী থেকে নিত্যে-আবার নিত্য-থেকে রাম, কৃষ্ণ, কালীতে আনাগোনাই হল ঠিকভাব। সংসারে থাকতে হলে ভাব ছাড়া থাকা যায়না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ ভাবের জন্য যোগাভ্যাস দরকার। ভাব হল মনের ও ভোগ হল দেহের। দেহের জন্য অর্থ ও কামনা, আর মনের জন্য ধর্ম্ম এই তিনটির যথার্থ রূপায়নই প্রকৃত পুরুষার্থ। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অভেদ অগ্নি ও দাহিকা শক্তি। দ্বৈত-ভাবে পরিচয় কিন্তু একেরই অবস্থা বিশেষ। কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। কখনও সীমা, কখনও অসীন-অনন্ত। যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাকে চিৎশক্তি বা মায়া বলে। এই মায়া দুভাগে বিভক্ত-বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। বিদ্যামায়ার অন্তর্গত বিবেক-বৈরাগ্য, আর অবিদ্যাকে ঘিরে রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। অবিদ্যামায়ার প্রভাবে ঈশ্বর থেকে

জীবেরা দূরে সরে যায়। কিন্তু মহাশক্তির উপাসনা করলে রিপুরা দূরে সরে যায় আর তখন আসে বিবেক-বৈরাগ্য। মহাশক্তির উপাসনায় আকুল হয়ে যে কাঁদতে পারে, মহাশক্তি তাকেই দেখা দেয়। এসব আলোচনায় সময়ের জ্ঞান থাকেনা, তাই এখানেই শেষ করি এই পর্ব্ব। আপনারাতো জানেন,

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

সেইরকম রামকৃষ্ণের কথা ও অমৃত সমান।
শুনিলে শোনালে হইবে কল্যাণ॥

(১২) চিতোর

"প্রফেসর মুখার্জী এণ্ড কোং" সাথে নিয়ে রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে আজমীর থেকে ট্রেনযোগে রওনা হয়ে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত চিতোর পৌঁছাই অতি প্রত্যুষে প্রায় ৬টার সময়ে। রাত্রে গাড়ীতে শোবার কোন অসুবিধা হয়নি, পরিবেশ ও প্রশান্তি সাহায্য করেছিল বলেই উহা সম্ভব হয়েছে মনে করি। চিতোর (চিতোরগড়) একটি ছোট্ট কিন্তু পরিচ্ছন্ন বিখ্যাত শহর—পূর্ব্বনাম চিত্রগিরি, চিত্রকোট, চিত্ররঙ্গ ইত্যাদি। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে নামও বদল হয়েছে বারে বারে। স্থানীয় লোকেরা আরাবল্লী পর্ব্বতে ঘেরা মেবার-চিতোর-উদয়পুরের জনগণকে বেশী বিশ্বাসী, অধিকতর দেশ-প্রেমিক ও বেশী আপনার মনে করে। আর জয়পুর, যোধপুর বিকানীর প্রভৃতি স্থানের জনগণকে ব্যবসায়ী কিন্তু অবিশ্বাসী বলে অভিহিত করে থাকে—কারণ হয়তো আছে, তবে এযুগে তা অচল বলা চলে। এখানকার মহিলারা পোষাক পরিচ্ছদে অপরূপ, অন্ততঃ আমাদের অনভ্যস্ত চোখে। বহির্বাস নয়ন মনোহর হলেও সাধারণতঃ অপরিচ্ছন্ন ও অত্যন্ত "সেকেলে।" চিতোরে যে আমরা ভারতীয় বীরত্বের কাহিনী ও জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করলাম, তা ভোলবার নয়। জীবনে আমাদের নির্ম্মম সত্য হল—যাহা যায় তাহা আর ফিরে আসে না—তা সে জীবন, যৌবন, স্বপ্ন, কামনা, যাই হোক না কেন। মনে প্রাণে অনুভব করি এই কথার সারবত্তা।

চিতোরগড়ের পঞ্চমহলের পাঁচটি বড় প্রবেশদ্বার আছে। প্রথমটি পাদল প্রবেশদ্বার, দ্বিতীয় হনুমান প্রবেশদ্বার, তৃতীয় গণেশ, চতুর্থ জোরলা ও পঞ্চম প্রবেশদ্বার হল রাম প্রবেশদ্বার। এই গড়ের পাশে পাশেই যে নদী বর্ত্তমান তাহার খনন আরম্ভ করেন মহারাজা ফতে সিং সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আক্রমণের বিরুদ্ধে। উক্ত গড়ের ভিতরেই আমরা দর্শন পাই —

১। কুম্ভশ্যাম মন্দির,

২। শ্রী মীরা মন্দির (মীরাবাই-এর সাধনা মন্দির, যাহার করুণ মধুর ভক্তিরসের বন্যা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করেছিল। কালের কপোলতলে হারিয়ে গেছে তুর্কী-তাতার, শকহুণ, মোগল-পাঠান, আর গ্রীক-ইংরেজ-ফরাসী-ওলন্দাজ-পর্ত্তুগীজ।

কোকিলকণ্ঠ মীরার ভক্তি-বেদনার প্লাবনে ওরা ইতিহাস থেকে ভেসে চলে গেছে, কোথায় কে জানে? পূজারী আমাদেরও একটু মীরার ভজন শোনালেন—হতবাক হয়ে শুনেছিলাম সে গান। এই মন্দিরদ্বার আজও রয়েছে খোলা—বিরহিনীর কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হয়, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।"

৩। জয়স্তম্ভ (উচ্চতা ১২২'—০", চওড়া ৩০'—০" নয়তলা, রাণাকুম্ভ উহা তৈরী করেন)।

৪। সমিধেশ্বর মন্দির (ত্রিমূর্ত্তি-শিব),

৫। গৌতম কুণ্ড, হাতীকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড (আমি বলি মৎস্যকুণ্ডই উহার প্রকৃত নাম হওয়া উচিত),

৬। জয়মল মহল,

৭। রাণাকুম্ভ মহল (৮টী কামান আছে এখানে), রাণী পদ্মিনী মহল (তালাউর চারিপাশে সুবৃহৎ আয়নায় ঘেরা—এ নিয়ে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে),

৯। কীর্ত্তিস্তম্ভ ও

১০। মিউজিয়াম।

থাকি টুরিষ্ট লজে—আর খাই বাঙ্গালী হোটেলে (একমাত্র বাঙ্গালী হোটেল—রেলষ্টেসনের সন্নিকটে)। মাছ-ভাত, দই ইত্যাদি বেশ ভাল লাগল অনেকদিন পরে। কিম্বদন্তী আছে কুরুপাণ্ডব আমলের এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন শিবিরাজা। এই চিত্রাগিরি বা চিতোর ছিল তার রাজ্যের অন্তর্গত। লোকে একারণে বলত শিবিজনপদ। তিনি মহামতি ভীমসেনকে আমন্ত্রণ করে আনেন। বৃকোদর এখানে এসে এক বিশাল প্রাসাদে দীর্ঘকাল বাস করেন এবং চিত্রগিরির নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। ঘোরাঘুরি করতে করতে কিম্বদন্তীগুলি যেন সত্য বলে প্রতিভাত হয় মনে। চিতোর কোন রাজারই সাম্রাজ্য ছিলনা—ছিল জমিদারী। চিতোর-উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগোষ্ঠী কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশীদের প্রতিরোধ করেনি—একতা থাকলে হয়তো ইতিহাস অন্য রকমে লেখা হত। চিতোরগড়ের ভিতরে স্থানান্তরে যাবার পথের দুধারে শুধু আতাফলের গাছ—ছোট ছোট গাছ কিন্তু ফল ছোট নয় বা কম নয়। জায়গার গুণ না হলে অনাদরে ও এমনভাবে প্রচুর ফলন হয়না। বৈকাল ৩-২৫ মি.-এর গাড়ীতে আমরা উদয়পুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি ও সেখানে (উদয়পুর সিটি ষ্টেসন) পৌছাই রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে।

১৩। উদয়পুর

বিখ্যাত শহর উদয়পুর (মেবার) বিখ্যাত বহুকারণেই। উদয়পুরে সর্ব্বপ্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেটি রাজস্থানের সৌধ-নির্ম্মাণ প্রতিভা। তখনকার দিনের স্থপতিবিদ্যার মান কত উচু ছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ রয়েছে এখানে। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীও অতীব মনোরম ও বিস্ময়কর। প্রখাত শিল্পিগোষ্ঠীর শিল্প সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক আজিও বর্ত্তমান—প্রত্যেকটি সৌধের কি অপরূপ কারু-সৌন্দর্য্য! কালজয়ী হয়ে অমর আখ্যা সার্থক করেছে ঐ শিল্পকলা।

উদয়পুর শহরের আয়তন প্রায় ৯ বর্গমাইল, জনসংখ্যা দেড় লক্ষের কম হবেনা। নীচু পাহাড়ের কোলে অবস্থিত বলে গরমকালেও কিছু হাল্কা গরম কাপড় ব্যবহার করলে ভাল হয়। বাসের জন্য ভালরাস্তা ছাড়াও এখানে আছে বিমান বন্দর ও রেলষ্টেসন। এখান থেকে সরাসরি মোটরযোগে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ যেতে যথাক্রমে—৪৯, ২৪, ২৫ ও ৬০ ঘণ্টা সময় লাগে। বহু রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, বার, টুরিষ্ট বাংলো, ধর্মশালা আছে এখানে। আমরা থাকি রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমে (দ্বিতলে)—ফিটফাট বড় ঘর, পছন্দসই বটে। প্রফেসর মুখার্জী ও তার স্ত্রী পাশেই ভিন্নঘরে থাকেন এবং ঘুমাবার সময় ছাড়া আমরা এ-কয়দিন সমানে একত্রে বিচরণ করি মনের সুখে! অনেক আলোচনার মধ্যে মনে বারে বারে জাগে তার কাছে শোনা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কয়েকটি বানী যা সর্ব্ববাদী সম্মত ও কখনই পুরাণো হয় না, যেমন ঃ—

১। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সে দিকেই যাবে, মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল। যে রং এ ছোপাবে সেই রং হয়ে যাবে।

২। ভগবান লাভের পক্ষে বিবাহ অন্তরায় নয়। সংযম ত্যাগ ও ভক্তি থাকলে বিবাহ কত সুখের হতে পারে, স্ত্রী কত সুখী হন—শ্রীমার জীবন তার ও প্রমাণ। আদর্শ গৃহীর কাছে জগৎ ও ব্রহ্ম দুইই সত্য হওয়া চাই। ভগবানে মন রেখে সংসার করাই শ্রেয় ও একান্ত প্রয়োজন। পিতামাতাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম হয়না। মানুষের অনেক ঋণের মধ্যে পিতৃঋণ, মাতৃঋণ ও পরিবার সম্বন্ধে ঋণই প্রধান। মনসাগরে শেওলার মত বিভিন্ন ভাব আসে আর যায়। স্থায়ীমূল ঘিরে থাকতে দিলেই বিপদ।

৩। সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়—খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায় তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবেনা, ভেসে থাকবে।

৪। বাপের পাঁচটী ছেলে, কেহ ডাকে বাবা, কেহ বাপি, কেউ বা "বা" বলে ডাকে, আবার কেউ "পা" বলে—সবটা উচ্চারণ করতে পারেনা। যে বা যারা বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে যে "পা" বলে তার চেয়ে? বাবা জানেন এরা কচি ছেলে বাবা ঠিক বলতে পাচ্ছেনা।

এবার আমরা—উদয়পুরে ফিরে আসি দ্রষ্টব্য দর্শন মানসে।

ক) ফতে সাগর (৪ কিঃ মিঃ দূরে,)

খ) পিছোলা লেক (৪ কিঃ মিঃ)—নৌকারোহরণ মনোহরণ বটে,

গ) প্যালেস (টিকেট জনপ্রতি ১৫ পঃ) জগনিতান ও জগমন্দির,

ঘ) জগদীশ মন্দির, (প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জগৎ সিং),

ঙ) জবাহর পার্ক (৪ কিঃ মিঃ)।

চ) রক গার্ডেনস্ (")

ছ) নেহেরু পার্ক,

জ) গুলাব বাগ,

ঝ) গুরুদ্বারা ও

ঞ) জুম্মা মসজিদ।

উপরিলিখিত প্যালেস বা রাজপ্রসাদ লম্বা ১৫০০'—০", চওড়া ৫০০'—০" এবং উচ্চতায় ১২৫'—০" ইঞ্চি। মহারাজা সংগ্রাম সিং এর কন্যা শকুন্তলার জন্য তৈরী পাঁচটি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ফোয়ারা, আছে একধারে—নাম (১) স্বাগতম ফোয়ারা,

(২) দিন বাদল বর্ষাত, (৩) রিম্ ঝিম্, (৪) মুসলধারা এবং (৫) রাসলীলা ফোয়ারা—নামের সহিত যথার্থ মিল রয়েছে ঐ ফোয়ারাগুলির। আর একদিকে রংমহল-হোলী উৎসবের জন্য ব্যবহৃত একটী-পাথরের তৈরী চৌবাচ্চা (৪২'—০" × ১২'—০০") এই অংশে প্রবেশের তিনটি ফটকের নাম ত্রিপোলিয়া। বর্তমান মহারাণা ভগবন সিং এই প্রাসাদের পূর্ব্বতম অংশে বাস করেন—সেখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। উপরে বর্ণিত রক গার্ডেনস্ আর একটি আশ্চর্য্য বাগান। চারতলার উপরে এই সুবৃহৎ রম্যোদ্যান সবাইর মনোরঞ্জন করে, কিন্তু কি করে এই উঁচুতে বড় গাছগুলি (বিশালাকৃতি আম-কাঠাল গাছও আছে) দাঁড়িয়ে আছে—শুধু ছোট ফল-ফুলের মনোরম সৌখীন বাগান নয়—নয়নাভিরাম সুউচ্চ পাদপশ্রেণী, যার শাখা-প্রশাখা নানা ফলভারে অবনত, সগর্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের মহিমা প্রকাশে রত, ভাবলে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। পিছোলা লেকের দৃশ্য ভোলবার নয়—এখানে নৌকাবিহার বড়ই মনোরম, খরচও খুব বেশী নয়। রাজপ্রাসাদের দরবার গৃহের প্রবেশ পথ কারুকার্য্যমণ্ডিত হলেও খুব ছোট্ট কেন জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে রাণারা কখনও "শির ঝুকায়নি" (মাথা অবনত করেনি) এবং যে কেহ তাদের সাথে দেখা করতে আসবে তাকে অবনত মস্তকে দরবারে প্রবেশ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে মস্তক নত না করতে চায়, ছোট দরজা দিয়ে প্রবেশ মুখেই অভ্যন্তরস্থ রক্ষীদল অস্ত্রাঘাতে তার শিরচ্ছেদ করবে। মোগল বাদশাহের রাজপুতানা অভিযানের সময় থেকেই এই কথা প্রচলিত এখানে। বাঙ্গালী নাট্যকার স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় এই বীরত্ব কাহিনী নিয়েই ভারত বিশ্রুত "মেবার পতন" নাটক লিখেছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী সার্থক নাটক বাঙ্গলার তদানীন্তন বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। পরে অবশ্য ইহার প্রচলন হয় ঘরে ঘরে, ক্লাবে ক্লাবে এবং আজিও ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত বিরাট জাতীয়তাবাদী নাটক বলে বিবেচিত ও মঞ্চস্থ হয়।

(১৪) মাউন্ট আবু

উদয়পুর থেকে বৈকাল ৪-৪০ মিনিটে রওনা হয়ে ট্রেনযোগে মারওয়ার পৌছাই দুপুর রাতে এবং সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ীবদল করে আবুরোড ষ্টেসনে পৌছাই পরদিন প্রাতে। সেখান থেকে বাসে করে মাউন্ট আবু পৌছাই বেলা দশটায়। এখানে সেখানে কুলীভাড়া ধারণাতীত বেশী দিতে হয়—মজুরদের দক্ষিণা অসম্ভবভাবে বেড়ে গিয়েছে, যেমন বেড়েছে জীবনধারণের অন্যান্য খরচ। পূর্ব্বে মাউন্ট আবু ছিল সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত—এখন ইহা রাজস্থানের অন্যতম শৈলনিবাস।

ভারতবিখ্যাত জৈনমন্দির—দিলওয়ারা দেখলাম। ইংরেজী ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে মোট ১৮,৫৩,০০,০০০ (আঠার কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা ব্যায়ে এই বিশাল জৈন মন্দির তৈয়ার হয়। শ্বেতপাথরের উপর অসম্ভব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত এই মন্দির। দ্বিতীয় মন্দিরটি নেমিনাথের। তার মূর্ত্তিও কৃষ্ণবর্ণ, তিনি বাইশ নং তীর্থঙ্কর। রাজা বৃদ্ধবলের আমলে ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তার মন্ত্রী শেষবাস্তুপাল তেজপাল এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন ১২,৫৩,০০,০০০ (বার কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে। তৃতীয় মন্দিরটি ঋষভদেবের নামাঙ্কিত। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ভীমশাহ (ইং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে)। চতুর্থ মন্দির সুবিধিনাথের, এ মূর্ত্তিটি শ্বেতবর্ণ। পঞ্চমটি পরেশনাথ, পরেশনাথ, আমাদের সবাইর পরিচিত, মূর্ত্তিটি সুশ্বেতবর্ণ, মুখশ্রীর অভিব্যক্তি মিষ্ট ও করুণাময়। এই মূর্ত্তিটিতে শিল্পির বিশেষ গুণপণা প্রকাশ পেয়েছে। মাউন্ট আবু থেকে বাসে করে সরাসরি যাওয়া যায় দিলওয়ারা, আর সেখান থেকে পুনরায় অচলগড় (প্রায় ১২ কি. মি.। এখানে অচলেশ্বর মহাবীরের মন্দির, চামুণ্ডাদেবীর, সোনমন্দির, ছোট সারণেশ্বরজীকা মন্দির (একমাত্র রঙীন সোনার জৈনমন্দির)। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচলগড়ে তিনটি অসুর বধ করেছিলেন।

দিলওয়ারা ও অচলগড়ের পথের পাশে চারিটি "পানিচাকি" দেখলাম চারজোড়া বলদের সহায়তায় মাঠে সেচের কাজে রত। যদিও চারিদিকে ছোটবড় পাহাড় বিরাজমান, তবু শীত প্রায় নেই। অক্টোবর মাস শেষ হতে চলেছে—শীত এখনো সবে আরম্ভ বলা চলে। রাতের বেলা বেশ—চাঁদনীরাত, যদিও পূর্ণিমা চলে গিয়েছে ২।৩ দিন আগে। মৃদুমধুর ঠাণ্ডা—প্রাণে-লাগে হিমের পরশ, আর দোলা দেয় মনে পরম আনন্দে। জ্যোৎস্নার আলোর সাথে থাকে যে অস্পষ্টতা সেটি যাদু জানে—ভালকরে কিছু দেখা যায় না বলেই তার আকর্ষণ বেশী। অদূরে শ্বেত জৈনমন্দির সমূহে চাঁদের আলো লেগে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে। কেমন যেন একটা খুসীর আমেজে মনপ্রাণ ডুবে যায়। আমরা জানি এই চাঁদের প্রভাবেই সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা হয় এবং কবি ও প্রেমিক--প্রেমিকাদের হৃদয় চাঁদের প্রভাবে উদ্বেলিত হয়। কিন্তু কাহারও মাথায় চন্দ্রদেবতার আবির্ভাব হলেই বিপদ, কারণ লোকে তাকে বলবে, "ল্যুনাটিক"। চাঁদ কি করে বা কেন মানুষের মন আকৃষ্ট করে এর ব্যাখ্যা কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এখনও দিতে পারেননি। দূরান্তে কৃষ্ণনীল পাহাড়ের ওধারেই শুনলাম পাকিস্তানের সীমানা। আমাদের জওয়ানরা সেখানে অতন্দ্র পাহারায় ব্রতী আছে। তুষারধবল জম্মু-কাশ্মীর থেকে ধূসর রাজস্থান, নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গ থেকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, সেখান থেকে প্রতিবেশী আসাম—এই বিরাট এলাকার ৪৬২৮ মাইল সীমান্তভূমিতে ক্লান্তদেহ আর তন্দ্রালুচোখে, হাতে দুর্জ্জয় রাইফেল, বুকে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত শিখা—এই সম্বল করে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখছে আমাদের জওয়ানরা। সীমান্তে রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায় বারে বারে "হুকুমদার" চড়াসুরের এই কড়া প্রশ্নে।

মাউন্ট আবু একটি পরম রমনীয় শৈলনিবাস ও তীর্থস্থান। ইহার আয়তন প্রায় ১০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮,৫০০, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ইহার উচ্চতা ৪,০০০ ফিট। আবু রেলষ্টেসন ২৯ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এখান থেকে দিল্লী হয়ে কলিকাতা (২১৪৯ কি.মি.)

যেতে মোট ৪৫ ঘন্টা সময় লাগে। পাকা মোটর যাবার রাস্তার যোগাযোগ আছে ভারতের সব বৃহদায়তন শহরগুলির সাথে যেমন দিল্লী, আগ্রা, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকতা ইত্যাদি। বহু হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, ডাকবাংলো, হলিডে হোম, গভর্ণমেন্ট কটেজ ও ধরমশালা আছে। দিলওয়ারা জৈনমন্দির ছাড়াও বহু দ্রষ্টব্যস্থান যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে. যেমন—"টড্ রক্", নাক্কি লেক, রঘুনাথজী মন্দির, "ক্রেগস্", রবার্ট-স্পার, সানসেটপয়েন্ট, অন্ধ্র পয়েন্ট (৩ কি. মি), টেরেস্ গার্ডেন, গান্ধী পার্ক, অচলগড় (১১ কিঃ মিঃ) ইত্যাদি। নাক্কিলেক (বা নাক্কি তালাও) বিষয়ে একটি সুন্দর কিম্বদন্তী আছে। নাক্কিতালাওর মূলনাম "নখ-কি-তালাও"। প্রবাদ এই যে আবুপাহাড় যেদিন জলের অভাবে হাহাকার করছিল, সেদিন একদল দেবতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সেদিন আপন আপন নখের দ্বারা আঁচড়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর তৈরী করেন। আজও বুঝি সেই দেবতাদের উত্তরাধিকারীরা আছেন এই নখ-কি-তালাওর আশে-পাশে, গুহা-গহ্বরে, মন্দিরে এবং এখানে সেখানে। নৈনিতালের মত নখ-কি-তালাও এ নৌকা বিহার করা যায়—বিশেষ করে জ্যোৎস্নাখচিত রাত্রে সত্যি রোমাঞ্চকর। এই লেকের চারিপাশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেশভাল লাগে—উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় পরিবেশের গুণে মনে প্রাণে দোলা দেয়, বৃদ্ধের ও যেন যৌবন সঞ্চারিত হয় দেহে। জলবায়ুর গুণে মাত্রাতিরিক্ত খেলেও বদহজম হয়না, অল্পদিনেই শরীরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রওনা হয়ে আবুরোড রেলষ্টেসনে আসি বাসে করে। সেখান থেকে রেলগাড়ীতে রওনা হই রাত্রি ৯-৫০ মিনিটে। মেহ্সানায়-পৌঁছে গাড়ী ১-৩০ মিনিটে—সেখান থেকে ভিন্নগাড়ীতে (জনতা এক্সপ্রেসে) চড়ে রওনা দেই ভোর ৫-১০ মিনিটে। ভোরের হাওয়ায় বেশ শীত বোধ করছিলাম গাড়ীতে। রাজকোটে গাড়ী বদল করে মেলে চড়ে পৌঁছলাম ভেরাবল রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময়। রাজস্থান সফরান্তে আমরা প্রবেশ করি গুজরাটে।

১৫। ভেরাবল (সোমনাথ)।

গুর্জ্জর বা গুজরাটের বর্ত্তমান নাম সৌরাষ্ট্র। মহাত্মা গান্ধীর দেশ, তাই পুণ্য ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। ভেরাবল একটি জেলা শহর-দেশ বিভাগের পরে বর্ত্তমানে ১০টি জিলায় বিভক্ত এই রাজ্য, এই শহর তারই অন্যতম। লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষের কম হবেনা, অধিকাংশই হিন্দু, তবে মুসলমান, জৈন, পারসিক ও খৃষ্টানের সংখ্যা ও নগণ্য নয়।

সোমনাথ ভেরাবল রেলষ্টেসন হতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। অগ্নিতীর্থ সোমনাথ—মহাভারতের আমলে এই ভূভাগটীকে বলা হত প্রভাসপত্তন—পরে সোমপুরা। রেলষ্টেসন বীরাবল (Verabal) অর্থাৎ সোমনাথ—যেমন হাওড়া ষ্টেসনে নামলে মহাতীর্থ কালীঘাট। এখান থেকে বোম্বে রেলপথে মাত্র ৫৭৭ মাইল। ভেরাবল ও ও সোমনাথের মধ্যে নিয়মিতভাবে সারাদিন বাস চলাচল করে। অটো-রিকসা, টাঙ্গা ও ট্যাক্সি ও আছে অনেক। হোটেল, ডাক-বাংলো, রেষ্টুরেণ্ট, ধর্ম্মশালা প্রচুর। এইরাজ্যে আইন করে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাত্রি ৮/৩০ মিনিটে ভেরাবল পৌছে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমে থাকি ও পরদিন প্রাতে (রবিবারে ২৭শে অক্টোবর) সোমনাথ যাই। দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান মনে করে আমরা অগোৌণে তা দর্শন করে ধন্য হই।

১। সোমনাথ মন্দির—আদি মন্দির গজনীর মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি প্রথমবার যখন সেমনাথ মন্দিরের দেবস্ব লুণ্ঠন করেন তখন সেই লুণ্ঠিত রত্ন ও ধনসম্ভার নিজের দেশে নিয়ে যাবর জন্য চারহাজার উটের দরকার হয়েছিল। বর্ত্তমান মন্দিরটি (বিগ্রহ শিব শম্ভু) পুরাণ মন্দিরের জায়গাতেই তৈরী হয়েছে। দ্বিপ্রহরে আরতির সময়ে দর্শনই প্রশস্ত।

২। ভগবান শিবমন্দির—ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।

৩। ভাল্কাতীর্থ—কথিত আছে একটি ভীল সর্দ্দার কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছিল এবং সেই বিষক্রিয়ার ফলে বাসুদেবের মৃত্যু ঘটে। ভীল সর্দ্দার একটি সিংহের প্রতি তীর ছুড়েছিল, দৈবাৎ লেগে যায় শ্রীকৃষ্ণকে। সিংহের পরিবর্ত্তে পুরুষসিংহ।

৪। দেহোৎসর্গ—(ত্রিবেণী)—শ্রীকৃষ্ণের পারলৌকিক কর্ম্মাদি এখানে সম্পন্ন হয়েছিল বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সরস্বতী, কপিলা ও হিরণ্য নদীর সঙ্গম এখানে—তাই পুণ্যতীর্থ ত্রিবেনী। সরস্বতী নামটি বোধহয় কোন নদীর পক্ষেই শুভ নয়। বাংলা দেশে ও দেখেছি। সরস্বতী নদী মাত্রই সব জায়গায় শুকিয়ে যায়। পশ্চিম বঙ্গে বিদ্যাধরীর মত সরস্বতী ও বেঁচে নেই। প্রয়াগে মরে গেছে সরস্বতী। রাজপুতানায় মরুভূমির মধ্যে যশলমীরের পাশে সরস্বতীর অপমৃত্যু ঘটেছে অপার বালুরাশির মধ্যে। এখানে ও আবার একই সরস্বতী, চিহ্ন আছে হয়তো, নদী নেই। এই দেহোৎস্বর্গকেই বলা হয় নাগস্থান, এখানে নাকি বলরাম পাতালের নীচে প্রবেশ করেছিলেন। বলরামের মৃত্যু-কালে তাহার মুখগহ্বর থেকে নাকি সহস্রনাগ নির্গত হয়েছিল।

৫। পাটনদ্বার—প্রভাসপাটন শহরের প্রবেশদ্বার।

৬। মাইপুরি মসজিদ—কথিত আছে একটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে সেস্থানে এই বিরাট মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে দিল্লীর সুলতান।

৭। গীতাভবন—সমস্ত গীতার শ্লোক দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে।

৮। পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির,

৯। সূর্য্যমন্দির,

১০। সাশনগীর — (২৭ মাইল)। গীর সংরক্ষিত বনে সিংহ ও অন্যান্য পশু নিকট থেকে দেখবার সুবন্দোবস্ত আছে।

মহাপুরুষের তিরোভাব তিথি আমাদের দেশে কখনও প্রাধান্য পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিশেষ তিথিটি আমরা জানিনা কিন্তু জন্মাষ্টমীতে সমগ্র ভারত নাড়া দেয়। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামীকে দেবতাজ্ঞানে লোকে পূজা করে,তাকে অবতার বলে। সর্ব্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের যে অবদান সেটি তৎকালীন বিশ্ববাসীদ্বারা স্বীকৃত ছিল এবং সে কারণেই তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়েছিল। সমাজ ও নৈতিক জীবনকে গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন যীশুখৃষ্ট, সে কারণে তাঁকে খৃষ্টানরা অবতার বলে। চৈতন্য তাই, রামকৃষ্ণও তাই। একালে গান্ধিজীর জন্মতিথিটি আমাদের কাছে সত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথের পঁচিশে বৈশাখ। মকাপুরুষের পরিচয় তাঁর জীবনে, নশ্বর দেহাবসানে নয়। সে কারণে তাদের আবির্ভাব তিথিটি আমরা সর্ব্বদা গ্রহণ করে থাকি।

সোমনাথের পথ চলবার কালে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য আমাদের নজরে পড়ে, যা এখনও মনে আছে। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে অলঙ্কার ব্যবহার ও অভিনব প্রথায় মহিলাদের শিশুপালন ব্যবস্থা। বড় বড় গাছের নীচে বা নিজ নিজ ঘরের বারান্দায় শিশুদের এক একটি দোলায় শোয়ান—দোলনার গড়ন ও ঝুলিয়ে রাখবার ধরণ বেশ মজার বা অদ্ভুত। পুরুষেরা প্রায় সবাই রূপার তৈরী মোটা প্লেন বালা ও কোমরে মোটা রুপার শিকলি ব্যবহার করে। মহিলারা ও তেমনি ৪/৫" ইঞ্চি লম্বা ঝুলন্ত কুন্তল, প্লেন চওড়া বালা, গলায় হার, নাকে মুক্তার মত ফুল ও কটীবন্ধে মোটা শিকলি ব্যবহার করে। এত ওজন নিয়ে মাথার উপয় ৩/৪টী কলসভর্ত্তী জল নিয়ে পথ চলে কি করে? এদের মধ্যে কয়েকজনের সর্ব্বাঙ্গে লালিত্য, লাবণ্য ও যৌবনের কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট। একটি রমনীর চোখে-মুখে, চটুল চাহনিতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখেছি। ঐরকম নিবিড়

দৃষ্টিতে হঠাৎ শিহরণ জাগা আশ্চর্য্য নয়। মন্দিরাঙ্গণে আরতির সময় ও ঐরকম দৃশ্য কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছি। পোষাকে ও কিছু অভিনবত্ব আছে মেয়েদের। মা, মেয়ে, ঠাকুরমা প্রায় সবাই একই রংএর ঘাঘরা, ওড়না, ও পিঠখোলা ছোটজামা ব্যবহার করে। শুধু ভাবি, কি বিচিত্র এই দেশ—পোষাকে, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে বিভিন্ন হয়েও ভারতীয়রা সব এক ও অভিন্ন। আরো দেখলাম চীনাবাদামের চাষ এখানে খুব জনপ্রিয়—ঐ বাদামের নূতন নামকরণ "ভারতবাদাম," টীকা নিস্প্রয়োজন মনে করি। প্রতিগাছে প্রায় এক কেজি, ফল দেয়। বৃষ্টি দেরীতে আসার দরুণ এবার দেরীতে চাষ এদেশে। প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রে ফসল তোলা হয়ে গেছে শুনলাম—আর এখানে আরও মাসখানেক লাগবে ঘরে ফসল তুলতে।

ভেরাবলে আসবার পথে আলিয়াবাবা ষ্টেসনে দুধওয়ালীদের সমারোহ সত্যই আশ্চর্য্যজনক—তাদের পণ্যসম্ভারের বিপুল আয়োজন, পোষাকের পারিপাট্যও জাকজমক সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহিলাদের গলার হার ৪—৬ লরি, চ্যাপটা বিছাহারের মত অনেকটা—অভিনব তাদের পোষাক ও অলঙ্কার। দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই বেশী। সবার গন্তব্যস্থল "জামনগর" নিকটবর্ত্তী বড় শহর। দৈনিক যাত্রীদের কেহ ঠিকমত দুগ্ধপাত্রগুলি গাড়ীতে না উঠাতে পারলে সহযাত্রী দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা শিকল টেনে গাড়ী থামিয়ে তাদের সাহায্য করে। শুনলাম যে এটা প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার এখানে। জানিনা সংশ্লিষ্ট রেলকর্ম্মচারীদের যোগসাজসেই ইহা সংঘটিত হয় কিনা।

এই শহরে মিঠাইর দোকান নেই বললেও চলে—যাহা আছে তাহা বাদামী হালুয়ার দোকান, খাদ্য সামগ্রীগুলি অপরিচিত, বালুসাই ছাড়া। মোটামুটি যাহা দেখলাম, সমগ্র ভারতে একটি সামগ্রী কেবল সর্ব্বব্যাপী—সেটি দুগ্ধ। দুগ্ধবতীরা তাই এদেশে পূজ্য। নারীকে আমরা বলি দেবী, গাভীকে বলি ভগবতী। পুরুষ হয়েছে পুরুষোত্তম, আর ধর্ম্মের ষাঁড়কে আমরা বলি নন্দী।

দুগ্ধজাত সকল সামগ্রী এদেশে সকল সম্প্রদায়ের ভোজ্য। দই, প্যারা, মালয়, রাবড়ির অভাব নেই, মূল্য যাহাই হোক।

১৬। দ্বারকা (ও ভেটদ্বারকা)

জুনাগড় হয়ে দ্বারকা পৌঁছাই আমরা বৈকাল ৩-৪০ মিনিটের সময়। রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমে থাকি ও টাঙ্গাভাড়া করে অদূরে হোটেলে গিয়ে মাংসভাত খাই। যে কারণেই হোক, বেশ কয়েকদিন পরে পেটভরে আনন্দের সঙ্গে ভোজন সমাপন করি, বিলটাও দেখলাম বেশ ভারী, তবে জানেনতো পেটে খেলে পিঠে সয়, এই আর কি! রাত্রেই আমরা দর্শন করি—

১। দ্বারকাধীশ মন্দির (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ষ্টেসন থেকে দেড় মাইল। সন্ধ্যারতির দৃশ্য সত্যি অতি চমৎকার—বিশেষ রকম অনুভূতি জাগে প্রাণে।

২। ভারকেশ্বর—সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সমুদ্রবেলার অপরূপ সৌন্দর্য্য এখান থেকে নয়নগোচর হয়।

৩। শ্রীজগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য মঠ। আদি শঙ্করাচর্য্যের তৈরী চারিটি মঠের একটি এই মঠ।

৪। রুক্মিনী মন্দির দ্বারকাধীশ কৃষ্ণমন্দির থেকে দেড় মাইল। এখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশ আদায়ের চেষ্টা করেন—ঠাকুরের লীলাকীর্ত্তন, পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি কারণে। সুস্বাদু পরিশ্রুত জলের বড় অভাব এখানে এবং এজন্য দূর থেকে পানীয় জল আনার ব্যয়ও অনেক পড়ে।

দ্বারকা একটি নয়, বহু। সমুদ্রগর্ভে হয়তো ইতিমধ্যে একটি বিলীন হয়েছে। এখনো দুটি দ্বারকা পাশাপাশি বিদ্যমান। একটি হল সত্যভামাপুরী, অপরটী রুক্মিনীপুরী। এদিকে কৃষ্ণের আঞ্চলিক নাম "রণছোড়নাথ", কেহ কেহ বলে রণছোড় রায়। দ্বারকা ভারতের চতুর্থধামের অন্যতম। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম এই পাঁচটি—ধর্ম্মমতের পাঁচ রকমের স্থাপত্য শিল্পের

যে প্রাচুর্য্য এখানে দেখা যায়, ভারতের আর কোথাও বোধ হয় এমনটী নেই। এখানে মতামতের প্রাধান্য নয়, বিভিন্ন দর্শকের সমন্বয়। সংঘর্ষ নয়, সংযোগ। ঘৃণার দ্বারা অন্যকে ক্ষয় নয়, প্রেমের দ্বারা পরস্পরকে জয়।

এখান থেকে ওখাবন্দর মাত্র ২০ মাইল, আর "বেট" (ভেটদ্বারকা) এখান থেকে সমুদ্রপথে প্রায় ৪ মাইল। এই বেট হল পাটরাণী সত্যভামা মন্দির ও কৃষ্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। দ্বারকাতে একটি বড় শিখ গুরুদ্বারা আছে। দ্বারকার আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১৭ বর্গমাইল ও ১৫,০০০ (পনের হাজার)। এখান থেকে বাস নিয়মিতভাবে জামনগর, পোরবন্দর ও ওখা যাতায়াত করে। টাঙ্গা ও রিক্সা আছে কিন্তু ট্যাক্‌সী নেই। হোটেল, লজিং, রেষ্টহাউজ ধরমশালা ইত্যাদি প্রচুর।

পরদিন প্রাতে সোমবার, ২৮শে অক্টোবর তারিখে আমরা দ্বারকাধাম ছেড়ে ওখার ট্রেন ধরি ৭/৪০ মিনিটে, আর ওখা পৌছাই বেলা ৯/৩০ মিনিটে। লগেজ সব "ক্লোকরুমে" জমা দিয়ে অগৌণে ভেটদ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। ঘাট থেকে মটর বোটে চেপে "বেট" যাই (জনপ্রতি টিকেট ৩০ পঃ) এবং টোল ট্যাকস্‌ ৩০ পঃ = একুণে ৬০ পয়সা এখানে একটী ভাল মিঠাই দোকান আছে, মালিক শ্রী শান্তিলাল ভাট। তিনি বেশ বাংলা বলতে পারেন ও বহু বাঙ্গালী তার খাবার দোকানের প্রশংসা করেন শুনলাম। বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী প্রবোধ কুমার সান্ন্যালেরও স্বাক্ষর আছে তার খাতায় দেখলাম। বেট থেকে ফিরে ওখান থেকে সেদিনই বোম্বে রওনা হলাম।

১৭। বোম্বে।

ওখা থেকে বোম্বে আসবার পথের কথা এখনও কিছু মনে আছে—মনে দাগ কেটেছে বলেই নয় কি? ওখা থেকে "বোম্বে সেন্ট্রাল" রেলপথে ৯৮৪ কিঃ মিঃ, মেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া টাঃ ২৮·৫০। বিখ্যাত হীরকখনির সন্নিকটে পান্না ড্যাম দেখলাম রাজকোটের কিছু আগে—অতিরিক্ত জলটা নদীর মত প্রবহমান।

দেশী কাঠবাদাম ষ্টেসনে ও গাড়ীর ভিতরে হকাররা খুব বিক্রি করছে—উপরের নরম খোসা (বাদামের উপরকার অংশ যেটা পাকিলে একটু নরম ও লালমতন হয় এবং বাদুরের প্রিয়খাদ্য জানি) সুস্বাদু বলে স্থানীয় লোকেরা আনন্দের সহিত তাহা কিনে নেয়। জামনগর ষ্টেসনে দেখলাম ঘোড়ার বদলে উটের গাড়ী—"যস্মিন দেশে যদাচারঃ"। সৌরাষ্ট্র একসপ্রেসে আমেদাবাদ পেঁাছাই সকাল ৬/৪৫ মিঃ, সুরাট বৈকাল ২/৩০ মিনিটে। সুরাট ষ্টেসনের কথা একটি বিশেষ কারণে বারে বারে পড়ে মনে। আমাদের দলের একজনের "মনিব্যাগ" পকেটমার হয় এই ষ্টেসনে। সুরাটে গাড়ী থামবার প্রাক্কালে তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেম, প্যাণ্টের ডান পকেটে ছিল "মনিব্যাগ—যার ভিতরে আনুমানিক সর্ব্বসমেত ২০০৲ টাকা ছিল। মতলব ছিল ষ্টেসনে গাড়ী থামলে খানিকটা পায়চারি করে নেবেন ও ভাল চা পেলে তাও গ্রহণ করবেন, কারণ এদিকে খুব "কাফে" পাওয়া যায়, তেমন ভাল চা পাওয়া যায়না। তিনি বের হওয়া মাত্র বাথরুমের দরজায় একটী তন্বী মহিলার সাথে মুখোমুখী ধাক্কা লাগে একটু বিসদৃশ ভাবে। মহিলাটি কিন্তু কালবিলম্ব না করে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। বন্ধুবর হতভম্ব হয়ে তার নিকট ক্ষমা চাইবার জন্য একটু দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের নিকট ফিরে এসে যখন এ কথা বলেছিলেন তখন দলের আর একজন তাকে চা-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনিও ষ্টেসনে নামবার জন্য গেটের দিকে এগুতে এগুতে হঠাৎ বিরস-বদনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মলিন মুখ-চোখের অবস্থা দেখেই একটা গোলমাল বুঝতে পারি—তিনি বলেন যে তার সব খোয়া গিয়েছে, মনিব্যাগ অন্তর্ধান। বোঝা গেল মহিলা পকেটমারটির পাকা হাত ও পাকা বুদ্ধি, বামালসহ ষ্টেসনের ভীড়ে সরে পড়েছে। তাকে গাড়ীতে বা প্ল্যাটফরমে আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। অবশেষে আমরা বোম্বে সেন্ট্রাল ষ্টেসনে পৌঁছাই রাত্রি ৯/৩০ মিনিটের সময়। ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্টের (মিঃ তেওয়ারী) অনুমতি নিয়ে রাত্রে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে রাত্রিযাপন করি

এবং প্রত্যুষেই "বোম্বে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস" ষ্টেসনে চলে আসি ট্যাক্সি যোগে। প্রাতে "এলিফাণ্টা কেভস" (টিকেট জনপ্রতি টাঃ ৩·২০) যাই মোটর লঞ্চে করে (নাম কোকন)। এলিফাণ্টা কেভস্ এর আয়তন ১২৩'—০০"×১২৬'—০০" ফুট (মেন হল)—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তৈরী। সমুদ্রের ভিতরে প্রায় ১০ কিঃ মিঃ দূরে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ—জেটিতে নেমে প্রায় ১০ মিঃ হেঁটে উপরদিকে উঠতে হয়, ভাল সিড়ি আছে। হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়, (৪ জনে বয়ে নেয়)। পাথর কেটে খোদাইকরা মূর্ত্তিগুলি সবই প্রায় বিকলাঙ্গ—মুসলমান বাদশাহেরা (বিশেষ করে কালাপাহাড়ের সময়ে) ঐ সব অপকীর্ত্তির জন্য দায়ী বলে কথিত। ওখানে মোট নয়টি গুহাতে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি অধিষ্ঠিত :—

১। নটরাজ শিব,

২। অন্ধকাসুর বধ,

৩। শিবপার্ব্বতী বিবাহ,

৪। গঙ্গাবতরণ,

৫। ত্রিমূর্ত্তি (মহেশ),

৬। অর্দ্ধনারীশ্বর শিব,

৭। মামিনী পার্ব্বতী,

৮। রাবণের কৈলাসধারণ, ও

৯। যোগীশ্বর শিব।

বোম্বে, এখন যাহা হয়েছে, এক বিরাট শহর। ইহাকে "ভারতের দরজা" আখ্যা দেওয়া ন্যায়সঙ্গতই বটে। ইহার আয়তন ১৭০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা প্রায় ৪,১৫ লক্ষ, তিনদিকেই সমুদ্র বেষ্টিত। এখানে মারাঠী, গুজরাটী ও হিন্দী ভাষার চল বেশী তবে ইংরেজীও বাদ যায় না। বোম্বে পশ্চিম রেলওয়ে ও মধ্য রেলওয়ে "টারমিনাস" ষ্টেসন, এখানে প্রচুর ছোট বড় ট্যাকসি এবং নিয়মিত বাস সার্ভিসের সুবন্দোবস্ত আছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহরেও নিকটস্থ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শনের বন্দোবস্ত বর্ত্তমান-

(মোটর, বাস ও মোটর লঞ্চযোগে)। শতাধিক ছোট বড় হোটেল, বোর্ডিং, লজিং, রেষ্টুরেন্ট ও ধরমশালা অছে। বড় বড় নামজাদা হোটেলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম ঃ—

১। এয়ার লাইন হোটেল, চার্চ্চগেট রিক্লামেশন, বোম্বে ১ (সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)।

২। এম্বাসেডর হোটেল (ঐ),

৩। রিটজ হোটেল (ঐ),

৪। নটরাজ হোটেল, ১৩৫, নেতাজী সুভাষ রোড, বোম্বে ১ (সম্পুর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)।

৫। তাজমহল হোটেল, এপলো বন্দর, বোম্বে ১, (সম্পুর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)।

দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া (দেড় মাইল),

২। জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী ও প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম (১ মাইল),

৩। মেরিণ ড্রাইভ—২ ফারলং,

৪। একোয়ারিয়াম (জনপ্রতি টিকেট মূল্য, ফুল ২৫, ও শিশু ১২ পয়সা)—২ মাইল (সোমবার বন্ধ)।

৫। চৌপট্টি বীচ (আড়াই মাইল),

৬। মণিভবন (গান্ধী মেমোরিয়াল—আড়াই মাইল), রবি, সোমবার বন্ধ থাকে।

৭। মালাবার হিল (ঝুলন্ত বাগান ও কমলা নেহেরু পার্ক, সাড়েতিন মাইল),

৮। ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস ও এলবার্ট মিউজিয়াম (তিন মাইল), সোমবার বন্ধ, দর্শনী জনপ্রতি ৫ পঃ (বুধবার কেবল মহিলা ও শিশুদের জন্য খোলা)।

এবং ৯। সেন্ট টমাস ক্যাথিড্রেল—এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন গীর্জ্জা।

অল্পদূরে আরো কতকগুলি উল্লেখযোগ্য স্থান বা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি অবশ্য দর্শনীয় তালিকায় থাকবার দাবী রাখে।

যেমন ১। আ্যারে মিল্ক লেলোনী (কুরলা হয়ে ৩২ কিঃ মিঃ আর আন্ধেরী হয়ে ৩৫ কিঃ মিঃ বাসে বা ট্যাকসি করে)—ভারতের বৃহত্তম সরকারী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান।

২। এলিফাণ্টা কেভস্ (অষ্টম শতাব্দীর তৈরী মন্দির) বিস্তারিত পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৩। জুহু বীচ (রেলে বা বাসে ২০/২১ কিঃ মিঃ) অতি মনোরম সমুদ্রের বেলাভূমি—বিশেষ করে সূর্য্যাস্ত দর্শনের প্রশস্ত স্থান।

৪। পাওয়াই—বিহার লেক। মোটরে কুরলা হয়ে প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ, আব আন্ধেরী হয়ে ৩৫ কিঃ মিঃ।

৫। বেসিন কেল্লা==পঞ্চদশ শতাব্দীর তৈরী পর্তুগীজ ফোর্ট (রেলগাড়ীতে বেসিন রোড ষ্টেসন ৫২ কিঃ মিঃ ও সেখান থেকে ট্যাকসি, টাঙ্গা বা বাসে ৫ কিলো মিটার)।

৬। রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রম (খারে রেলষ্টেসনের সন্নিকটে)।

বোম্বেতে সমস্ত জায়গার বিমান নিয়মিত যাতায়াত করে। বিভিন্ন এয়ার লাইনস্ কোম্পানীর আফিস ও আছে ২৩টী। এখানে সিনেমা হাউজ আছে বহু, যেমন আছে ষ্টুডিও, দেশী বিদেশী ফিল্ম দেখান হয় প্রায় ৩৪/৩৫টী ছবিঘরে, আর আছে প্রায় ১২টী স্থায়ী থিয়েটার হল। কেন্দ্রীয় সরকারের টুরিষ্ট আফিস হল : ১২৩, কুইনস রোড, বোম্বে ১, আর মহারাষ্ট্র সরকারের টুরিষ্ট আফিসের ঠিকানা, ফোরসোর রোড, বোম্বে ৩২। কোথাও বেড়াতে যাবার পূর্ব্বে তাদের সাথে পরামর্শ লাভজনক হবে।

হিন্দুদের মহালক্ষ্মী মন্দির, বাবুলনাথ মন্দির, মোম্বা দেবী মন্দির, বালকেশ্বর মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয়। অনেক লোকের বিশ্বাস "মোম্বা" দেবীর নাম থেকেই "বোম্বাই" শহর নামের

উৎপত্তি হয়েছে। ওরলি বুদ্ধ মন্দির, পারসীকদের অগ্নি মন্দির, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক, চার্চ্চগেট, ও মুসলমানদের জন্য বান্দ্রা মসজিদ (মহম্মদ আলি রোড), শিখদের দাদার গুরুদ্বারা ও কলবাদেবী গুরুসিং সভা, খৃষ্টানদের বান্দ্রা চার্চ্চ, সেন্ট টমাস ক্যাথিড্রেল ও ক্যাথলিক চার্চ্চ উল্লেখযোগ্য।

কতজায়গায় ঘুরলাম—ফাঁকে ফাঁকে কি মনে হয় জানেন? আমাদের গতানুগতিক অবিস্মরণীয় কথা=রামকৃষ্ণের বাণী, আরো কত কিছু! মানুষ মাত্রই মরণশীল, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, আমরা সবাই জানি। বড় মজার কথা এই যে আমরা সংসারের যাত্রীরা (রেলের যাত্রীরাও) ভুলে যাই ছেড়ে আসা জীবনের কথা, গাড়ীর কথা, অতীতের কথা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, কষ্ট সবই। পথের সাথীদের কথা আর স্মরণ থাকেনা, পথকষ্টের কথাও নয়। ফেলে আসা জীবনের কথাও তেমনি মানুষের স্মরণ থাকেনা। ভগবানের সৃষ্টির অদ্ভুত রহস্য কে বুঝিতে পারে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, শুধু কাজ চাই, আর তার ফাঁকে দিনান্তে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন কর, প্রাণভরে ডাক, তাহলেই সব পাবে। কাজ করলেই হবেনা, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্য করছি—ফলের জন্য, লাভের জন্য কচ্ছিনা। কাজ কচ্ছি তিনি লগিয়েছেন বলে। আর এক জায়গায় ঠাকুর বলেছেন "ওরে পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, আর প্রেম হলেতো কথাই নাই—ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।" তার কথাগুলি যেমন সরল তেমনি মনে রাখবার মত। তিনি বলেছিলেন প্রাণ থেকে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। যে যেভাবে ডাকে, সেইরূপে তিনি তাকে দেখা দেন। তিনি সর্ব্বত্র আছেন—আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, আগুন, কাঠ, জীবজন্তু সকলের মধ্যেই তিনি—শুধু ডাকার মত ডাকা চাই—তাহলেই সব হবে। মই, বাঁশ, সিড়ি, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে যেমন নানা উপায়ে ছাদে ওঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবার ও অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটি উপায় বলে দিয়েছে।

প্রথমে দশহাত দুর্গাকে পূজা করতে করতে দেখবে দুর্গার দুহাত, তারপর ছোট্ট গোপাল দেখবে। ধ্যান, ধারণা যখন ঠিক ঠিক হবে, তখন আর মূর্ত্তি দেখবেনা—সবই জ্যোতির্ম্ময় দেখবে। এসব কথাগুলি যতই ভাবা যায়, ততই ভাল, প্রাণে এক অনিন্দ্য সুন্দর পুলকের আভাষ পাওয়া যায়।

১৮। এবার পূর্ব্বাভিমুখে (তিরুপতি মাদ্রাজ)।

স্লিপার কোচে বার্থ রিজার্ভ করে মাদ্রাজ একসপ্রেস যোগে আমরা বোম্বে থেকে রওনা দেই দিন ২/৩০ মিনিটের সময়। বোম্বে ভি, টি, থেকে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেসনের দূরত্ব ১২৮২ কিঃ মিঃ, মেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া টাঃ ৩৪·৭০। গাড়ী ছাড়ার অল্প পরেই (কল্যাণের পরে) দেখি পর পর ক্রমাগত ট্যানেলের (সুরঙ্গের) ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমাদের গাড়ী। প্রায় ১৪/২৫টী ট্যানেল পার হলাম একঘণ্টার ভিতরে। কালকা--সিমলা রেলপথে যেরূপ ট্যানেল পর হয়েছিলাম, অনেকটা সেরকম—কোনটা ছোট, কোনটা বড় যেমন হয়। রাইচুরের পরে পথের শোভা মনকে আকৃষ্ট করে—বিরাট বিরাট পাথরের স্তূপ আলতো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট টিলার মত। যেন দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্য কাহারও নির্দ্দেশের অপেক্ষায় তৈরী রয়েছে। আবার কোথাও পাথরগুলি এমনভাবে আছে যে দূর থেকে জন্তু জানোয়ার বা পাখীর মত দেখায়—অদ্ভুত সব। এখানে রেল লাইন উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, আমরা চলেছি দক্ষিণে। রাস্তার পশ্চিম পারে ন্যাড়া ছোট বড় বা অতিবিশাল আকারের কৃষ্ণ ও ধূসর শিলাস্তূপ। কোনটা উচ্চতায় ১৫/৩০' ফুট পর্য্যন্ত একক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পথে তেঁতুল, তাল, আম, খেজুর, ও নানা বৃক্ষরাজির সমারোহ। রেললাইন এঁকে বেঁকে গিয়েছে—পথের দুপাশেই পাহাড়, বেশীর ভাগই ন্যাড়া, কোথাও বা সবুজ গুল্ম আচ্ছাদিত। রাজগীরের নিকটে গৃধ্রকূট পাহাড়ে যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ হয়েছিল বলে কথিত, এস্থানটিও

অনেকটা সেরকম। উত্তুঙ্গ ন্যাড়া পাহাড় ধূসরের সমারোহ, মাঝে মাঝে কৃষ্ণ-নীল। পড়ে যাবে হঠাৎ মনে হলেও তাহা নয়, ঋজু ও কঠিন—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছাড়া তাহাকে টলানো অসম্ভব। দূরান্তে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাহাড়ের শীর্ষদেশে জ্যোতির্ম্ময় চূড়াগুলি অপরূপ—নীচে ঘনকৃষ্ণবর্ণ, অপূর্ব্ব শ্যামল-সবুজ শোভা প্রকৃতির রূপ অতুলনীয়। মাঠে মাঠে নূতন শস্য সমাগত প্রায়, চারাগাছগুলি সতেজ ও আশাবাদী, উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীর মত প্রতীয়মানা। দেদীপ্যমান তাদের দেহ আসন্ন ফলভারে। ধান, যব, সরষে, ডাল আরো কত কি? কোথাও দেখি দ্বিপদ বা চতুষ্পদীদের ভয়ে শস্যরক্ষকেরা ছোট্ট দুর্গা রচনা করে মাঠের শস্য রক্ষণের জন্য বন্দোবস্ত করেছে। দূর পাহাড়ের রবিকরোজ্জ্বল শোভা, আর সন্নিকটে শ্যামল—হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্র মনে এনে দেয় কত আশা, দোলা লাগে প্রকৃতির পরম রমনীয় পরিবেশে।

গাড়ী মহারাষ্ট্র রাজ্য ছেড়ে প্রবেশ করল অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টাকল জংশন ষ্টেসনে। প্রাণের আনন্দে প্রাতরাশ সমাধা করি এখানে। একের পর এক এলেমেলো চিন্তা মনকে করে জর্জ্জরিত। নানাপ্রকার উপাদেয় খাবারে (কিছু এখানে কেনা ও কিছু সঙ্গে আনা) রসনা তৃপ্ত—পরিবেশও চমৎকার। উদর চায় আহার, পেটপুরে আহার! তার সঙ্গে রসনা চায় রসের আস্বাদন। দেহ চায় দেহের সান্নিধ্য, যার সঙ্গে হৃদয় চায় প্রেমেরস্পর্শ। তা না হলে খাওয়াও হয়না, দেহমিলনেও তৃপ্তি হয়না। তার বদলে হয় ক্ষোভ—আপনি কি বলেন? "গুটী" ষ্টেসনে অনেক্ষণ গাড়ী থামে—বাইরে বেশ খানিকটা পায়চারি করে বেড়াই। কুডাপ্পাতে দ্বিপ্রহরের ভোজ সেরে খোলা জানালার পাশে বসেছিলাম। দুপুরের প্রখরতাপ খরতর হয়ে উঠল। রেললাইনের দুপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নাতি-গভীর জলরাশি পার্শ্বস্থ শ্যামল ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধিকরণে (বা কোথাও শুষ্কতা নিবারণে) ব্যাপৃত। প্রকৃতির মহিমা বোঝা দুঃসাধ্য; একহাতে অবারিত দান, অপরহাতে দুর্জ্জয় অভিমানে সব কেড়ে নেওয়া। প্রখর খরতাপে বা প্লাবনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র

কখনও বা হঠাৎ—অভাবনীয়ভাবে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, উদ্ধার পাবার কোন সুযোগই থাকেনা তখন। ভাবতে ভাবতে মনটা যে কেমন হয়ে যায়—কেন এমন হয়? "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কিবা নীর হায়রে জীবন-নদে?" মায়ার মোহে আবদ্ধ আমরা, লীলাময়ের লীলা সম্যকভাবে বুঝতে পারলেই মোহ কেটে যায়, অন্তর ভরে ওঠে তাঁর উপলব্ধিতে। ভক্তি, বিশ্বাসে সব হয়, তর্কে হয়না। একাগ্রতা সহকারে মনেপ্রাণে চিন্তা দরকার, সত্যিকার আগ্রহ, আকুলতা থাকলে দুর্লভ্য জিনিষও সহজলভ্য হয়ে ধরা দেয়। মনেপ্রাণে যেটা চায় সেটা হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়—যুক্তি, তর্ক, ধর্ম্মান্ধতা, রাজনীতি বা বর্ত্তমান যুগের কোন "ইজম্" (·········ism) দিয়ে নয়। জহুরী যেমন জহর চেনে, তেমনি ভক্তের ভগবান সত্যই অন্তরের অন্তস্থলে অব্যক্তভাবে ধরা দেন। আমি জানি, এসব কোন নূতন কথা নয়, তবু উপলব্ধি হয়তো প্রত্যেকের বিভিন্ন। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ"—শাস্ত্রবাক্য। লক্ষ্য একহলেও পথ লক্ষ লক্ষ। তবে যে পথেই চলুক না কেন, উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতা সহকারে তৎপর হলে অচিরে ইষ্টলাভ হয়—ইহা শাশ্বত সত্য। এই মায়াময় জগতে অনন্তমূলের মত মূলজাল বিস্তার করে রেখেছে অদৃশ্য মায়া। মাটীর বুকে মূলজাল গ্রীষ্মে, শীতে শুকনো দেখালেও বর্ষা আসার সাথে সাথে মাটির ভিতরের শুকনো শিকড় জলশুষে সতেজ হয়—সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলে গোটা জমি। আমাদের মনে ও নানাপরিবেশের জন্য শোকে, দুঃখে অশান্তিতে কাতরভাব আসে, কিন্তু মনে একাগ্রতা এনে—সৎচিন্তায়, নামরূপে বা ধ্যানে নিমগ্ন হলে তাহা অন্তর্হিত হয় জলের বুদবুদের ন্যায়।

খালি ধূসর পাহাড়ের মাথায় একটি বৃহৎ শ্বেত প্রস্তরখণ্ড যেন কেমন আনমনাভাবে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে—ভস্মাচ্ছাদিত বিশাল শিবলিঙ্গের মতই বিরাজমান। এই পাহাড়টীর রাজবেশ সত্যই রমনীয়—পার্শ্বস্থ ছোটবড় সব পাহাড়ের রূপ ম্লান করে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত এই "শিবলিঙ্গম্।" দুধারেই যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়ের পর পাহাড়। সুদীর্ঘ আরাবল্লীর কোলে চিতোর—

উদয়পুরের সূর্য্যবংশীয় বীর রাজন্যদের মত এখানকার সুদীর্ঘ পর্ব্বত মালাবেষ্টিত অঞ্চলের বীরত্বকাহিনী ও সুবিদিত। পাহাড়গুলি যেন দূর্গাপ্রাচীর হয়ে তার কোলের সন্তানদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে রত। কঠোর রুক্ষ হলেও মা মা-ই বটেন, তার দানের কথা বলে শেষ করা যায়না—তার ঋণ অপরিশোধনীয়।

নদীর কোলে অফুরন্ত ইমারতি ভাণ্ডার সঞ্চিত। বর্ষার প্রারম্ভেই প্রায় দুকুল হয় প্লাবিত, কিন্তু ৪/৫ মাস পরেই সেখানে থাকেনা জলের চিহ্ন। শুধু বালি আর পাথরকুচি—ধূ ধূ করে প্রান্তরের পর প্রান্তর। স্ত্রীপুরুষ মজুরের দল এখান থেকে মোটা, মিহি বালি গরুর গাড়ী করে চালান দেয় সর্দ্দারের কথামত, আর পাথরকুচি (১/২",১" ও বড়) পৃথক করে গাড়ী ভর্ত্তি করে দেয় যখন যেমন দরকার। পরিবারের প্রত্যেকে এই কাজে ব্যস্ত—কিন্তু দিনান্তে যে মুজুরী জোটে তা পরিশ্রমের তুলনায় খুবই স্বল্প মনে হয়—গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট তো নয়ই। এতেও হয়তো খুশী হত যদি বারমাস এই কাজ পাওয়া যেত—কিন্তু তা হবার নয়। বর্ষার সময়ে ও মাঠে কাজ করে পেট ভরেনা, তদুপরি কাজ জোটানই সবচেয়ে কঠিন। বর্ত্তমান রাজনৈতিক কর্ম্মকর্ত্তারা গ্রামীন লোকের জন্য যা যা করবেন বলেন, কার্য্যতঃ তার সিকিও হয় কিনা সন্দেহ। মাদ্রাজ একসপ্রেসে রেণিগুণ্টা পৌঁছাই বৈকাল ৩/৩০ টার সময়ে। দেবস্থানম্ দপ্তরে "পুছতাছ" (জিজ্ঞাসাবাদ) করার পরে তিরুপতি হয়ে উপরে তিরুমালাই পৌঁছাই বাস যোগে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়। দেবস্থানম কটেজ নং ১৯/ বি (লাল দালান) ভাড়া নিয়ে সেখানে আস্তানা পাতি।

১৯। তিরুমালাই (তিরুপতি)।

দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দির "শ্রীভেঙ্কটেশ্বর মন্দির" এখানে অবস্থিত। এরকম জাগ্রত দেবতা (ভগবান বিষ্ণু) নাকি আর কোথাও নেই। মাদ্রাজ থেকে মোটরে বা বাসে সরাসরি যাতায়াত

করা যায় প্রায় ৮১ মাইল পথ – রাস্তা ভাল। চন্দ্রগিরি তালুকে চিতুর জেলার অন্তর্গত এই বিখ্যাত তীর্থস্থান। তিরুপতির আয়তন প্রায় দেড় বর্গমাইল, রেল ও বাসষ্টেসন আছে, জনসংখ্যা ২২,০০০ হাজার। পূর্ব্বঘাট পাহাড়ের সানুদেশে বেশ ছোট্ট শহর, যার পূর্ব্বনাম ছিল শেষাচল বা ভেঙ্কটাচল। মহাতীর্থ তিরুমালাই পাহাড়ের উপর বাসে না গিয়ে পদব্রজেও যাওয়া যায়—"সর্টকাট" রাস্তায় ৭ মাইল। ইহার আয়তনও দুবর্গমাইলের উপরে। কথিত আছে যে আদি শেষনাগের সপ্তফণার উপরে এই বিষ্ণুতীর্থ বর্ত্তমান। তিরুপতির সতটি পাহাড় হল আদিশেষনাগের সাতটি ফণা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৮০০' ফিট উচু এই তীর্থস্থান। দৈনিক গড়ে ৬,০০০ হাজার তীর্থযাত্রী তিরুমালাই দর্শনমানসে এখানে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে ইহা মেরুপর্ব্বতের অন্তর্গত ছিল — বায়ু ও আদি শেষনাগের যুদ্ধকালীন হঠাৎ মেরুপর্ব্বত ভেঙ্গে গিয়ে একটা অংশ পৃথিবীতে নেমে আসে। ভগবান বিষ্ণু ঐ পর্ব্বতটীকে খুব ভালবাসেন বলে ঐস্থানে বাস করেন, পুরাণে উল্লেখ আছে। এই ভেঙ্কটাচল পাহাড়ের বিগ্রহের অপর নাম শ্রীভেঙ্কটেশ্বর। প্রখ্যাত তীর্থঙ্কর শ্রী রামানুজ তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দ রাজস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—আর শ্রীনাথমুনি প্রতিষ্ঠা করেন উপরে তিরুমালাইর মন্দির বা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির। ঋগ্বেদেও এই ভেঙ্কটেশ্বরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রলয়কল্পের পরে মহাবিষ্ণু শ্বেতবরাহরুপে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় পৃথিবী সৃষ্টি করেন। অশিব শক্তি বিনষ্ট করে ধর্ম্ম সংস্থাপনার জন্য তিনি তিরুমালাই স্বামী পুষ্করিণীর পারে প্রকাশমান হন। তিরুমালাইতে স্বামী পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে বরাহস্বামীর মন্দির তারই স্বাক্ষ্য বহন করছে। ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের বহু পূর্ব্বেই এই বরাহস্বামী মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল বলে প্রকাশ। সঙ্গম-যুগের বহু তামিল কবিতায় ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতীয় জম্বুউপদ্বীপের রাজারা, নবম শতাব্দীর কাঞ্চী-পুরমের পল্লভবংশীয় নৃপতিগণ, দশম শতাব্দীর তাঞ্জোরের চোলবংশীয়

রাজন্যবর্গ, ১৪০০—১৫০০ শতাব্দীর বিজয়নগরের মহারাজারা সবাই ভেঙ্কটেশের বহুপূজা ও উপহার দেন। মহীশূর ও গাড়োয়াল রাজাদের দান ও উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরাজত্ব ধ্বংসের পরে কর্ণাটের মুসলমান সুলতানেরা এবং পরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোং ইহার সংরক্ষণ করেন এবং প্রায় একশতাব্দী কাল হাতীরামজী মঠের তত্ত্বাবধানের দৈনিক পূজা চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত একজন মহান্তের নির্দ্দেশনায় ঐ বিখ্যাত মন্দিরের সমস্ত কাজ পবিত্রভাবে সুসম্পন্ন হয়। ১৯৩৩ সালে মাদ্রাজ আইন সভায় "তিরুমালাই তিরুপতি দেবস্থানম কমিটি" গঠিত রয় এবং তাহাদের উপর ন্যস্ত হয় পরিচালনার সমগ্রভার। ১৯৫১ সালে একটি নূতন "বোর্ড অব ট্রাষ্টীজ" গঠিত হয় এবং সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন বলে আইন পাশ হয়। এই বোর্ড অব ট্রাষ্টীজ ও মনোনীত একসিকিউটিভ আফিসার অদ্যাবধি সমস্ত-কাজের সুবন্দোবস্ত করে আসছেন। কপিলাতীর্থে স্নানাদি করে মন্দিরে যাওয়া বিধেয়। পথেই পরে—অলিপিরি গোপুরম ও গলি-গোপুরম। এই গলিগোপুরম তোরণের চূড়া বহুদূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে থাকবার জন্য সোলট্রি ও বহু "কটেজ" আছে—বর্ত্তমানে বিজলি বাতি ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হয়েছে যাত্রীদের জন্য। দর্শন ও পূজাদেবার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সুপ্রভাতম্, আরতি, ফুলাঙ্গিসেবা, আমন্ত্রোৎসবম্, অভিষেকম, ইত্যাদি। বিভিন্ন পূজার সময়ও যেমন আছে তেমনি আছে বিভিন্ন পূজা-অর্চ্চনার রকমারি দক্ষিণা—১৲ টাকা থেকে ৪৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। তবে দৈনিক ধর্ম্মদর্শনম (আর্থাৎ বিনাদর্শনীতে ঠাকুর দর্শন) এর বন্দোবস্ত আছে। বিরাট লাইন—প্রাতে ১০ ঘটিকায় লাইন দিলে সাধারণতঃ ৩টার সময় দর্শন মিলে—ধর্ম্ম দর্শনের সময় দৈনিক ৩টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত। লাইনের পাশে পাশে বহু ভলান্টিয়ার থাকে, খাদ্যবস্তু ও হকারেরা বিক্রী করে—কোন অসুবিধা হয়না বেশীসময় লাইনে থাকার জন্য। দর্শনের পরে প্রত্যেকেই কিছু ভোগের প্রসাদ পান—আর দরকার মনে করলে

ভোগের প্রসাদ বা মিঠাই প্রসাদ কিনতেও পাওয়া যায়—মন্দিরাঙ্গনের ভিতরেই।

মুখ্য মন্দিরটি দ্রাবিড় স্থপতিবিদ্যার একটি আশ্চর্য্য নিদর্শন। গোপুরম বা সিংহদ্বার পূর্ব্বদিকে—আনন্দনিলয়ম্, সোনা দিয়ে মোড়া ভেঙ্কটেশের বেদীর উপরিভাগ। মন্দিরের ত্রিপ্রকরম্ বা তিনটী মহল আছে—বাহিরের দিকে প্রথমটির নাম "সম্পাঙ্গী প্রদক্ষিণম্"। এই অংশে আছে কৃষ্ণদেব রাজা, ভেংকটপতিরাজা ও অচ্যুতরাজার মূর্ত্তি, আর আছে তাম্রনির্মিত আকবর শাহের মন্ত্রী বিখ্যাত তোডরমল ও তার সহধর্ম্মিণীর। স্বর্ণনির্ম্মিত "ধ্বজাস্তম্ভম" এখানে দেখা যায়। দ্বিতীয় বা মধ্য অংশটীর নাম "বিমাণপ্রদক্ষিণম" এই অংশে আছে পাকশালা, যজ্ঞশালা, কল্যাণমণ্ডপমম্ আর বকুল-মালিকা, রামানুজ, গরুড়মূর্ত্তি ইত্যাদি। ভিতরের মহল বা শেষ-প্রকরমে আছে "রাঙ্গামণ্ডপম" আর এর পরেই বৈকুণ্ঠ প্রদক্ষিণম্—যাহা সাধারণতঃ বন্ধই থাকে। ধনুরাশির শুক্লপক্ষের একাদশীতে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) মাত্র একদিনের জন্য খোলা হয় এই অন্তর প্রকোষ্ঠ। ইহার দরজা সোনা দিয়ে মোরা বলে এর নাম "বাঙ্গাক ডকিলি" মূলবেরাম (বা ভগবান ভেংকটেশ্বর) দর্শনমাত্র ভক্তিরসের সঞ্চার হয়—মনে জাগে পুলক। ভেংকটেশের বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে, যথা উৎসব বেরাম (মলয়াপ্পাস্বামী), ভোগ শ্রীনিবাস-মূর্ত্তি, কলুভু শ্রীনিবাস মূর্ত্তি, উগ্র শ্রীনিবাস মূর্ত্তি ইত্যাদি। তিরু-মালই ও তিরুপতিতে পবিত্র তীর্থম্ আরো আছে যেগুলির কিছু বর্ননা অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

১। স্বামী পুষ্করিণী—মূল মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। পুরাণে আছে ইহাতে বিধিমত অবগাহন করলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

২। আকাশগঙ্গা জলপ্রপাত। মন্দিরের প্রায় দুমাইল উত্তরে অবস্থিত। এখান থেকে দৈনিক পূজার জন্য জল সংগৃহিত হয়।

৩। পাপবিনাশনম্ প্রপাত—তিনমাইল দূরে অবস্থিত। তিরুমালইতে এখান থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

৪—৭। বৈকুণ্ঠ তীর্থম্, পাণ্ডব তীর্থম্, জাবালীতীর্থম্, গোগর্ভতীর্থম্—সবই প্রায় দুমাইল দূরে এদিকে-ওদিকে অবস্থিত।

জলাশয় ছাড়া দেবস্থানম নেই। যেখানে অবগাহন সেখানেই পুণ্য। রামেশ্বরমের অথবা দ্বারকার বা জগন্নাথের অমন তিনটী বিরাট মন্দির, সেজন্যে বিরাটতর সমুদ্রের প্রয়োজন ছিল। ঐ তিনধামের পর চতুর্থধাম অর্থাৎ হিমালয়ের বদরিকাধামে অলকানন্দার স্রোত প্রবহমান। সেখানেও আছে অবগাহনের কথা। অমরনাথের গুহার নীচে অমরগঙ্গা—সেই গঙ্গায় উলঙ্গ স্নানবিধি। তিরুমালইতেও নিকটস্থ স্বামী পুষ্করিণীতে অবগাহনের পরে ভেংকটেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার বিধি আছে। সর্ব্বত্রই তাই এক অভিন্ন, অবিভাজ্য ব্যবস্থা। ধর্ম্ম নয়, সংস্কৃতি। অবগাহন-স্নান মানে কলুষনাশন যেটি বিজ্ঞানসম্মতও বটে। সমস্ত ভারতবর্ষ একই সূত্রে বাঁধা একই অনুভাবে। বিভিন্ন ভাষা, বৈচিত্র, বিভিন্ন সমাজনীতি, রুচি—এসবই সেই মূল সংস্কৃতির বহিরঙ্গ। একই আচমনীমন্ত্র সর্ব্বভারতের—"গঙ্গেব যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী, নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী"—সাতটি নদীর গ্রন্থিতে ভারতবর্ষ বাঁধা। এইটি নিত্যপূজার মন্ত্র, এমন্ত্র সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির—এটি বেদের অনুশাসন।

তিরুপতি (নীচের পাহাড়ে) ও বহু মন্দিরাদি আছে। মুখ্য হল শ্রী গোবিন্দরাজা স্বামী মন্দির। পূর্ব্বেই ইহার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ ও অন্যান্য মন্দির দর্শনীয়। প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে নয়দিন ব্যাপি এখানে "ব্রহ্মোৎসবম্" পালন করা হয়, খুব জাঁকজমক সহকারে। শ্রীকোদণ্ডরাম মন্দির ও দেখবার মত। মার্চ্চ-এপ্রিলমাসে এখানে বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। সাক্ষাৎ ফল প্রদান করে বলে এই মন্দির বিগ্রহের খ্যাতি আছে।

তিরুচানুর-তিরুপতির তিনমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভগবান ভেংকটেশের সহধর্মিনী শ্রী পদ্মাবতীর মন্দির বর্ত্তমান এখানে।

দেবস্থানম কমিটির অনেক কাজ-মন্দির পরিচালনা সুকঠিন হলে

ও বাহিরের কাজও তারা নিষ্ঠার ও পারদর্শিতার সাথে সুসম্পন্ন করেন। যেমন—

১। তিরুমালই-তিরুপতি দেবস্থানম্ পরিবহন সংস্থা,

২। শ্রীভেংকটেশ্বর কলেজ,

৩। শ্রীভেংকটেশ্বর মিউজিয়াম,

৪। ওরিয়েন্টাল কলেজ (সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল ও তেলেগু শিক্ষণকেন্দ্র),

৫। ভেংকটেশ্বর গোশাপা, ইত্যাদি।

কল্যানকট্টু সঙ্গম্ (নাপিত সংঘ) নির্দ্দিষ্ট নামে সবাইর মস্তক মুণ্ডনের কাজ করে-যারা উহা মনস্থ করেন। দেবস্থানে জুতা পরিধান বিধেয় নয়, যেমন নয় ধূমপান। ফুল দেবভোগ্য বলে জনগণ সাধারণতঃ উহা ব্যবহার করেনা এখানে। দেবস্থানমের দোকানে (রেষ্টুরেন্ট ও ভোজনালয়) খাদ্যবস্তু অপেক্ষাকৃত সস্তা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। তিরুমালইর জাগ্রত্ত দেবতা ভেঙ্কটেশের সম্বন্ধে বহু কাহিনী কীর্ত্তিত হয় মুখে মুখে। কোনটা কতটা সত্য বা কোনটাই আদৌ সত্যকিনা তাহা কেহ হলপ করে বলতে পারে না। তবে একটী ঘটনার কথা অনেকে সত্য বলে মনে করেন, সেটি সংক্ষেপে এখানে বলছি :—

"ভক্তাধীন ভগবান"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কাকিনাদে নলাপ্পা সেট্টি নামে এক ধার্মিক ব্যবসায়ী বাস করতেন—তার স্ত্রীর নাম রাধা। তারা উভয়ে ছিলেন ভগবান ভেঙ্কটেশের ভক্ত। তাদের কোন সন্তান না থাকায় মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদা রাধা তার স্বামীর নিকটে অন্যান্য কথার পরে বলে ফেললেন, যদিও আমরা প্রত্যহ ভগবান ভেঙ্কটেশের পূজা না দিষে, জলগ্রহণ করিনা, ভগবানের নামে আমরা সাধ্যমত দানধ্যান করছি, তবু কোথায়, তিনি আমাদের মনস্কামনা পূরণ করছেন না কেন? শান্তভাবে তার স্বামী উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর উপর বিশ্বাস হারিও না, শুদ্ধ অন্তরে তাঁর সেবা

করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করবেন। যতদিন অর্জিত কর্ম্মফল শেষ না হয়, আমাদের কষ্ট করতেই হবে।"

নলাপ্পা সেট্টির ব্যবসায়ে মন্দা দেখাদিলে ক্রমে ক্রমে তার সম্পত্তি এমনকি স্ত্রীর অলংকারাদিও চলে গেল দেনার দায়ে। কিন্তু ভক্তি অচল, অটল রেখে ভগবানের নিত্যসেবায় তারা কখনও বিমুখ হয়নি। অপুত্রক সেট্টির ধৈর্য্য পরীক্ষার তখনও শেষ হয়নি।

অনন্যোপায় হয়ে নলাপ্পা সেট্টি তার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করে একদিন স্থানীয় এক ধনী "কাসিম সাহেবের" নিকট থেকে ২০০০ টাকা ধার নিয়ে পুনরায় ব্যবসা সুরু করেন ভগবানের নামে। এই ব্যবসায়ে তাদের খুব উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল। নলাপ্পা সেট্টির অমায়িক ব্যবহার, ব্যবসায়ে সাধুতা সবাইর হৃদয় জয় করে। এরপরে একদিন পূর্ব্বকথিত ধনী কাসিম সাহেবের বাড়ী গিয়ে সবিনয়ে তার ধারের টাকা ২০০০ ও নির্দেশ অনুযায়ী সুদ সবই শোধ করে দিয়ে আসেন। কাসিম সাহেব টাকাটা একটা পৃথক সিন্দুকের ভিতরে গোপনে রেখে দেন কিন্তু টাকার দলিলটা ফেরত দেন না—বলেন যে তার মুহুরী এখানে নেই, কোথায় সে রেখেছে জানেননা তিনি। সে আসলে পরে ঐ দলিল সেট্টির নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু তার মতলব ছিল খারাপ—সে উহা ফেরত দেয়না। সেট্টি সাহেব ভাল মানুষ, তার কথায় বিশ্বাস করে বাড়ী চলে গেলেন।

কয়েকমাস অতিবাহিত হয়ে গেল তবু ঐ দলিল ফেরত দেয়না দেখে সেট্টি একদিন নিজে গিয়ে কাসিম সাহেবের নিকট দলিল ফেরত দেবার অনুরোধ জানালেন। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বললেন যে আসল টাকা ও সুদ না দিয়ে কি করে, সেট্টি দলিল ফেরত চাইতে পারেন ? সেখান থেকে নানাভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। বাড়ী ফিরে সেট্টি তার স্ত্রী রাধার নিকট সব বললেন। দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান ভেংকটেশের নিকট অনেক প্রার্থনা জানালেন। ভগবান স্বপ্নাদেশ দিলেন যে কোন ভয় করোনা, সত্যের জয় হবেই। তিনিই দরকার মত আদালতে হাজির হয়ে

তার টাকা প্রত্যর্পণের সাক্ষী দিয়ে আসবেন।

এদিকে কাশিম সাহেব তার নামে নালিশ রুজু করে দিয়েছেন। নলাপ্পা সেট্টির টাকা ফেরত দেবার কোন সাক্ষী আছে কিনা বিচারক জিজ্ঞসা করায় তিনি জবাব দিলেন—ভগবান ভেংকটেশ্বর ছাড়া তার আর কোন সাক্ষী নেই। সেট্টি আগে-পরের সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে তাহার কথা প্রত্যয় না হলে ভগবান ভেংকটেশ্বরের নামে সমন জারী করলে তিনি এসে সাক্ষী দিবেন। বিশেষ কেহ একথায় কর্ণপাত না করলেও বিচারক শেষ পর্য্যন্ত সমন জারী করেন সাক্ষী—ভেংকটেশ্বরের নামে। আশ্চর্য্য কথা এই যে প্রভু ভেংকটেশ্বর সশরীরে সাক্ষীর কাটগড়ায় হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং উক্তটাকা ও সুদ কাশিম সাহেব কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাহা দেখিয়ে দেন। আদালতের সবাই পরমাশ্চর্য্য হয়ে সাধু নলাপ্পা সেট্টির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিচারক ও কাকিনাদা আদালতে ১৬-১০-৮৮ তারিখে তার বিচারের রায় লিপিবদ্ধ—করেন যে মিথ্যাবাদী কাশিম সাহেব আদালতে ঐদিন সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকার পূর্বে নগদ চারিহাজর টাকা জমা দেবেন এবং ঐ টাকার অর্দ্ধেক দুই-হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাবেন ভক্ত ও সাধু ব্যবসায়ী নলাপ্পা সেট্টী। ঠেকায় পড়ে কাশিম সাহেব ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমা দেন আদালতে—আর ২,০০০্ টাকা পুরস্কার পান নলাপ্পা সেট্টি। অবশেষে ভগবান ভেংকটেশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাদের একটি পুত্রসন্তান লাভ হয় এবং সবাইমিলে সুখে শান্তিতে থাকেন। কাকিনাদার আদালতের রেকর্ড ও স্থানীয় বাসিন্দারা আজও সগর্ব্বে এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে বলে কথিত আছে।

২০। মাদ্রাজ (+মহাবলীপুরম্ ও পক্ষীতীর্থম্)।

তিরুমালই থেকে তিরুপতি, রেণিগুণ্টা হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছাই রেলযোগে ভোর ৫/৩০ টাব সময়ে। ক্লোকরুমে মালপত্র জমা রেখে অগৌণে আমরা বাইরে আসি। মাদ্রাজ (বর্ত্তমানে তামিল

নাড়ু—পূর্ব্বে মদ্রদেশ) ভারতের একটি বিখ্যাত বড় ও পুরাণ শহর, প্রায় ৫০ বর্গ মাইল ইহার আয়তন। জন সংখ্যা আঠার লক্ষ, সমুদ্রের পারে অবস্থিত বলে এখানে গরম জামা কাপড়ের মোটেই দরকার হয়না। এখানে সবাই তামিল-তেলেগু ভাষা-ভাষী, অল্প-সংখ্যক বিশেষ শিক্ষিত লোকই হিন্দী ও ইংরেজী ভায়ায় রপ্ত, হিন্দী কিছু জানা থাকলেও তা বলিতে চাহেন না। এখানে আধুনিক বিমান বন্দর, বড় রেলষ্টেসন, এবং সর্ব্বভারতের সহিত সংযুক্ত পাকা বাস রাস্তা আছে। আমরা প্যারীস কর্ণার থেকে বাসে করে প্রথমে যাই মহাবলীপুরম্। সেখানে কত যে পুরাণো মন্দির আছে বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে তাহার যেন শেষ নেই। বিষ্ণুমন্দির, মহিষমর্দ্দিনী মণ্ডপ, কৃষ্ণমণ্ডপম্, পঞ্চপাণ্ডব মণ্ডপম্, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাত্রীদের সুবিধার্থে ২/৪ খানা ছোট ছোট দোকান ও আছে এখানে। মন্দিরগুলি তৈরী ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে এক একটী বৃহদায়তন পাথর কেটে এক একটি মন্দির বা মণ্ডপম্; অদ্ভুত কারুশিল্প ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। কয়েকটি লজিং ও হোটেল আছে। আমরা মামল্লা, ভবনে (বোর্ডিং ও লজিং এর জন্য বিখ্যাত শুনলাম) দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাধা করি।

দ্বিতীয়—পক্ষীতীর্থম্ (বর্ত্তমান নাম "থিরুকাজুগু কুনরম্"
বা তিরুকলিকুন্দ্রম্)।

মহাবলীপুরম্ থেকে বাসযোগে যাই পক্ষীতীর্থম্। ৭৫০ পাথরের সিড়ি অতিক্রম করে পাহাড়ের মাথায় মন্দির প্রাঙ্গনে আমরা পবিত্র পাখী দেখার জন্য অপেক্ষা করি। অবশেষে প্রায় আড়াইটার সময়ে আমরা তিনটি পবিত্র পাখীর সন্দর্শন পাই। যথারীতি তারা পায়সম্ খেয়ে আবার উড়ে যায়। পূজারী উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করেন। এই পাখীগুলি বিষয়ে বেশ কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে শুনলাম। সন্ধ্যার পরে শহরে ফিরে আসি।

পরের দিন প্রাতে টাঙ্গা করে আমরা শহর পরিভ্রমণে বের হই। পূর্ব্বে ও আমি এখানে একাধিকবার এসেছি বলে নূতন কিছু বিশেষ দেখবার নেই জানি, তবু মন্দির, দেবদর্শন, ও বেড়ানতে চিরকালই

আমার আগ্রহ আছে ও থাকবে মনে করি। আমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেড়াই—মাঝে মাঝে অবশ্য ২/৩ বার বিভিন্ন স্থানে থেমে দেহের সেবা যথাযথ ভাবে করে নেই। দর্শনীয় বস্তুগুলির অন্যতম হল ঃ—

১। সেন্টজর্জ্জেস ফোর্ট (২ মাইল দূরে)। ইহা তৈরী হয় ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে। কিল্লার ভিতরে একটা সুন্দর মিউজিয়াম আছে।

২। কপিলেশ্বর মন্দির (সাড়েতিন মাইল দূরে)। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এখানে—সুউচ্চ গোপুরম্ বহুদূর থেকে দৃষ্ট হয়। ইহা তৈরী হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বিশেষ রকম নির্দ্দিষ্ট পোষাকে হিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে।

৩। সরকারী মিউজিয়াম, পাল্লিয়ন রোড, এগমোর। শুক্রবার ভিন্ন প্রতিদিন এখানে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। পল্লব, চোল, চেরা, পাণ্ডিয়া, হয়শালা, বিজয়নগর প্রভৃতি রাজবংশের, বৌদ্ধ সভ্যতার (অমরাবতী ও নাগর্জ্জুন কোণ্ডা) বহু স্মৃতিচিহ্ন ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও আছে বহু (২য় শতাব্দীর তৈরী) ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি যেমন, নৃত্যরত শিব, কোদনব্রমা, সোমস্কন্দ ইত্যাদি। এখানে একটি বিরাট তিমিমাছের স্কেলিটন রক্ষিত আছে (৮৬'—০" লম্বা)—তাঞ্জোরের তিমিমাছের পঞ্জরাস্থির চেয়ে কিছু ছোট। পৃথক দালানে "জাতীয় আর্টগ্যালারী" (চিত্রশালা)—বহুবিধ, চিত্র ও ব্রোঞ্জমূর্ত্তি রহিয়াছে এখানে।

৪। চিড়িয়াখানা—(২ মাইল)। মুর মার্কেটের পিছনে অবস্থিত। জনপ্রতি টিকেট ২৫ পঃ। ভিতরে ছোট একটি "হ্রদ" আছে—যেখানে স্বল্প ব্যায়ে নৌকাবিহার হয়। ছোটবড় ছেলেমেয়েরা এখামে হাতীতে চড়তে

পারে বৈকাল ৪-০০ থেকে ৬-০০ পর্য্যন্ত (টিকেট জনপ্রতি ২৫ পঃ)।

৫। গান্ধী মণ্ডপ (সাড়ে চার মাইল)। সঙ্গীয় বাগানে নানাপ্রকার হরিণ, বন্যকুক্কুট প্রভৃতি আছে।

৬। মেরিণা বীচ (২ মাইল)। প্রায় ৮ মাইল লম্বা সমুদ্র বেলায় মনোরম ভ্রমণোপযোগী স্থান। একপাশে আছে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ণাটের নবাব প্রাসাদ ইত্যাদি। বেড়াতে বেড়াতে আমরা বহু ছোটবড় ঝিনুক কুড়াই এখান থেকে। প্রত্যহ বৈকাল এখানে সহস্র সহস্র লোক আসেন বেড়াতে।

৭। এলিয়ট বীচ (৭ মাইল)—স্নানাদির জন্য বিখ্যাত। এখানে সামান্য—ভাড়ায় স্নানার্থীদের জন্য কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়।

৮। অনন্তপদ্মনাভস্বামী মন্দির, আদিয়ার। সন্ধ্যা বেলায় আরতীর সময়ে আমরা ভগবান—ভেঙ্কেটশ্বর দর্শন করি— মনপ্রাণ আপনাথেকেই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

৯। আঞ্জানেয়া মন্দির, রয়াপেট হাইরোড, আওধিপুরীশ্বরের মন্দির, চিন্তাদ্রিপেট, গীতা আঞ্জনেয়া মন্দির, মনিমঙ্গলম, কাণ্ডস্বামী মন্দির, পার্ক টাউন,

১০। শ্রীসাঁইবাবা মন্দির, মায়লাপুর, এবং আরো অনেক প্রখ্যাত মন্দির আছে এখানে। মন্দিরময় ভারতের পুরাণ ঐতিহ্য মণ্ডিত সব মন্দির।

১১। একোয়ারিয়াম—সোমবার বন্ধ থাকে।

১২। মাউন্ট রোড, চায়না বাজার ইত্যাদি।

মাদ্রাজ (বর্ত্তমানের নূতন নাম "তামিল নাড়ু") অধিবাসীরা হিন্দী মোটেই পছন্দ করেনা। এমন লোক ও আছে যারা হিন্দীতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে ইচ্ছা করে উল্টাউত্তর দিয়ে বিদেশী-লোকদের ভুলপথে চালিত করতে দ্বিধাবোধ করেনা। দ্রাবিড়-কাজাঘাম, তামিলনাদ সংঘ প্রভৃতি সোচ্চার এখানে। সরকারী

অবৈতনিক হিন্দী ক্লাসের বন্দোবস্তও আছে এখানে "নামকোয়াস্তে"।

কেন্দ্রীয় সরকারী টুরিষ্ট ইনফরমেশন বুরো, ৩৫, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ—২ এবং রাজ্য সরকারী টুরিষ্ট ইনফরমেশন সেণ্টার, গভর্ণমেণ্ট এষ্টেট, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ—২ এবং এছাড়া মাদ্রাজ স্টেট ট্রানসপোর্ট ডিপার্টমেণ্ট, প্যারীস কর্ণার, মাদ্রাজ—১, টোপাজ ট্রাভেলস্, স্কোয়ার থিয়েটার, ১২৩, মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ—৬, বিদেশী যাত্রীদের যাতায়াত ও অন্যান্য বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। এখানে বহু হোটেল, বার ও রেষ্টুরেণ্ট আছে, যেমন আছে মন্দির, ধর্ম্মশালা, ক্লাব, সিনেমা হাউজ ইত্যাদি। দেশী-বিদেশী ধরণের হোটেলগুলির মধ্যে কয়েকটী নামজাদা হোটেলের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। বিদেশী ধরণের ঃ—

ক) ক্ল্যারিজেস্ হোটেল, থম্বুস্বামী রোড,

খ) কন্নিমেরা হোটেল, বিন্নিস রোড, মাঃ ২,

গ) ইম্পিরিয়াল হোটেল, ৩, হোয়ানেলস্ রোড, এগমোর।

ঘ) ওসেনিক হোটেল, সান্তোম হাই রোড, মাদ্রাজ—৪,

ঙ) ভিক্টোরিয়া হোটেল, ৩, গান্ধী আরউইন রোড, এগমোর।

চ) কুইনস হোটেল, ভিলেজ রোড, নাঙ্গাবক্কম্, মাদ্রাজ ৬।

২। দেশীয় ধরণের (শুদ্ধ শাকাহার) ঃ—

ক) হোটেল অশোকা, ২২, পানথিয়ন রোড, এগমোর, মাদ্রাজ—৮।

খ) হোটেল দশপ্রকাশ, পুনামলি হাইরোড,

গ) উডল্যাণ্ডস হোটেল, ১/২৩, উডওয়ার্ড এলিয়ট রোড, মায়লাপুর, মাদ্রাজ।

ঘ) টুরিষ্ট হোমস্, ৫, গান্ধী আরউইন রোড, পামোর, মাদ্রাজ।

ঙ) স্বাগত হোটেল, রয়াপেট রোড, মাদ্রাজ ১৪,

চ) গুপ্তাজ অজন্তা হোটেল, ৩২, রয়াপেটা হাই রোড, মাদ্রাজ ১৪।

মাদ্রাজে "ব্রাহ্মণ কাফে" বা হোটেল—রেষ্টুরেণ্ট বহু থাকলেও খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র প্রায় একই রকম। "মাদ্রাজ মিল," বোম্বে মিল বা বাঙ্গালীর খাবার সবই সম্পূর্ণ পৃথক, রান্না ও আলাদা ধরণের। পশ্চিমবঙ্গের মত মিষ্টির দোকান একেবারেই নেই—যাহা আছে তাহা ইডলি—ধোসা, বালুসাই, জিলীপি (এবং ২/১টী বরফি ও মাইশোর পাকের) দোকান মাত্র। বাঙ্গালীর রুচির পক্ষে বেশ অসুবিধাজনক বই কি!

২১। পণ্ডিচেরী।

সন্ধ্যা ৬/৫৫ মিনিটের সময়ে এগমোর (মাদ্রাজ) ষ্টেসন থেকে টিনাভেলি একসপ্রেস যোগে ভেলুপুরম হয়ে আমরা মহাবিপ্লবী ঋষি অরবিন্দের আশ্রম ঐতিহাসিক পণ্ডিচেরী অভিমুখে রওনা দিলাম। অতি প্রত্যুষে পৌছাই পণ্ডিচেরি ষ্টেসনে। রিকশা করে যাই অরবিন্দ আশ্রমের কেন্দ্রীয় আফিসে—সেইখান থেকে সব ঠিককরে ঐ রিকশাতেই যাই সমুদ্রপারে "গেষ্ট হাউসে" প্রায় ৭/৩০ মিনিটের সময়ে। আশ্রমের বিষয়ে কত বলিব—বলে শেষ করা যায়না। সত্যই অপূর্ব্ব ও অবিস্মরণীয়। এখানকার ভাবধারাই অদ্ভুত, কর্ম্মশালায় সবই শেখান হয়—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, সেবাযোগ, ভোগযোগ ও বটে—কি যে নেই তা বুঝলামনা। শুনলাম এথাকার অরবিন্দ মহাবিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী কুমারী সুমিতা চক্রবর্ত্তী (আই-এ-এস্ রূপে) কেন্দ্রায় সরকারের অধীনে সুনামের সহিত কর্ম্মরত। ঋষি অরবিন্দের সমধিস্থানে বসে যেন অভিভূত হয়ে মায় মন। ঋষির উত্তরসাধিকা মা'র আবাসগৃহের দ্বিতলে

(যেখানে ঋষি বাস করতেন এবং তাঁর ব্যবহার্য্য পূতদ্রব্যাদি রক্ষিত আছে) যাবার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে আমরা সেখানেও গিয়েছিলাম। পবিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয় মন—শত কর্ম্মতৎপরতার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও পরম নিভৃতে ভক্তিভাবে সমুজ্জ্বল হয় অন্তর, সেখানে পৌঁছবার সাথে সাথে। সে এক পরমাশ্চর্য্যভাব ধারণা, মনেপ্রাণে উপলব্ধির জিনিষ, ভাষায় বোঝান যায়না। আশ্রমের কেন্দ্রীয় আফিসের একপাশে আছে গ্রন্থাগার, যেখানে আশ্রমিক পুস্তকাদি, ফটো ও অন্যান্য জিনিষ কিনতে পাওয়া যায়। একজন আশ্রমিকের (মিঃ শুকদেব, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত) সঙ্গে মোটরে করে আমরা আশ্রমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনে যাই। দুদিন গেষ্ট হাউসে থাকার জন্য জমা দেই জনপ্রতি ৮৲ হিসাবে, আর মোটরে করে পরিদর্শনে যাবার জন্য জমাদেই জনপ্রতি ৪৲ টাকা হিসাবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলি আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি সেগুলি হল ঃ—

১। কমন কিচেন ও ডাইনিং রুম,
২। হাউস মেণ্টেনেন্স সার্ভিস, হলো ব্রিক ও মোজাইক কারখানা,
৩। কারপেন্ট্রি কারখানা,
৪। সেলাই ও এম্ব্রয়ডারীশালা,
৫। তাঁত ও বস্ত্রবিভাগ,
৬। রুটী কারখানা,
৭। অরবিন্দ আশ্রম ডাক ও তারঘর,
৮। কেন্দ্রীয় আফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র,
৯। কেন্দ্রীয় বুরো—যেখান থেকে অভ্যাগতদের থাকা-খাওয়া-দর্শনাদির পুরা বন্দোবস্ত করা হয়,
১০। লৌহ কর্ম্মশালা,
১১। হস্তনির্ম্মিত কাগজের বিরাট কারখানা,
১২। ছাপাখানা—বত্রিশটি ভাষায় এখানে নানাপ্রকার ছাপার কাজকর্ম্ম হয়।

১৩। শিক্ষা বিভাগ—কিণ্ডার গার্টেন থেকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত।

১৪। ধোবাখানা,

১৫। চিত্রশালা,

১৬। থিয়েটার ও নাচ-গানের আসর,

১৭। গ্রন্থাগার (পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থ "বাইবেল" ১″×১½″×½″—এখানে রক্ষিত আছে), ও

১৮। মনোরম সমুদ্র সৈকতে টেনিস খেলার প্রশস্ত মাঠ ইত্যাদি

এইগুলি ছাড়া আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি সময়াভাবে আমাদের দেখবার সুয়োগ হয়নি। আবার একবার এসে সেসব পরিদর্শনের আশা রইল।

পণ্ডিচেরীতে আমরা অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছিও অনেক; বর্ণাঢ্য বাগানের অভ্যন্তরে প্রমাণ সাইজ পাথরের মূর্ত্তি "মালিনী" বারিসিঞ্চনে রত—প্রাণবন্তই মনে হয়, লাইট হাউস, গান্ধীঘাট, অল-ইণ্ডিয়া রেডিও হাউস, পারলিয়ামেণ্ট হাউস, সার্কেল-ডি-পণ্ডিচেরী, ইত্যাদি। রাস্তাঘাটে এখনো সেখানে ফরাসী নাম ও ঐতিহ্য বর্ত্তমান, এক ফরাসী নামায় রাস্তার মোড়ে লেখা রয়েছে "সারেটার-এট-রিপারটির" (Sarreter et Repartir)—অর্থাৎ থাম এবং চালাও—ইংরেজীতে যেমন Halt & Proceed. রাস্তার নাম অধিকাংশই ফ্রেঞ্চ।

মহাবিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় ২/৪ টা কথা না বললে পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে কিছু বাকী থেকে যাবে। আমি বক্তা বা লেখক নই তবু যাহা শুনেছি এবং যাহা মনে আছে, কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করব। নূতন আন্তর্জাতীয় শহর আরোভিল (Aeroville) বর্ত্তমান পণ্ডিচেরী থেকে তিন মাইল দূরে গড়ে উঠছে। ইউনেসকোর (UNESCO) চেষ্টায় ও যত্নে এই বিরাট ও অভিনব শহর আশা করি দেশের মধ্যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতীস্কে পরিণত হবে অগোণে। পণ্ডিচেরী শহরে ও নূতন অরোভিল নগরে মিশে আছে প্রতিধূলিকনায় ঋষি অরবিন্দের পুণ্যস্মৃতি আর

চিরকাল লোকমানসে শ্রদ্ধার সহিত বহন করবে তার যশোগাথাঁ ও কীর্ত্তিকাহিনী।

পণ্ডিচেরী শহর খুব বড় নয়—শীত কখনই বোধ হয়না। সমুদ্র-বেলায় সান্ধ্যভ্রমণ বড়ই মনোরম। উত্তাল তরঙ্গ শুধু পারের বিশাল প্রাচীরকেই ধাক্কা মারেনা, মারে হৃদয়ের অন্তস্থলে—একেবারে অজান্তে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সুদূরে—অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও। স্বল্প বর্ষা বাদল প্রায়ই হয়, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে, বাকী নয়মাস শুকনো থাকে বলা চলে। মাদ্রাজের দক্ষিণে রেলপথে প্রায় ১১২ মাইল (বাসে ৯৫ মাইল) দূরে এই শহর অবস্থিত।

শ্রী অরবিন্দ কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে বিলাতে যান। ১৩ বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করেন, আই-সি-এস পাশ করেন কিন্তু ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা না দেওয়াতে তাকে সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ১৮৯৩ খৃঃ তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বরোদায় রাজকার্য্যে যোগদেন এবং পরে বরোদা কলেজের ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ঐ সময়ে তিনি সংস্কৃত ও আরো কয়েকটী ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯০৬ সালে তিনি উক্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি আরম্ভ করেন ও কলিকাতায় নূতন বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয় (Bengal National College) এর অধ্যাপক পদে বৃত হন। বন্দেমাতরম কাগজে জ্বলন্ত ভাষায় তিনি অনেক জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি নীরবে পশ্চাতে থেকে বহু বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন, যার ফলে তদানীন্তন বৃটীশ সরকার তাকে বোমার মামলার আসামীরূপে কারারুদ্ধ করে আলীপুর জেলে আটক রাখেন। এক বৎসর কারান্তরালে থাকবার কালে তার জীবনের গতি বদল হয়। তিনি ধ্যান, ধারণা ও যোগাভ্যাস সুরু করেন এবং কারাবাস থেকে মুক্ত হবার পরথেকেই ব্যতিক্রম বেশ বোঝা যায়। বাইরে এসে তিনি কর্ম্ম-যোগীন ও ধর্ম্ম নামক একটী ইংরেজী ও একটী বাংলা পাক্ষিক

পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তিনি ছিলেন নেকনজরে এবং তাকে পুনরায় জেলে পাঠাবার কৌশল খুঁজিতেছিলেন তারা। এক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনি চলেগেলেন ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে। গোপনে সেখানে থাকাকালীন ভগবানের আদেশে তিনি নূতন নাম ধারণ পূর্ব্বক তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান ১৯১০ সালের ৪ ঠা এপ্রিল তারিখে। এবার সম্পুর্ণ পরিবর্ত্তন হল তার। চারিবৎসর নীরবে যোগসাধনা করবার পরে তিনি মাতা পল রিচার্ডের সহযোগিতায় আর্য্যনামে একটী মাসিক পত্রিকা বের করেন দর্শন সম্বন্ধে। তার প্রবন্ধনিয়ে পরে পুস্তককারে ছাপা হয়েছে এবং এখনো বাজারে তার চাহিদা কমেনি। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু কোন রাজনীতি বা সভাতে তিনি আর যোগদিতে চাইলেননা। তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা-রূপে অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন তখন আর ইহাও বুঝিতে পেরেছেন যে ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হবে—তিনি তাই দিবারাত্রি দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য ঋষিরূপে জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হলেন। তিনি আত্মিক উন্নতির হোতা রূপে দেশকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলেন—নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে। ১৯৫০ সালের ৮ই ডিসেম্বর মহা-প্রয়াণ দিবসে—মহাবিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ দেহত্যাগ করে অমরধামে চলে গেলেন।

মার বিষয়ে যতটুকু জানি—তিনি ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী শহরে জন্মগ্রহণ করেন ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও সুবক্তা বলে খ্যাত হয়েছেন। ১৯১৪ সালের ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে তার সহিত শ্রীঅরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তিনি ফ্রান্সে চলেযান ১৯১৪ সালে এবং ২৪শে এপ্রিল, ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯২৬ সাল থেকেই তিনি আশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষা। মার পরমার্থিক জ্ঞান, ভাবধারা এখন সুবিখ্যাত। তিনি বিশ্বজননী; ঋষি অরবিন্দের উত্তরসাধিকা, তার কথাই আলাদা, মানবী হয়েও তিনি দেবী।

আশ্রমের একটি সুদর্শন বাঙ্গালী যুবক ছাত্রের সহিত আমাদের বেশ আলাপ আলোচনা হয়েছিল দুদিন। সে শ্রী অরবিন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বেশ একটা মনোজ্ঞ নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছিল, "অরবিন্দ বাণী - " উদ্ধৃতি সহকারে। যতটা মনে আছে বলছি, হয়তো ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারলামনা, এজন্য আমি দুঃখিত।

'একদিকে কি এক অংশে যদি তুমি সত্যের প্রতি নিজেকে খুলে ধর, আবার অন্যদিকে শত্রুবলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখ তবে ভগবৎপ্রসাদ তোমার কাছে স্থায়ী হয়ে থাকবে—সে আশা করা বৃথা। যদি ভগবানকে জাগ্রতভাবে স্থাপন করতে চাও, তবে মনমন্দির শুদ্ধ রাখতে হবে। মহাশক্তি যতবার নেমে আসেন এবং সত্যকে এনে ধরেন, ততবার তুমি যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, যে মিথ্যাকে একবার বহিস্কৃত করা হয়েছে তাকে আবার ডেকে ঘরে তুলে নাও, তবে ভগবৎ প্রসাদকে নিস্ফল বলে দোষ দিতে পারনা, দোষ দিও তোমার নিজের সংকল্পের মিথ্যাচারকে—তোমার আত্মসমর্পণের অসম্পূর্ণতাকে। দূর কর এই মিথ্যা ধারণা যে ভগবান যে বিধি দিয়াছেন তুমি যদি তাহা পালন না কর, তবু যখন যেমন চাইবে ঠিক তেমনি সবকিছু তোমার ভাগবতী শক্তি করে দেবেন বা করতে বাধ্য। তোমার সমর্পনকে সত্য এবং সম্পুর্ণ কর তবেই আর সব তোমার জন্য করে দেওয়া হবে। তোমার সমর্পণ হবে স্বেচ্ছাকৃত ও স্বচ্ছন্দ, সজীব সত্বার সমর্পণ, জড় পুত্তলিকার অসহায় যন্ত্রের সমর্পণ নয়। এই খাঁটি ভাবমূলধারা যাহারা ধরতে পারে, রাখতে পারে, ব্যর্থতা ও বিপত্তির মধ্যে তাদের শ্রদ্ধা সর্ব্বদা অটল থাকে, আর শেষে তারাই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করবে সেই চরম বিজয়—সেই পরম চিন্ময় রুপান্তর। "গভীর চিন্তার কথা পরমাশ্চর্য্যময় এই সত্যশুদ্ধ" আত্মসমর্পণের ভাবধারা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবধারা ও মূলকথা একই।

২২। ত্রিচিনাপল্লী (+তানজোর)।

ভিল্লিপুরম হয়ে মাদ্রাজ—ত্রিভেন্দ্রাম একসপ্রেস যোগে আমরা

তিরুচিরাপল্লী (বা ত্রিচিনাপল্লী বা ত্রিচি) পৌঁছাই বেলা ১-৩০ মিনিটের সময়। মন্দিরময় ভারতবর্ষ, আর এত দেখে ও আমাদের মনমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এখনও হয়নি—শুধু ভাবি আর ভাবি।

মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকে আমরা সাধরণ ভাবে পবিত্র তীর্থ বলি তাই আমাদেব পুরী, হরিদ্বার, কেদার বদরী, দ্বারকা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী চিরপবিত্র। স্থাপত্য, বিরাটত্ব ও প্রাচীনত্বে আমাদের খাজুরাহো, দিলওয়ারা (মাউন্ট আবু), অজন্তা, ইলোরা এবং দক্ষিণভারতের মন্দিরগুলি—মন্দিরময় ভরতবর্ষের অনন্ত ঐশ্বর্য্য। ভারতের নদনদী' সাগর, গিরিপথ, পর্ব্বতমালা যুগ যুগ ধরে মানুষের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছে। মানুষের তীর্থ ও দেশভ্রমণের পিপাসা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে—দেশভ্রমণের অফুরন্ত আনন্দে, শুধু নয়নমনই সার্থক হয়না, অন্তরের প্রসারতা বাড়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং সর্ব্বোপরি, ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের আকাঙ্খা তীব্রতর হয়ে দেহ-মনের, দেশেরও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

দক্ষিণ ভারতের পুরাণ মন্দিরাদি দর্শনকালে "গাইড" বা অভিজ্ঞ প্রদর্শকের খুবই দরকার—অন্যথায় সব ভালকরে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। যদিও কিছু অতিরিক্ত খরচ আছে এজন্য তবু তাহা প্রয়োজনীয় বলে বাদ দেওয়া চলে না। আমরা ও এখানে একজন অভিজ্ঞ বেসরকারী লোকের সাহায্য পেয়েছিলাম, সৌভাগ্য বলতে হয়। আজকাল প্রতিদেশেই ভ্রমণ অনেক বেড়েছে। তাদের তৃষ্ণা মেটায় নানাপ্রকার বই ও পত্রপত্রিকা। কিন্তু যে নায়ক সাধারণতঃ পর্য্যটকদের পরম সহায় হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শনীয় বস্তু সব দেখতে সাহায্য করে ইতিহাসের কাহিনী সালঙ্কারে বর্ণনা করে, সে থাকে পাঠক সমাজের দৃষ্টির বাহিরে, অথচ তার চোখ দিয়েই আমরা সব প্রত্যক্ষ করি, নয়কি? গাইডের কাজ মোটেই সহজ নয়। শুধু দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়াও তার অনেক ক্ষমতা থাকা দরকার—তাকে অনর্গল কয়েকটী ভাষায় বলতে হয়। তাছাড়া

তাকে জানতে হয় ভিনদেশীয় লোকের মন জুগিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের কৌশল। সে সহজ মসৃনসুরে কথা কহিবে, মহিলাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবে, কোন ঐতিহাসিক ধ্বংসের সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার পূর্ব্বে তাদের সবাইকে ছায়াশীতল জায়গা খুঁজে দেবে বসবার জন্য, ক্যামেরাবাগীদের নির্দ্দেশ দেবে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ফটো তুললে তা সবচেয়ে ভাল হবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি। উপযুক্ত রস পরিবেশন করে গাইড যে ভ্রমণকে প্রাণবন্ত করতে পারে তা আগেই বলেছি। মাঝে মাঝে অবশ্য যাত্রীদের মধ্যেও রসের খোরাক মিলে। এমন একজন ভদ্রলোকের সহিত আমাদের পরিচয় হয়েছিল—এখানকার মন্দির প্রাঙ্গনে-রোগা লম্বা কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত পৌরুষ চোখেমুখে জাজ্জ্বল্যমান। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে গাইডের কথা শুনতে আগ্রহ তার বোধহয় ছিলনা কখনও। যারা অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখায়, ভ্রমণের আনন্দ যাতে একফোঁটা নষ্ট না হয় এমনি ভাবে, তাদের দেখে তার বেশ মৃদু আনন্দ বোধ হয়। আমরা ধরে নিয়াছিলাম—তিনি অকৃতদার, জীবনের স্বপ্ন চরিতার্থ করতে বেড়াতে আসেন নি-এসেছেন এরচেয়ে ভাল কাজ কিছু করবার নেই বলে। ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে গম্ভীর মুহুর্ত্তে আলগোছে এমন একটী মন্তব্য করত যাতে সবাই অসম্ভব হাসিতে ফেটে পড়ত। মন্দির দেখার পরে বিশ্রাম ও চা পানের সময় তাকে অনুরোধ করে আমাদের সঙ্গী করে নিয়েছিলাম অল্পসময়ের জন্য। ঐ সময়ে তিনি ভিজাগাপত্তনম্ (ওয়ালটেয়ার) শহরের বাজারে গিয়ে যে অতিসাধারণভাবে রস-সৃষ্টি করেছিলেন, তার একটুখানি নমুনা (যেমনটী শুনেছি) আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি। এক স্থানীয় আমওয়ালার সাথে ঝগড়া (?) বাঁধে প্রায়! আট আনায় পাঁচশো আম দেব বলে মাত্র তিনটী আম দিলে কেন নেবেন তিনি? দোকানী বলে, "বাবু, টাকায় এককিলো হলে আট আনায় পাঁচশো হবে না? ব্যাপার গুরুতর হবার পূর্ব্বেই দুএকজন লোকের সহিত হাঁসতে হাঁসতে তিনি সরে যান। সেখানে সবাই মাছ খায় না, দোকানে

ভীড় ও খুব কম ; দাম ততোধিক কম বলা চলে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাছ কত করে কিলো'—উত্তর দুটাকা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচ কিলো নিলে ? মাছওয়ালার জবাব, ঐ দুইটাকাই হবে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহাহলে পাঁচ কিলোই দাও। মাছওয়ালা তখন তার রসিকতা বুঝিতে পেরে প্রাণভরে হাসতে হাসতে তাকে সেলাম জানায়! যাক, আমাদের গাইডের কথা ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলাম—আমাদের "গাইড" বয়সে কাঁচা হলেও প্রতিদিন নানাশ্রেনীর বিভিন্ন বয়সের, নানা-জাতীয় স্ত্রীপুরুষের সংস্পর্শে এসে নবীন বয়সেই প্রবীণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সে কখনও তীব্রস্বরে তর্ক করে, আবার কখনও শিশুরমত হাসে—সরসতার মধ্যদিয়ে সব কাহিনী স্বচ্ছন্দে, সহজভাবে প্রকাশ করে, কয়েকটী ভাষার মাধ্যমে। এই চিত্র সহজে ভোলা যায় না। মনে হয় টুরিষ্টদের সঙ্গে এই দৈনিক ভ্রমণ সেও সমান-ভাবে উপভোগ করে। একই জায়গাতে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন জনগনের নিকট একই কথার প্রকাশে তার কোন বিরক্তি নেই, আছে সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও আনন্দোজ্জ্বল সকৌতুক দৃষ্টি। এই ধারণা আমার দৃঢ়তর হল তারপরদিন যখন শ্রীরঙ্গম মন্দিরগুলি ভালকরে দেখতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করি—যে কথাগুলি আমার কাণে বাসি হয়ে গিয়েছে, সে অক্লান্ত উদ্যমে, উৎসাহের সহিত তাই পরিবেশন করছে এক নূতন দলকে। বয়স ও কাল যেন তার প্রতি সদয় থাকে এই প্রার্থনা জানাই—পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে।

তিরুচিরাপল্লী একটি জিলা শহর—প্রায় নয় বর্গমাইল বিস্তৃত, লোকসংখ্যা তিনলক্ষ। এখানে শীতকাল স্বল্পস্থায়ী—জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাত্র। গ্রীষ্ম—মার্চ্চ এপ্রিল মে তিনমাস, আর বর্ষা-কালই বাকী সাতমাস—জুনমাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত। আমরাও নভেম্বর মাসে এখানে দুদিন কিছু কিছু বৃষ্টি পাই—যদিও তা মারাত্মক ধরণের ছিলনা। রাস্তাঘাট ভাল, বিমান বন্দর ও বৃহদায়তন রেলষ্টেসন আছে, বাসের সুবন্দোবস্ত আছে, আছে এক্সপ্রেস বাস, মাদ্রাজ, মাদুরাই, তানজোর, কয়েম্বাটুর, উটাকামণ্ড

প্রভৃতি স্থানে যাবার জন্য। দেশী বিদেশী ষ্টাইলের বহু হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, লজিং ও টুরিষ্ট বাংলো আছে। দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

১। রকফোর্ট (সকাল ৬ থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খোলা),

২। জম্বুকেশ্বর মন্দির (সকাল ৬—১১ এবং বৈকাল ৩—৮টা পর্য্যন্ত খোলা),

৩। থায়ুমানস্বামী মন্দির,

৪। শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির ও

৫। নথরশাহ মসজিদ।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অদূরবর্ত্তী শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যাই বাসে করে এবং বেশভালভাবে দর্শন করি সব। ভীড় খুব ছিল না তখন এবং একারণেই আমাদের খুব সুবিধা হয়েছিল। পরদিন প্রাতে যাই জম্বুকেশ্বর মন্দিরে প্রথমে পরে রকফোর্টে। পঞ্চায়তন মন্দির-গুলি সপ্তম শতাব্দীর চোল নৃপতিদের বৈভব প্রকাশে মুখর। রঙীন দেবদেবীর মূর্ত্তি (রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী) দেওয়ালে দেওয়ালে ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ ঐ জম্বুকেশ্বর মন্দিরে। রকফোর্ট পৌঁছুতে ৬৫০ সিঁড়ি পার হতে হয়—উপরথেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার আছে—এটাও চোল রাজাদের কীর্ত্তি -পরম রমনীয় ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্র—অবশ্য বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসকগণের দ্বারা বহুবার এই সৌধগুলির বিকৃতকরণ হয়েছে। রকফোর্টের পুরাণ কাহিনীগুলিও দেয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ আছে দেখলাম। একটা ছোট কাহিনী (যেমন শুনেছি গাইডের কাছে) আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে. অন্ততঃ গাইডের তাই বক্তব্য।

অনেকদিন আগে তানজোরে এক গরীব বৃদ্ধা বাস করত। তার একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয় তিরুচিরাপল্লীর এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে। ঐ গরীব বৃদ্ধা ছিল মহাদেবের পরম ভক্ত—দৈনিকপূজার্চ্চনা না করে তিনি কখনও জলগ্রহণ করতেন না। তখনকার দিনে

রাস্তাঘাট ছিল খুব খারাপ ও ভয়ঙ্কর। তানজোর থেকে তিরুচির পথ ৩২/৩৩ মাইল্ হলে ও তা বিপদসঙ্কুল ও খুব কষ্টসাধ্য ছিল। মেয়ে সন্তান সম্ভবা হলেও মা আসতে না পারায় মা ও মেয়ে দুজনেই মনে মনে খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হয়। বৃদ্ধা মা প্রত্যহ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করতেন মেয়ের মঙ্গলের জন্য ও সানন্দে তার সন্তানকে কোলে তুলে নিবার জন্য। যথাকালে ভক্তাধীন মহাদের বৃদ্ধা মাতার রূপ ধারণ করে—ত্রিচিনাপল্লীতে তার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন, প্রসবান্তে শুশ্রুষা করে মা ও নবজাত শিশুটিকে সুস্থ করে তোলেন এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত যথাযোগ্য আদর যত্ন করে সবাইর সুখ ও আনন্দের কারণ হন। এযে গর্ভধারিনী মাতা নয়, তা কেহই বুঝতে পারেনা। অবশেষে তার মাতা যখন সত্যই বহুকষ্ট করে দৌহিত্রের অন্নপ্রাসনের সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সবাই অবাক, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। ভক্তাধীন ভগবান তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করে সব ব্যক্ত করেন এবং নানা উপদেশ দানান্তে অন্তর্ধান হন। বৃদ্ধামাতা আনন্দের আতিশয্যে স্তব করতে করতে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। এই ত্রিচিনাপল্লীতেই এ ঘটনা ঘটে এবং সবাই তা জানে। আরো বহু কিম্বদন্তী আছে এখানে যা খুবই প্রচলিত। এখানে কার্ত্তিক ঠাকুরের দুই স্ত্রী আছে মন্দিরে, গণেশ ঠাকুরের ও তাই।

বাসে করে তানজোর যাই (বর্ত্তমান নাম থানাজাউর)—৩২/৩৩ মাইল যেতে সময় লাগে ২॥০ ঘণ্টা। ট্রেনে ও যাওয়া যায়। টিকেট জনপ্রতি ১·১০ পয়সা—সেখানে রিকসা করে (ভাড়া ৪·৫০ প.) সবদেখে বেড়াই। এই শহরের আয়তন প্রায় ১০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এস্থান মাত্র ২০০′-০০″ ফুট উচু। ত্রিচিনাপল্লীর মত এখানে ও বর্ষাকাল চলে সাতমাস, গ্রীষ্মকাল তিনমাস এবং শীতকাল মাত্র দুমাস। মাদ্রাজ ষ্টেট ট্রানসপোর্টের বাস নিয়মিতভাবে মাদ্রাজ থেকে এখানে, তিরুভায়ার, কুম্বাকোনাস, চিদাম্বরম, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই,

ভেল্লোর, কোটাল্লাম, প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করছে। বহু হোটেল, লজিং, রেষ্টুরেন্ট, টুরিষ্ট বাংলো, 'রেষ্টহাউস্ আছে এখানে। গান্ধী রোডস্থ সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রে নানাপ্রকার মনোলোভা দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় - বাদ্যযন্ত্র যথা, বীণা, তাম্বুরা, মৃদঙ্গম্, পিতল্ল ও তাম্রনির্ম্মিত ছোটবড় বাসনপত্র, নারিকেল মালার তৈরী খেলনা ও বিবিধ সামগ্রী, পেপার মেসির তৈরী পুতুল ও খেলনা, ইত্যাদি। দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ—

১। বৃহদেশ্বর মন্দির (সকালে ৮-১১ টা, বৈকালে ৪/৩০ থেকে ৮/৩০ পর্য্যন্ত খোলা, হিন্দুরা বিশেষ পোষাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। মন্দিরটা সত্যই বৃহৎ, উচ্চতায় ২১৬'-০," শিবমূর্ত্তির উচ্চতা ১৩'-০" আর বাহন ষাড়ের উচ্চতা ১২-০"ফুট),

২। কামাক্ষিয়াম্মান মন্দির,

৩। রাজপ্রসাদ (ফোর্ট)—ভিতরের আর্টগ্যালারীটী বিখ্যাত ও প্রসংশার যোগ্য। এখানে একটী অতি বিরাট তিমি-মাছের পঞ্জরাস্থি আছে—পরিমাপ লম্বায় ৯২'-০"= মাদ্রাজ মিউজিয়ামের তিমিমাছের চেয়ে ৬'-০" বেশী লম্বা=বাণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গোপুরম্ সত্যি মনোরম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ও তদানীন্তন কালের শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করে!

৪। সরস্বতী মহল লাইব্রেরী, (বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে)—বিরাট গ্রন্থাগার, এখানে বহু হস্তলিখিত বিভিন্ন ভাষারও বিভিন্ন বিষয়ে অতি প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত আছে।

৫। সঙ্গীত মহল—উপরের তলায় ন্যানাবিধ খেলনা ও দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ের জন্য একটী সুদৃশ্য বিপণি বর্ত্তমান।

২৩। রামেশ্বরম্।

আমরা ত্রিচিনাপল্লী ফিরে তাঞ্জোর থেকে রাত্রি ৯/৩০

মিনিটে এবং সেই রাত্রেই রামেশ্বরম রওনা দেই রেলে চড়ে প্রায় ১২/৪৫ মিমিটের সময়ে। প্রাতে মনমাত্থরাই ষ্টেসনে পৌঁছবার প্রাক্কালে ভাইকাং নদীর উপর সুবৃহৎ রেলসেতু পার হয়ে যাই। রামেশ্বরম যাবার পথটি ও বড় সুন্দর। মনোহর তালতমালকুঞ্জ, নারিকেল বীথি ও মনোরম পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগায় মনে। পথের বিখ্যাত পাম্বাম সেতুটী প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ (১১৮ টী স্তম্ভ আছে, পুল অতিক্রম করতে সময় লাগে ৮/৯ মিঃ) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহা পুনরায় নূতন করে নির্ম্মিত হয়েছে সেই ভীষণ ঝড়ের পরে। আমরা রামেশ্বরে পৌঁছাই বেলা ১০/১৫ মিনিটে। ষ্টেসনেই স্নানাদি সেরে সরাসরি মন্দিরে যাই গাড়ীকরে—নারিকেল ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে পূজা দেই—মন্দিরে শিব ও পার্ব্বতী দর্শন করি। পরে যাই রামঝড়কা (গন্ধমাদন পর্ব্বতম); ইংরেজী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা উত্তমরূপে সরকারী তত্ত্বাবধানে মেরামত হয়। রামঝড়কার উপর থেকে চারিদিকে সাগরের দৃশ্য সত্যই রোমাঞ্চকর, অতুলনীয়। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য বোধ হয় আর কোথাও প্রত্যক্ষ হয়না। এতদঞ্চলে নারিকেল উৎপন্ন হয় প্রচুর—কিন্তু সে অনুপাতে দাম কম নয়। আমরা রামেশ্বরে ডাব নারিকেল কিনি প্রতিটি ৪০ পঃ হিসাবে। ষ্টেসনে ও বাজারে নানাধরণের মালা (বিশেষ করে যাত্রীদের জন্য) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করে ফেরীওয়ালারা। আমরা বেশ কিছু গস্ত করি এখান থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনের জন্য। বহু পাঠা-ছাগল (চলতিকথায় আড়ু) চড়ছে রাস্তার দুধারে। খবরাখবর করে জানলাম যে অতিরিক্ত নোনাজলের জন্য এখানে কোন শব্জী উৎপন্ন হয়না। মৎস্য শিকার, শুটকি চালান, ও নারিকেল উৎপাদন এবং ব্যবসাই এখানকার রপ্তানী বানিজ্যের একমাত্র লক্ষ্য—এবং আয় ও প্রচুর। সাধারণতঃ এখানকার লোকেরা পাদুকা ব্যবহার করেনা। ছেলেমেয়েদের স্কুল আছে এখানে কিন্তু কলেজ সাত মাইল দূরে পাম্বামে—শুধু ছেলেদের জন্য। দারজিলিং এ পাহাড়ীদের একটা প্রবাদ আছে যে সেখানে রৌদ্র ও স্ত্রীকে কখনও

বিশ্বাস করতে নেই কারণ কখন যে সে আছে আর কখন নেই তা বোঝা কঠিন! এখানেও প্রায় তেমনি, কখন যে রোদ আর কখন বৃষ্টি, তার কোন ঠিকানা নেই।

রৌদ্র ও বৃষ্টির যেন লুকোচুরি খেলা—
ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কান্না, নেই কোন জ্বালা।

পুণ্যক্ষেত্র রামেশ্বর পুরাণে বর্ণিত চারিধামের অন্যতম। ইহার মহিমা অপার—কিম্বদন্তী ও অনেক। রামায়ণে বর্ণিত সেতুবন্ধ অনতিদূরে—বানর সৈন্য সহযোগিতায় যে সেতু তৈরী করে শ্রীরাম গিয়েছিলেন লঙ্কায় জানকীর উদ্ধারমানসে। বেশ কিছুদিন পরে আমরা এখানে একজন কেরলবাসীর হোটেলে মৎস্য সহযোগে রসনার তৃপ্তিসাধনে তৎপর হই (ডাল, ভাজা, তরকারী ছাড়া মাছই তিনরকম, তদুপরি দধি)। দক্ষিণা তেমন বেশী কিছু নয়—জনপ্রতি ২৲ টাকা মাত্র। ফলের ভিতরে কলা ও মোসাম্বির অপেক্ষাকৃত সস্তা। রামেশ্বর মাদ্রাজের ভিতরে রামনাথপুরম জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত তীর্থস্থান—তীর্থরাজ বলে অনেকে। স্থানীয় অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ ময়লা, রোদে ঝলসানো কাল রংই বেশী। মহিলারা ঘাঘরা ও শাড়ী উভয়ই ব্যবহার করে। তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে নানা-ভাবে এরা অর্থোপার্জ্জন করে, শুনলাম, এখানে একটী ছবিঘর ও আছে। চারিধারে শুধু ধু-ধু প্রান্তর—বালুময়। অবশ্য বাহিরে রুক্ষ ও শুকনো হইলেও অন্তরে নিশ্চয়ই রসসিক্ত; নইলে এত রসাল নারিকেল আসে কোথা থেকে ? ত্রিভেন্দ্রাম একসপ্রেস যোগে আমরা মাদুরাই রওনা হই বৈকাল ৩/০৫ মিনিটে। পুনরায় পাম্বাম্ সেতু পার হয়ে মণ্ডপম্ ষ্টেসনে যথারীতি গাড়ীর ইঞ্জিন বদল করে আমরা মাদুরাই পৌছাই রাত্রি ৮/৩০ মিনিটের সময়।

২৪। মাদুরাই।

দাক্ষিণাত্যে মাদুরাই একটি অতি প্রাচীন বিখ্যাত শহর। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে নয়বর্গমাইল, ও ৪,৫০,০০০

হাজার।* সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এই স্থান প্রায় ৪০০'-০" উচ্চ। এখানে বিমান বন্দর আছে, বহু যাত্রী দৈনিক বিমানে যাতায়াত করে মাদ্রাজ, ত্রিভেন্দ্রাম, ত্রিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি শহরে। সরকারী বাস এখান থেকে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে মাদ্রাজ, ত্রিচিনাপল্লী, কুমীলি (পেরিয়ার সংরক্ষিত বনভূমি), কোদাইকানাল, ভৈগাইড্যাম, উটাকামণ্ড, তানজোর, টিউটোকোরিন, নাগেরকোল, মণ্ডপম (রামেশ্বর), পুডুকোট্টাই ইত্যাদি স্থানে। প্রতি শনি ও রবিবারে মাদ্রাজ সরকারী টুরিষ্ট বাংলো থেকে যাত্রীদের বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যাবার বন্দোবস্ত করা হয়। বহু হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, লজিং, টুরিষ্ট বাংলো (কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের), রেষ্ট হাউস, এবং ধর্ম্মশালা আছে এখানে। দর্শনীয় মন্দির ও অন্যান্য জিনিষের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিখ্যাত :—

১। মীনাক্ষি মন্দির (৮ কিঃ মিঃ), হিন্দুরা বিশেষ পরিচ্ছদ পরিধান করে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন।

২। আলাগোরকোল, (২১ কিঃ মিঃ),

৩। গান্ধীগ্রাম (৫১ কিঃ মিঃ)—গ্রামোন্নয়ন বিভাগীয় কেন্দ্র,

৪। পেরিয়ার (১৩৮ কিঃ মিঃ)—সংরক্ষিত বনভূমি,

৫। কোদাইক্যানেল (১১৫ কিঃ মিঃ),

৬। ভৈগাইড্যাম (৬৭ কিঃ মিঃ),

৭। কোর্টাল্লাম (১৬৩ কিঃ মিঃ)—বিখ্যাত জলপ্রপাত,

৮। সুন্দরেশ্বর মন্দির,

৯। রাজপ্রাসাদ (বর্ত্তমানে আদালত গৃহ), ইত্যাদি।

মীনাক্ষি মন্দিরের সন্নিকটে "সরস্বতী লজের" অস্থায়ী বাসা ঠিক করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তিনতলার উপরে ঘরগুলি বেশ ভালই, দৈনিক ভাড়া কামরা প্রতি ৮৲ টাকা (পৃথক বাথরুম সহ)। বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির ও সুন্দরেশ্বর মন্দির দর্শন করি পরদিন প্রাতে—স্নানান্তে ধুতিপরে, খালি গায়ে। পাঁচটী বড় বড় মন্দির, সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে কোটি কোটি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী রঙিন ভাস্কর্য্যে দেখে শেষকরা যায়না যেন। এগারতলা বিশিষ্ট চারিটি

প্রধান ফটক ও চারিদিকের অদ্ভুত গড়ন ও ভাস্কর্য্য ও তেমনি। পূজার জন্য টিকেট কিনে উপকরণাদি সহ ভিতরে ঢুকতে হয়। সুন্দরেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও অপরটিতে দেবী মীনাক্ষি—অতিমূল্যবান নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ পাথরের তৈরী—দেবীর নাকের গহণা অতীব উজ্জ্বলহয়ে শোভা পাচ্ছে। পাণ্ডাদের কোন অত্যাচার নেই. তবে গাইডের দৌরাত্য কিছুটা আছে; এটা বোধ হয় তাদের উদরজ্বালার জন্যই। মীনাক্ষি মন্দিরের সম্মুখভাগে বৃহদাকার শ্বেতকায় বৃষটি ও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সঙ্গত কারণেই। এবার রাজপ্রাসাদ (পালানা) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে মাদুরাই পর্ব্ব শেষ করব। এই সৌধটি তৈরী হয় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপ্রসাদ হিসাবে, কিন্তু এখন রামানাথপুরম ও মাদুরাই এই দুটি জিলা আদালত বসে এখানে। দালানের সম্মুখভাগে বিরাট বিরাট গোল স্তম্ভগুলি সাধারণতঃ বিস্ময় উৎপদান করে। শুনেছি তখনকার দিনে বিলাতী মাটি (সিমেন্ট) ছিলনা, কিন্তু সুপারীর রস, গুড়, চূণ, মাটি ও ডিম সহযোগে যাহা তৈরী হত তা সিমেন্টের চেয়ে অনেক ভাল ছিল—প্রমাণ এই বিরাট স্তম্ভগুলি। দালানের ভিতরে ও বাহিরের দিকের চিত্রগুলি ও রমনীয়। ত্রিভেন্দ্রাম একপ্রেস যোগে মাদুরাই থেকে রাত্রি ৮/৫০ মিনিটে রওনা হই ত্রিভেন্দ্রাম অভিমুখে।

২৫। ত্রিভেন্দ্রাম।

মাদুরাই থেকে ত্রিভেন্দ্রাম আসবার পথে রেলপথের অভিজ্ঞতা ও উল্লেখযোগ্য। রাত্রে একপশলা বৃষ্টির পরে প্রাতঃকালটী প্রথমে মধুর ও মনোরম বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই ভোর হওয়ার সাথে এখানে—ওখানে টুকরা টুকরা মেঘের অংশগুলি একত্রিত হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। অন্ধকারে ঢেকে গেল সব—প্রায় ৬।৩০ মিনিটের সময় সুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টীর পর বৃষ্টি, প্রথমে টিপ-টিপ, পরে ঝম্-ঝম্—সঙ্গে তেমনি বাতাস। প্রলয়কান্তের পূর্ব্বাভাষ আর কি! সৌভাগ্যের কথা, এই বর্ষা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি আমাদের গাড়ীর পথে। প্রায় একঘণ্টা পরেই বর্ষণ স্নাত রেলপথের উপরে রৌদ্রকরোজ্জল স্নিগ্ধতা প্রকাশ পায়—অপূর্ব্ব সুন্দর প্রাকৃতিক

সমারোহ রাস্তার দুই ধারের শস্যশ্যামল মাঠে। মৌসুমীবায়ু সুসময়ে বহিলেই হয় সুবৃষ্টি—নতুবা হয় অতিবৃষ্টি, না হয়, অনাবৃষ্টি। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টী বা অনাবৃষ্টী, উভয়ই অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইস্থানে সাধারণতঃ জুন থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল—বর্ষার পরিমাণ মোটামুটি ৭০″ ইঞ্চি। আমরা সকাল দশঘটিকার সময়ে ত্রিভেন্দ্রাম পৌঁছাই এবং সেণ্ট্রাল ষ্টেসনের নিকটেই "গ্রাণ্ড উদিপি লজে" (থাম্পাপুর), ত্রিভেন্দ্রাম—১৪, কামরা ভাড়া করি, (প্রতিকামরা পৃথক বাথরুমসহ ৮্ টাকা)। "ভোজনম্ যত্রতত্র" এটাই সাব্যস্ত হল, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। অবশ্য বেশীরভাগ সময়েই আমরা এখানেই আহার্য্য গ্রহণ করেছি (ছোটবড় সব)। গরম জলে স্নানাদি সমাপন করে ট্যাকসি করে আমরা প্রথমে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত "কোবালম বীচ" যাই এবং পরে সন্ধ্যারতির সময়ে পদ্মনাভ-স্বামী মন্দির দর্শনান্তে বাড়ী ফিরি।

ত্রিভেন্দ্রাম কেরালা রাজ্যের রাজধানী এবং একটি আধুনিক বড় শহর। শ্রী নাম্বুদ্রিপাদের সফল পরিচালনায় এখানে শিক্ষিতের হার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আর সাম্যবাদ নাড়া দিয়েছে সারা দেশে—সমগ্র ভারতবর্ষকে—যার ভবিষ্যৎ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। ত্রিভেন্দ্রাম কথাটির অর্থ হল ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র বাসস্থান। ইহার আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২৯ বর্গমাইল এবং সাড়ে তিনলক্ষ। এখানে শীত বড় নেই, বারমাসই সূতী জামাকাপড় ব্যবহার করা চলে। ইংরেজী ছাড়া তামিল ও মালয়ালাম ভাষার চলনই বেশী; মুষ্টীমেয় লোক হিন্দীও জানে। এই শহরটি বিমান, রেল ও বাসের সর্ব্বসুবিধাযুক্ত—এখান থেকে নিয়মিত ভাবে দক্ষিণভারতের প্রায় সমস্ত শহরগুলিতে দৈনিক বাস যাতায়াত করে। পৃথক সরকারী দ্রুতগামী বাস যায় দৈনিক—এর্ণাকুলাম, কন্যাকুমারী, ত্রিচুর প্রভৃতি বড় বড় শহরে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য। সিটি বাস স্টাণ্ড থেকে ১।৩০ পঃ করে "বাসে অবাধ ভ্রমণ টিকেট" কিনে সারাদিন শহরের বিভিন্ন স্থানে মজা করে বেড়ান যায়। অন্যান্য বড় বড় রাজধানী শহরের

ন্যায় এখানেও বহু ছোটবড় হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, লজিং, টুরিষ্ট হোম, রেষ্ট হাউস ও ধর্মশালা আছে। ধর্ম্মোপাসনার জন্য এখানে মন্দির মসজিদ ছাড়াও অন্ততঃ আটটি গির্জ্জা আছে। আছে নয়টি সিনেমা হাউস—তন্মধ্যে "শ্রীকুমার থিয়েটার হাউসে" ইংরেজী ভিন্ন অন্যছবি দেখান হয়না। রাজ্য টুরিষ্ট ইনফরমেশন আফিস, শান্তিনগর, গভর্ণমেণ্ট প্রেস রোড, ত্রিভেন্দ্রাম —১ হইতে যাবতীয় সাহায্য ও সুপরামর্শ দেওয়া হয় যাত্রীদের। নানবিধ হাতীর দাঁতের তৈরী দ্রব্যাদি ও হস্তশিল্পের সামগ্রীর জন্য কেরল বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলিই প্রধান ঃ—

১। পদ্মনাথস্বামী মন্দির—নির্দিষ্ট সময়ে ৪ বার খোলা হয়।

২। মিউজিয়াম—সম্পূর্ণ বন্ধ সোমবার ও প্রথমার্দ্ধ বন্ধ থাকে বুধবার।

৩। চিড়িয়াখানা—দর্শনী জনপ্রতি ১৫ পয়সা।

৪। শ্রী-চিত্র আর্টগ্যালারী—সোমবার পূর্ণ ও বুধবার প্রথমার্দ্ধ বন্ধ থাকে।

৫। একোয়ারিয়াম—দর্শনী জনপ্রতি ১০ পয়সা।

৬। কোবালম বীচ (৮ মাইল) এবং

৭। কেপ কমরিন (কন্যাকুমারিকা) ৫৩ মাইল।

এছাড়াও আছে বিরাট রাবার ফ্যাক্টরী অবজারভেটরী ও কাভাদিয়ার রাজপ্রাসাদ—আর, আর্ট স্কুল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কল্লিকড ড্যাম ও বাগ (১৯ মাইল)। প্রথমোক্ত তিনটী স্থানে প্রবেশপত্র ব্যাতিরেকে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কোভালম বীচের সৌন্দর্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই লাইনবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জলের পাশে, কোথাও ঢালু বেলাভূমিতে স্নান করে অপার আনন্দ ও মজা লুটছে কয়েকটী যাত্রী (পুরুষ ও স্ত্রীলোক)—আর এক ইউরোপীয়ান দম্পতি। প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা এরা, দেহসম্পদেও তাই। পথিকের কুটীল দৃষ্টিতে তাদের নেই কোন ভ্রুক্ষেপ। সীমাহীন সমুদ্রের পারে বসে নানা-কথা ভাবতে ভাবতে ডাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার কথা

মনে পড়ে গেল "বংশের না হউক, প্রতিটি মানুষের একটা জন্মসত্ত্ব ও দায়িত্ব আছে। শুচিবাই একটা ব্যাধি, কিন্তু শুচিতা মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের অন্যতম পরিচয়। জন্তু ময়লা মেখে থাকে—তাতে তার ক্ষতি হয়না, মানুষের কিন্তু চর্ম্মরোগ জন্মায়। যে মানুষ নোংরা (দেহ ও মনে) সে নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে নীচ। জীবের মধ্যে মানুষই সবচেয়ে মাথা উচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়; মাথা নীচু হলে তার অমর্য্যাদা হয়। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটা একটা সূতোর আকর্ষণ নয়—দুটো সূতোকে একসঙ্গে পাঁকিয়ে নিয়ে আকর্ষণটা সম্পূর্ণ হয়। একটা আকর্ষণ দেহের, অপরটা মনের। দুটোই একসঙ্গে জড়িয়ে শক্ত হয়ে যখন টানে তখনই সে টান সত্যিকারের টান। দেহের আকর্ষন মানুষকে অহরহ টানে। যুবকদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নারীদেহ-কামনা কাঁদে—প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গ কাঁদে। মধ্যে মধ্যে সে কান্না দুর্ব্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু দেহ ও মন এই দুই দিয়ে একটি মেয়ের দেহ ও মন কামনা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। "কাহার মনে কখন কি ভাবের উদয় হয়, বোঝা কঠিন। কোন কোন মহিলা প্রায় ব্রহ্মদেশীয় লোকের ন্যায় উর্দ্ধাঙ্গে কাঁচুলি ও নিম্নাঙ্গে লুঙ্গীর মত পোষাক পরিধান করে সূর্য্যাস্ত দেখতে এসেছে কোবালম বীচে। দেশী ও বিদেশী স্ত্রীপুরুষের জলক্রীড়া ও তাদের অবিন্যস্ত সামান্যতম বেশবাস এবং আরব্য উপন্যাসের মত আরব সাগরতীরে স-সাথী লাস্যময়ী ললনাবৃন্দ দেখেই বোধকরি ডাঃ তারাশঙ্করের মনে ঐ রকম ভাবের আলোড়ন উঠেছিল। যাই হোক, আমরা সূর্য্যাস্তের পরম রমনীয় শোভা সন্দর্শনে পরম পুলকিত বোধ করি—অপরূপ রং-এর খেলা, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। সাগর সৈকতে নানা জাতীয় লোকের নানাজাতীয় পোষাক, বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রুচি, দিনের শেষে সুদূর দিগন্তে রকমারি রংএর লুকোচুরি—সব মিলে একটা অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব রোমাঞ্চের শিহরণ জাগায় দেহ-মন-প্রাণে।

বিখ্যাত পদ্মনাভ মন্দিরাভ্যন্তরে ভক্ত হিন্দুসন্তান মাত্রই দেশীয় প্রথামতে ধুতি পরিহিত হয়ে শুদ্ধচিত্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রবেশাধিকার

পেতে পারে। এখানে ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি বিরাজমান। তিনটী বিভিন্ন দরজা থেকে বিরাট মূর্ত্তির তিনটি অংশ দ্রষ্টব্য ; যেকোন একটি দরজা দিয়ে ঐ বিরাট দেবমূর্ত্তির সবটা দেখা যায় না। এই প্রাচীন মন্দিরটী প্রায় ৯৫৭ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়—মন্দিরের বিভিন্ন মহল (বা গোপুরম্) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিভূষিত হয়েছে। ইহার অভ্যন্তরে শ্রীগণেশ, সাক্ষীগোপাল ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের বর্ত্তমান মালিক মহারাজা বলরাম ব্রহ্ম, তিনি বংশের সনাতন প্রথানুযায়ী প্রত্যহ বিগ্রহ দর্শনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গ্রাণ্ড উদিপি লজে প্রাতরাশ সমাপন করে কন্যা কুমারী রওনা হই ডিলুকস্ বাসের সংরক্ষিত আসনে চেপে। পথের মনোহর দৃশ্যের কথা ভোলবার নয়—পরে বলছি।

২৬। কন্যাকুমারী (কেপ কমরিণ)।

ডিলুকস্ বাসে কন্যাকুমারী পৌঁছাই সকাল ১০ টার সময়ে। রৌদ্র খাঁ-খাঁ করছিল, সমুদ্রগর্জ্জন বেশ খানিকটা দূর থেকেই শুনছিলাম। তিনটী সাগরের মিলনস্থান এই পুণ্যক্ষেত্র—পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর। এরকমটি আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা যেমন অপূর্ব্ব, আর তেমনি ঐশীশক্তি দোলা দেয় মনে আপনা থেকেই—কুভাবের অভাব এখানে। তিনটী সাগরের বালুর রং এবং আকারও নাকি বিভিন্ন—অবশ্য এবিষয়ে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা গান্ধীঘাট ক্যাম্প কটেজ নং ২।৮ ভাড়া নেই, প্রতিদিন ৫ টাকা হিসাবে। কটেজটি বেশ বড়, রান্নাঘর, বাথরুম, বিরাট শয়নঘর, ও ভিতরে-বাহিরে দুদিকে মস্তবড় বারান্দা। বৃহৎ আকৃতির পালঙ্কগুলি ছাড়া, টেবিল, চেয়ার, আলনা, বিজলী-বাতি, পাখা সহ বহু আসবাব পত্র আছে সেখানে। কন্যাকুমারী মন্দির ও গান্ধীঘাটের মাঝখানে একেবারে সাগরের উপরে এই অতি চমৎকার বাসস্থান পেয়ে আমরা সত্যই আনন্দিত।

কন্যাকুমারীর প্রাকৃতিক শোভার অপরূপ সম্পদ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না, আর বললেও সব যেন বলা হয়না। দেবস্থানমের "মীনাক্ষী ভবন" হোটেলে দ্বিপ্রহরের ভোজন শেষকরে গান্ধী স্মারক মন্দিরে যাই। সমুদ্র সৈকতে একতলা, দোতলা ও তিনতলা থেকে চারিদিকে সীমাহীন সমুদ্রের দৃশ্য অপূর্ব্ব সন্দেহ নেই। এখানে বসে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দুইই পরম রমণীয় ও সত্যই উপভোগ্য। প্রত্যহ হাজার হাজার নরনারী এখানে এসে সাগর সঙ্গমে স্নান করে অক্ষয় পূণ্য অর্জ্জন করেন—কথিত আছে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের ন্যায় এখানেও একবার স্নান করলে অক্ষয় পুণ্যার্জ্জন হয়—সকল পাপ মোচন হয় এবং তার আর পুনর্জন্ম হয়না।

স্থলপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে নাকি এই কন্যাকুমারীর মন্দির বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ আছে এবং অনেক কিম্বদন্তীও আছে এই মন্দির বিষয়ে। সবগুলি কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে মিল খায়না। বেশী প্রচলিত কিম্বদন্তী ২/৩টী আমি এখানে বর্ণনা করছি।

১। ভরতোপাখ্যানম্। পুরাকালের ভরত রাজার দেশ এই ভারতবর্ষ বা ভারত। তার ছিল ৮টী পুত্র ও একটি কন্যা। কন্যার নাম কুমারী। অনেকদিন রাজত্ব করার পরে তিনি তার বিরাট রাজত্ব নয়ভাগ করে এক একটি ভাগ পুত্রকন্যাদের বন্টন করে দিয়ে বৃদ্ধবয়সে তপস্যায় রত হন। একেবারে দক্ষিণের অংশ পড়ে রাজকন্যা কুমারীর ভাগে। ঐ সময় হতেই এই স্থানের নামকরণ হয় "কুমারী"। দেবী পরাশক্তি এখানে তপস্যা করতে আসেন—এমন মনোরম স্থান আর কোথায়, যেখানে মহামহিমময় ভারত মহাসাগর দক্ষিণে বিরাজমান, আর তার বাহুদ্বয় রূপে আছে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিশাল বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর! ভগবান পরশুরাম পরে পরাশক্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই কন্যা-কুমারীতে। বর্ত্তমান মন্দিরটী অবশ্য পরবর্ত্তী কালে ত্রিবাঙ্কুরের পাণ্ডা বংশীয় মহারাজাদের দ্বারা তৈরী ও বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত ও সুশোভিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে।

২। স্থলপুরাণম্ (স্কন্দপুরানম্)—কিম্বদন্তী বা পুরাণের কাহিনী যতটা মনে আছে লিখছি, ভুলত্রুটি—অসাবধানতা বশতঃ থাকতেও পারে। কন্যাকুমারী মন্দিরের উল্লেখ আছে স্থলপুরাণে, কেহ কেহ বলেন স্কন্দপুরাণে। ঈশ্বরদর্শন ও তাঁর মহিমা প্রচারের জন্যই পুরাণশাস্ত্র গ্রন্থগুলি প্রকাশিত—ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে।

একদা অসুরগণ স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল অধিকার করে সুরদিগকে (দেবতাদের) মহাবিপদে ফেলেছিল। অসত্য ও অধর্ম্মের জয়, মাতৃজাতির অবমাননা, অশান্তি ও অরাজকতা প্রবলরূপ ধারণ করল। অসুররাজ বাণাসুর বহু তপস্যা করে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এবং দেবতাদের বরপ্রভাবে অন্যায় কাজ করেও অনায়াসে রাজত্ব করতে লাগল। মুনি ঋষিদের নির্য্যাতন, মন্দিরাদি ধ্বংস, কপট-মিথ্যাচার, বিলাস-ব্যাসন ও পাপাসক্তি তাকে দ্রুততালে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল। মাতা বসুমতী আর সহ্য করতে না পেরে ভগবান বিষ্ণুর নিকট সবিস্তারে সকলকথা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে একমাত্র দেবী পরাশক্তিই বাণাসুরকে সংহার করতে পারেন এবং কি ভাবে দেবতারা তাকে স্তবে বশীভূত করে ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করতে পারেন, তাহাও প্রকাশ করলেন। দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর কথিত মত সমুদয় কাজ করে দেবী পরাশক্তির কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হলেন। তিনি কুমারীরূপে কুমারীতে উপস্থিত হয়ে তপস্যায় রত হলেন। অনতিবিলম্বে অনতিদূরে অবস্থিত সূচীন্দ্রম মন্দিরের দেবাদিদেব শিবজীর সঙ্গে তার বিবাহ সুস্থির হল। দেবতারা প্রমাদ গণলেন কারণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট তারা শুনেছিলেন যে কুমারীরূপেই মাত্র দেবী বাণাসুরকে বধ করতে পারবেন। তারা তীক্ষ্ণধী নারদঋষির শরণাপন্ন হয়ে তার সাহায্য ভিক্ষা করেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও দেবতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি কার্য্যে ব্রতী হয়ে আপন মনে সব ঠিক করে সূচীন্দ্রম চলে যান। এদিকে নির্দ্দিষ্ট তারিখের শুভসময়ে দেবী কুমারী ও দেবাদিদেব মহাদেব বিবাহাদি

কার্য্যের সব ব্যবস্থা স্থির করে রাখেন। যৌতুকাদির মধ্যে ছিল. শিরা-উপশিরা বিহীন পানপাতা, গিঠছাড়া ইক্ষু, বোটাবিহীন আম. চোখছাড়া নারিকেল ইত্যাদি। অন্যান্য দেব দেবীরা অন্তরীক্ষ থেকে এসব প্রস্তুতি ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলোকন করছিলেন গোপনে। নির্দ্দিষ্ট শুভমূহুর্ত্তের বহু পূর্ব্বেই "শিবজী" রওনা হয়ে পড়েন—যেন কোনমতেই কালবিলম্ব না হয়। কিন্তু নারদমুনির ভেল্কীবাজীতে তিনি ভুলকরে—আপন আশ্রমে সুচীন্দ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদিও নারদমুনি পৃথক পৃথক ভাবে দেবী কুমারী ও দেবাদিদেবের সাথে দেখা করে তাহাদিগকে অভিনন্দন জানান, তিনি কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে ভাবেই হোক এ বিবাহ তিনি পণ্ড করবেন। তাই মহেশ্বর যখন বরসাজে সুচীন্দ্রম, থেকে ভজুক্কামপরৈ (তিনমাইল দূর) পর্য্যন্ত এসেছেন তখন নারদঋষি বন্যকুক্কুটরূপ ধারণ করে ধ্বনি করতে লাগলেন যেমন মোরগে ডাকে রাত্রিশেষে প্রভাতকালে। বিবাহের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল শুক্লপক্ষের রাত্রি দ্বিপ্রহরে এবং প্রভাতকালীন কুক্কুটধ্বনি শ্রবণ করে শেষযাম উর্ত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে মনে করে আশাহত মহেশ্বর সূচীন্দ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবী কুমারী ও বহুক্ষণ অপেক্ষা করে পরে বুঝতে পারলেন যে এবিবাহ সংঘটনে বাধা আছে এবং তিনি চিরকাল কুমারী থাকবেন বলে মনস্থির করলেন। ভোজ্য-দ্রব্যাদি যাহা আনন্দোৎসবের জন্য তৈরী ছিল তাহা বালু ও ঝিনুক-খণ্ডে পরিণত হয়ে গেল এবং সেগুলি কুমারীকার একাদশ পবিত্র ঘাটের জলে ফেলে দেওয়া হল। ঐ পবিত্রঘাটগুলির নাম, চক্র, সাবিত্রী, গায়ত্রী, কালয়. বানী, গণপতি, কন্নিকে, তরণী, পিতুর, ব্রহ্ম এবং চিলয়। একারণেই বোধ হয় সমুদ্রের বেলা ভূমিতে এখনও রঙীন বালুরাশি ও চালের মত ছোট ছোট পাথরকুচি পাওয়া যায়।

এদিকে বাণাসুর কুমারীর রূপের খ্যাতি শ্রবণ করে সেখানে এসে দর্শনমাত্র বিমোহিত হয়ে পড়ল। তার বিবাহের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করামাত্র বানাসুর বলপূর্ব্বক তাকে

গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করার পরে অসুররাজ বাণাসুরকে চক্রায়ুধদ্বারা সংহার করেন। দেবতা ও মুনিঋষিরা হর্ষধ্বনি সহকারে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবীর জয়গানে মত্ত হয়। তারা প্রস্থান করলে দেবী পুনরায় সেখানে তপস্যায় মগ্ন হন। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসে দেবীকুমারীর (পরাশক্তি)—বাণাসুর বধ স্মরণ করে "নবরাত্রি উৎসব" মহাজাকজমক সহকারে সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ মন্দির থেকে দুমাইল দূরবর্ত্তী মহাদানপুরম গ্রাম পর্য্যন্ত নীত হয় মহাসমারোহে। পূজারীগণকর্তৃক বাণাসুর বধ অভিনীত হয় যথাযথ শ্রদ্ধাসহকারে—এই আনন্দোৎসবের নাম পবিভেত্তাই। বোধ হয় মানব কল্যাণে শিব ও অশিব শক্তির দ্বন্দের প্রকাশই এই পৌরাণিক নাট্যোৎসবে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হল একমাত্র লক্ষ্য—যাহা চিরকাল ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

পুণ্যস্থানে অবস্থান কালে স্থানমাহাত্মে অনেক সময় স্বাভাবিক ভাবেই মানসিক বিপ্লব দেখা দেয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে মনে নামে প্রশান্তি আর বৈরাগ্যের পথে মুক্তিপথের সন্ধান দেয় এই প্রশান্তি জনিত আত্মোপলব্ধি। সংসারের মায়াপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনিবেদন করতে ব্যগ্র হয় মন পরম পাওয়ার আকাঙ্খায়; এই পরম প্রেমের কণামাত্র পেলে জীবন ধন্য হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে। কখনো কখনো প্রেমের এই খেলায় মানুষের এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন মনে হয়, হে আমার প্রেমের ঠাকুর, আমি তো তোমাকে আমার দেহ-মন সবই, ইহকাল-পরকাল, ভালমন্দ নিবেদন করেছি। তবু কেন এই প্রতীক্ষা, উপেক্ষা, এই নির্দ্দয়তা? আমি কি তোমার কাছে নিবেদনেরও অযোগ্য? আমি যে তোমার প্রেমের কাঙাল, দয়াময়! তোমাকে বাদ দিলে আমার সবই যে আজ মিথ্যে, মিথ্যে। আমার সবই তোমার সৃষ্টি—তোমার দেওয়া দেহ-মন-বুদ্ধি সবই। "আর কতকাল থাকব বসে এই মায়ার সংসারে, এবার তুমি লওগো টেনে আপন বাহুর ডোরে।" যাক, এই প্রসঙ্গে এখানে অধিক আলোচনায় বিরত থাকাই বোধ হয় সঙ্গত।

৩। পরশুরাম কাহিনী—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণাংশের নাম ছিল নানজিনাদ। কথিত আছে যে বর্ত্তমান গোয়া থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত স্থলভাগ তখন সমুদ্রের গর্ভে ছিল। ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয়বীর পরশুরাম একবার মনস্থ করলেন ব্রাহ্মণদের ভূসম্পত্তি দান করবেন। তিনি সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের নিকট অনুমতি চাহিলেন সমুদ্রে পরশু নিক্ষেপের জন্য—অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত পরশু (বা কুড়ুল) তিনি নিক্ষেপ করতে পারবেন, ততদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র সরে গিয়ে ভূখণ্ড তার হবে এবং সচ্ছন্দে তিনি আপন ইচ্ছামত ঐ ভূখণ্ড দান করতে পারবেন। অনুমতি পেয়ে গোয়া থেকে পরশু নিক্ষেপ করেন—সেই পরশু বর্ত্তমান কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত নিক্ষেপিত হওয়া-মাত্র সমুদ্র পশ্চাদাপসারণ করে ও কেরল, মাদ্রাজ প্রভৃতি জেগে ওঠে সমুদ্রের ভিতর থেকে। অবশ্য ইতিহাস একাহিনী নির্ভর যোগ্য মনে করেনা, কারণ বহুশতাব্দী থেকেই নানজীনাদ, তামিলনাদ প্রভৃতি ছিল পাণ্ডা রাজবংশের অধীনে। পুরানুরু ও অন্যান্য প্রাচীন তামিল সঙ্গম গ্রন্থে পাণ্ডারাজ বংশের আরাধ্যা দেবী কন্যাকুমারীর উল্লেখ আছে। মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য্য, জনজীবনের আচার ব্যবহার এবং সবকিছুই তামিলনাদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

কন্যাকুমারী মন্দিরে নবরাত্রি উৎসব (অক্টোবর) ছাড়াও মে মাসে (বিশখা) দশদিন ব্যাপী এক বিরাট উৎসব হয়। নবম ও দশমদিনে দেবীর সালঙ্করা মূর্ত্তি নিকটস্থ সরোবরে মহাসমারোহে জলবিহারে (টেপ্পামে) লইওা যাওয়া হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে (শ্লোক নং ২৩), এই কন্যাকুমারী তীর্থমাহাত্ম বর্ণিত আছে, আবার ১৩৬-৩৮ শ্লোকেও ইহার পুনরুল্লেখ আছে।

বর্ত্তমানে কন্যাকুমারী জিলার (তামিলনাড়ু রাজ্য) অন্তর্গত এই গ্রাম খুব বর্দ্ধিষ্ণু; শহরও বলা যায়। জনসংখ্যা প্রায় সাতহাজার, বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক (খৃষ্টান)—পেশা মৎস্যজীবি। একটী সুবৃহৎ গীর্জ্জা আছে এখানে (সেণ্ট জেভিয়ার

চার্চ)—একহাজার লোক একসাথে এখানে প্রার্থনা করতে পারে। একটী নাতিবৃহৎ মসজিদও আছে এখানে মুসলমানদের জন্য।

"গান্ধী স্মারক মন্দির" দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৮ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম এখানে সুদৃশ্য আধারে করে এনে সাগর সঙ্গমে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর—কোচিন সরকার জাতির জনকের উদ্দেশ্যে একটী স্মারক মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন এবং আচার্য্য কৃপালনী ১৯৫৪ সনের ২০ শে জুন তারিখে ওখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসে ঐ স্মারক সৌধ নির্ম্মাণ হয় মোট প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই যে প্রতিবৎসর গান্ধীজির জন্ম তারিখ ২রা অক্টোবর বেলা ১২টার সময়ে ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে রৌদ্র এসে মহাত্মার চিতাভস্মের আধারের উপরে পড়িবে! স্মৃতি-মন্দিরের ভাস্কর্য্য, শিল্পবোধ ও অলঙ্করণ চমৎকার। সন্নিকটে গান্ধীবাগ ও সকলের মনোহরণ করে। ঐ স্মৃতিমন্দিরের দোতলায় বা তিনতলায়ে আরোহণ করে চতুর্দ্দিকে অসীম সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেন এক অজানা আনন্দে মন ভরে ওঠে--এ দৃশ্য ভোলবার নয়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেও কখনই দেখার শেষ হয়না, আশা মিটেনা, চোখে ও জল আসেনা। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য চিরকাল মনে থাকবে। যাত্রীদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে শহরে বহু নূতন নূতন হোটেল, লজিং গড়ে উঠছে। বাস ষ্টেসনে কুলী ও ভিক্ষুকের দল যাত্রীদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানছে; ফেরিওয়ালারা মাদুর (ও ফোল্ডিং ছোটবড় মাদুর), খেলনা, নানাবিধ মালা প্রভৃতি নিয়ে হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়ায়। অদূরে "সুইমিং পুল" (নিরাপদে সন্তরণ স্থান) পর্য্যন্ত আমরা সমুদ্র সৈকতে প্রত্যহ মহানন্দে ভ্রমণ করি; রাস্তাও বেশ আরামদায়ক।

বিবেকানন্দ রক—স্বামী বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি (S. V. R. M. C.) এখানে একটী চলতি নাম হয়ে গিয়েছে।

যমজ পাহাড়ের মত কতকগুলি বৃহদায়তন শিলাখণ্ড মাথাউচু করে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্র মধ্যে—কন্যাকুমারী মন্দিরের পূর্ব্বদিকে—উপকূল থেকে প্রায় দেড়মাইল ভিতরে। অথৈ জল, আর অফুরন্ত উথাল-পাথাল ঢেউ দিনরাত ঐ পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে আছড়িয়ে পড়ছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বরম ও মাদুরাই হয়ে এখানে উপস্থিত হন। মন্দিরে পূজাদি সমাপন করে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। অদূরে সমুদ্র মধ্যে যমজ পাহাড় দেখিবামাত্র জলে ঝাঁপ দিয়ে ঐ পাহাড় যান—পরে বহুদিন তিনি ঐ পাহাড়ে তপস্যারত থাকেন। এই ঘটনার দুইবৎসর পূর্ব্বে ভারতের উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় শিখরে আরোহণ করে তিনি কঠোর তপস্যা কারন, আর এখন ভারতের দক্ষিণতম সীমায় যেখানে অসীম সমুদ্র ভারতমাতার পদলেহন করছে, সেখানে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তাহার আরাধনায় ব্যস্ত—দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য। তাহার অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব; প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অদ্বিতীয় বাগ্মীতার কথা কে না জানে? স্বামী বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি স্মৃতি তহবিল সংগ্রহ করে মাদ্রাজ ও অন্যান্য রাজ্যের সহায়তায় একটী বিরাট স্মৃতিসৌধ ও মন্দির নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েছেন। যাত্রীগণ কাটামারণ (ছোট নৌকা) চেপে S. V. R. M. C. র অনুমতি নিয়ে সমুদ্রমধ্যে ঐ রকে যেতে পারেন--কোন খরচ নেই তার জন্য। অবশ্য স্মৃতিসৌধ নির্ম্মানকল্পে তাহারা যেকোন দান সানন্দে গ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দ রক সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৫০০'-০" উচু। নির্ম্মিয়মান স্মৃতি সৌধটীর বিরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

আয়তন ঃ ১৩০'-০০ × ৪০'-০০",

উচ্চতা ঃ ভিত্তি থেকে মন্দিরশীর্ষে কলসপর্য্যন্ত ৬৫'-৬",

গাঁথুনি ঃ গ্রানাইট স্টোন (কৃষ্ণবর্ণ পাথর টিউটোকোরিণ থেকে আর লোহিতবর্ণ প্রস্তর আম্লাসমুদ্রম হইতে).

আনুমানিক ব্যায় ঃ ৫০ লক্ষ,

বর্ত্তমানে নিযুক্ত কর্ম্মীসংখ্যা ঃ ৩৫০,

সুরু ঃ ১৯৬৩ ও শেষ ডিসেম্বর ১৯৭০।

উত্তর প্রদেশের অধিবাসী শ্রীরামপ্রসাদ গোয়েল (তিনি অনর্গল ইংরেজী ও বাংলা বলতে পারেন) উক্ত স্বামী বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটীর একজন নিরলস কর্ম্মী। তিনি বর্ত্তমানে কমিটির "পিয়ার" (Public Relations) আফিসের প্রধান কর্ত্তা। তাহার আলাপ-ব্যবহার ও কর্ম্মতৎপরতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তাহার নিকট শুনেছিলাম—সত্য প্রেম পবিত্রতা ও পরমেশ্বর এক ও অভিন্ন। একের ভিতর দিয়ে অপরে যেতে হয় ধাপে ধাপে—অন্যপথ নেই। কথাগুলি কঠোর সত্য ও প্রনিধান যোগ্য। মাত্র দুদিন তাহার সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছিল—তৃতীয় দিনে গিয়ে শুনলাম যে তিনি ছুটী নিয়ে দেশে রওনা হয়েছেন সেদিনই। তাহার নিকট স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ নূতন ভাবে শুনেছিলাম, তাহার বাচনভঙ্গীও ছিল মধুর-মনে দাগ কাটে। কয়েকটা এখনও মনে আছে, তাহা আপনাদের বলব। তাহার অনুমতি নিয়ে আমরা নৌকায় করে বিবেকানন্দ রকে গিয়ে কর্ম্মরত শ্রমিকদের ও নির্ম্মিয়মাণ মন্দির এবং স্মৃতিসৌধ দেখে আসি। ঐ কমিটির (পাথর কাটাই ও অন্যান্য কাজের জন্য) একটি বৃহৎ কারখানা এবং বিবেকানন্দ পাঠাগার আমরা পরিদর্শন করি। পাঠাগারে (+গ্রন্থাগার) ৬,০০০ হাজারের উপরে হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বহু মূল্যবান পুস্তকাদি রক্ষিত আছে। শান্তি ও সহযোগিতার বাণী, আনন্দের সঙ্গে তৃপ্তি, যেন এখানে প্রতি বালুকণায় মিশে আছে। ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন ঃ—

১। গৃহস্থজীবন যেমন সত্য, সন্যাসজীবনও তেমনি সত্য। ঈশ্বরকে পাওয়ার পথে গৃহস্থজীবন থেকে সন্যাসজীবনে উত্তীর্ণ হতে হয়। স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে ছেলেমেয়েরা কলেজে যায়, আর স্কুলে ফিরে আসেনা যেমন। কামিনী কাঞ্চন সব সময় ছিল, আছে ও থাকবে—এদের না হলে সংসার চলেনা। কাজেই

তাদের মায়া বলে নস্যাৎ করলে চলবেনা। একথা অবশ্য সত্য যে অদ্বৈতজ্ঞান হলে বুদবুদের মত অনন্ত অসীমে মিলিয়ে যায় এরা। কিন্তু সে জ্ঞান কি সকলের হয়, না সহজে পাওয়া যায়? সেই জ্ঞানলব্ধ ব্যাক্তি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়—নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে একে।

২। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, হাতে তেলমেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হবে—না হলে আঠায় হাত জড়িয়ে যাবে. অনেক দুঃখ পাবে। পাঁকাল মাছের মত কাঁদায় থাকবে অথচ কাঁদা লাগবেনা। এটা সম্ভব যদি সংযমের তরী আশ্রয় করা যায়—অন্যথায় সংসারে ডুবে গেলে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—যেমন আমরা নিয়ত করি।

৩। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়—জানাকথা। সত্যাশ্রয়ী হও, সেবাধর্ম্মী হও, সব হবে। প্রত্যক্ষের পিছনে অপ্রত্যক্ষ আপন কাজ করে চলে। সাধারণ দৃষ্টির পরদায় তার ছবি পড়ে না। যে ঈশ্বর ছুঁয়েছে, তার আর সংসারে দরকার নেই। যেমন চোর চোর খেলায় বুড়ি ছুঁলে তার চোর হতে হয়না, তেমনি ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারী হতে হবেনা।

৪। চাঁদমামা সকল শিশুর মামা—তেমনি সকলের আপনার। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মে জ্ঞান থাকলে ব্রাহ্মণ হয়—সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হলে সব পাওয়া যায়—ভক্তাধীন ভগবান, কেনা জানে? ব্রাহ্মণ শরীরের দশরকম সংস্কার আছে—বিবাহ তার মধ্যে একটা। শুকদেবের ও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য। ঐ দশরকম সংস্কার হলেই আচার্য্য হওয়া যায়—সব ঘুরে ঘুরে এলেই ঘুটি চিকেয় ওঠে, নয় কি?

৫। মহর্ষী যাজ্ঞবল্ক তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন—পতিরূপে পতি স্ত্রীর প্রিয় হন না, আত্মস্বরূপ বলেই পতি পত্নীর প্রিয় হয়ে থাকেন। ভার্য্যারূপে ভার্য্যা পতির নিকট প্রিয় হয়না, আত্মাস্বরূপা বলেই পত্নী পতির নিকট প্রিয় হয়ে থাকেন। এই আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং বেদ নির্দ্দিষ্ট শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন সাহায্যেই এই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

কথাগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—উপলব্ধি করার মত ; ধীরে ধীরে অভ্যাস করলে সবই সম্ভব।

২৭। সুচীন্দ্রম্।

কন্যাকুমারী থেকে আমরা বাসে করে সুচীন্দ্রম্ যাই প্রাতে এবং মন্দিরাদি দর্শনান্তে দ্বিপ্রহরে ফিরে আসি। এই মন্দিরের পশ্চাতে এক বিরাট কাহিনী আছে—সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করতে চেষ্টা করব।

অতি প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানারণ্য নামে এক বিশাল ও ভয়াবহ অরণ্য ছিল। এই বনে যেমন ছিল বন্য জীবজন্তু ও বিরাট বৃক্ষের সমারোহ, তেমন ছিল মহর্ষি অত্রির অতি পবিত্র আশ্রম—যেখানে নিয়ত বেদধ্বনি উচ্চারিত হত। মহর্ষি অত্রির সঙ্গে তার সহধর্ম্মিনী সতী অনসূয়া ও সেখানে থাকতেন—অন্যকোন জনমানব সেখানে ছিলনা। সতী অনসূয়া আপন তপোবলে দৈনিক গঙ্গাজল আনয়ন করে পূজা সমাপনান্তে স্বামীর পাদোদক গ্রহণ করতেন এবং আশ্রমের যাবতীয় কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করতেন সানন্দে। বর্ত্তমানে যে স্থান সূচীন্দ্রম গ্রাম বলে পরিচিত, সেখানেই নাকি ঐ আশ্রম ছিল তখন। সূচীন্দ্রম কথাটার অর্থ ও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্র তাহার পাপমোচনের জন্য যেখানে তপস্যা করেছিলেন এবং পরে যেখানে শুচিতা প্রাপ্ত হন বা শুদ্ধ হন সেই স্থানই সূচীন্দ্রম। সূচীন্দ্রমে শিবমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত কন্যাকুমারীতে পরাশক্তির মন্দির—সাধারণ কারণেই তাই এই দুটী মন্দিরকে একসঙ্গে স্মরণ করে থাকে—শিবশক্তি যথা। এই সূচীন্দ্রমের সুপ্রাচীন বিশাল মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা হয়—কথিত আছে যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এখানে ঐ ত্রিমূর্ত্তির পূজা করেছিলেন এবং এখনও প্রত্যহ রাত্রে পূজা দিতে আসেন।

একদা যখন মহর্ষি অত্রি কার্য্য উপলক্ষে হিমালয়ে গিয়েছিলেন তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (হিন্দু শাস্ত্রের তিন মুখ্য দেবতা যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু স্বরূপ) সতী অনসূয়াকে পরীক্ষা করবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সতী

অনসূয়া যথাযোগ্যভবে অতিথিত্রয়কে পাদ্যার্ঘ্য প্রদানান্তর আহার্য্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ভোজ্যবস্তুর সম্মুখে স্থিরভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি বিমর্ষ মনে প্রশ্ন করলেন কেন তাহারা আহার্য্য গ্রহণ করছেন না। কোন অপরাধ করেছেন কি তিনি, জানতে পারলে, তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করবেন। ব্রাহ্মণবেশী দেবতা-ত্রয় তখন জানালেন যে যদিও তারা ক্ষুধার্ত্ত তবু তাদের ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী কোন বস্ত্র পরিহিত স্ত্রীলোকের দেওয়া আহার্য্য গ্রহণে তারা পরন্মুখ। ক্ষোভে, দুঃখে সতী অনসূয়া ম্রিয়মান হলেও তিনি মনে মনে সব ঠিক করে ফেললেন। স্বামীর পাদোদক ঘরেই রক্ষিত ছিল। তিনি তাহা ঐ তিন ব্রাহ্মণের গায়ে ছড়িয়ে দিবার সাথে সাথে তারা তিনটী ক্ষুদ্র শিশুতে পরিণত হল। অতঃপর তিনি তিনটী শিশুকেই পরম যত্নে প্রতিপালন করতে লাগলেন। উক্ত দেবতাদের তিন স্ত্রী স্বামীর অদর্শনে কাতর হয়ে খুঁজতে খুঁজতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে সমুপস্থিত হয়ে দেবতাদের তদবস্থায় দেখতে পেলেন। দেবীদের প্রার্থনায় সতী অনসূয়া উক্ত শিশুত্রয়কে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণবেশে পরিণত করে তাদের প্রত্যর্পন করেন। এদিকে মহর্ষি অত্রি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করে সস্ত্রীক ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) সন্দর্শনে পরম পুলকিত হয়ে স্তব করতে করতে ধন্য হন। এই স্মৃতি রোমন্থন করেই পরবর্ত্তী কালে এই বিশাল মন্দির তৈরী হয় ও দৈনিক ত্রিমূর্ত্তির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) পূজা হয় এই সূচীন্দ্রমে।

সূচীন্দ্রম নামের অর্থ যেখানে ইন্দ্র শুচিতা প্রাপ্ত হয়েছিল। পুরাণে আছে গৌতম মুনির শাপে ইন্দ্রের দেহে সহস্রযোনির চিহ্ন প্রকট হয়েছিল। দেবরাজ নাকি গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধারণ করে তাহার স্ত্রী অহল্যাতে উপগত হয়েছিল—তাই মুনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করে ধ্যানস্থ হয়ে সব জানতে পারেন এবং দেবরাজকে তাহার কামান্ধতার জন্য শাপ দেন এবং পত্নী অহল্যাকেও কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। অবশ্য পত্নীকে পরে তাহার মুক্তির উপায় বলে দেন যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যথাসময়ে

এসে তাকে উদ্ধার করবেন। লজ্জায় ও অপমানে অধীর হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কঠিন তপস্যায় রত হন এবং বহুকাল পরে ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর) তাহার তপস্যায় খুসী হয়ে তাহার কষ্ট মোচন করেন এবং ইন্দ্র পুনরায় তাহার কন্দর্পকান্তি ফিরে পান। কথিত আছে যে সূচীন্দ্রমে অভিষেকের সময় স্নানের জল, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি গুপ্ত সুরঙ্গ পথে কন্যাকুমারীতে এসে সমুদ্রে পতিত হয়। এই স্থানের নাম স্থানুতীর্থ।

সূচীন্দ্রম মন্দিরাঙ্গন মন্দিরময় দক্ষিণভারতে সুবৃহৎ বলে পরিগণিত হয়। বিরাটকার হনুমান মূর্ত্তি (১৮'-০০") চারিটি বাদ্যস্তম্ভ (যাহা দেখতে অন্যান্য স্তম্ভের অনুরূপ) এবং কয়েকটি মণ্ডপের স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের কলাকৌশল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ডিসেম্বরে রথযাত্রা ও এপ্রিলে ভাসান (নৌকাবিহার) উপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। আমাদের গাইড বাদ্যস্তম্ভগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বাজিয়ে আমাদিগকে মুগ্ধ করেন। তাহার বাজনা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার রেকর্ড করে নিয়েছেন—আকাশবাণী মারফতে। তিনি যে একজন উঁচুদরের শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রাচীন কালে কি করে এমন বিস্ময়কর পাথরের স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল যা শুধু বিরাট সৌধের স্তম্ভমাত্র নয়, সুমধুর বাদ্যযন্ত্র ও বটে। এই বিখ্যাত মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল কয়েকজন স্থানীয় লোকের উপরে—পরে মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ এর রাজত্বকালে তিনি স্বহস্তে উহার দায়িত্ব নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মন্দিরের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। মাদ্রাজ সরকার (দেবস্থানম পরিকল্প) বর্ত্তমানে এই মন্দিরগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। হিন্দু (পুরুষ) গণ সনাতন প্রথানুযায়ী উত্তরীয় পরিধানে (ধুতিমাত্র) এবং মহিলারা তাহাদের স্বাভাবিক সাধারণ পোষাকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন—অহিন্দুরা মন্দিরাঙ্গনে যেতে পারেন কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে নয়। মন্দিরাঙ্গনে হাতী, ময়ূর ইত্যাদি এখনও প্রতিপালিত হতেছে দেখলাম।

আর একটি কাহিনী ও এখানে যথেষ্ট জনপ্রিয় ও বহুলোকে তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করে শুনলাম। সংক্ষেপে তাহা এখানে বলছি ঃ এক রাখাল গৃহস্থ বধূ জ্ঞানারণ্যের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্রত্যহ একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ায় হোঁচট খেত—ফলে তার মস্তকোপরি রক্ষিত দুগ্ধ বা কখনও দধিভাণ্ড হতে খানিকটা পড়ে যেত। যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করেও সে ঐ দৈনিক আঘাত, সময় নষ্ট ও ব্যবসায়ের জন্য দধি-দুগ্ধ পতনজনিত ক্ষতি হতে রেহাই পেলনা। সে অতঃপর তার স্বামীর নিকটে সবিস্তারে সব বর্ণনা করল। ঐ গৃহস্থ তার বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে সেখানে এসে বাঁশঝাড় নির্ম্মূল করে ঐ স্থানটী একেবারে পরিস্কার করে দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য কাটা বাঁশের গোড়া থেকে তাজা রক্ত বের হতে দেখে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে ঐ পবিত্রস্থানে জ্যোতীলিঙ্গম্ বিদ্যমান। তারা তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুযায়ী সেখানে একটী ছোট্ট মন্দির স্থাপন করেন, এবং সেই মন্দিরই নবকলেবরে ক্রমে ক্রমে আপন গৌরবে এই বিরাট বিখ্যাত মন্দিরে পরিণত হয়েছে। মূর্ত্তিপূজা এখানে এক বিশেষ অভিনব ধরণের—সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ও স্থুল। পুরাণশাস্ত্রে যেমন আছে—তিনটী ধাপে বা ধারায় ভগবানের নিকট যাওয়া যায়, পাওয়া যায় তাঁকে। ১। মূর্ত্তিহীন পূজা, ২। নির্দ্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা বিগ্রহ পূজা এবং ৩। যে কোন বস্তু বা মূর্ত্তির মাধ্যমে পূজা। সূচীন্দ্রম মন্দিরেও তেমনি এই তিনটী ধারাই পরিলক্ষিত হয়। চিত্রসভা মণ্ডপে কোন দেবমূর্ত্তি নেই—আছে শুধু বিরাট দর্পনের মত একটা অদ্ভুত পাথর। এখানে মূর্ত্তিহীন পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। আরো ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডপে এমনিকরে বিভিন্ন ধারায় পূজা-প্রার্থনা করা যেতে পারে। "বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—আর একবার প্রমাণ করেছে এই মহামন্দির, দেবাদিদেব মহাদেবের এই সূচীন্দ্রম। কথিত আছে মাদুরাইর বিখ্যাত নরপতি থিরুমালাই নায়ক এখানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা [illegible]রেন; নানজীকুরভের রাজত্বকালে সুব্রামনিয়াম, শ্রীরাম, [illegible]রভদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই মন্দিরগুলিতে নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির

পূজা হয়ে থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন এবং পরশুরাম নাকি এই সুচীন্দ্রম মন্দির পরিদর্শন করে গিয়েছেন, তার প্রমাণও আছে। বৎসরে চারিটী পবিত্র উৎসব হয় বলে কথিত—চিঙ্গম, ধনু, কুম্ভম, ও মেডম মাসে—এখনও উৎসবগুলি সাড়ম্বরে পালিত হয় এবং বহু দর্শনার্থীর ভিড় হয় সেসময়ে।

সুচীন্দ্রম থেকে বাসেই ফিরে আসি কন্যাকুমারী। দ্বিপ্রহরে মীনাক্ষীভবনের "ভোজ্য" গ্রহণান্তর বেলা ১১ টায় রওনা হই নাগেরকল হয়ে সাধারণ বাসে ত্রিভেন্দ্রাম অভিমুখে! ত্রিভেন্দ্রাম পৌঁছাই বৈকাল চারি ঘটিকায়, আর সেখান থেকে একসপ্রেস ট্রেনে রাত্রে এর্ণাকুলাম রওনা হই।

২৮। এর্ণাকুলাম (কোচিন)।

ট্রেনে চড়ে এর্ণাকুলাম পৌঁছাই শেষরাত্রে প্রায় ৪ টার সময়ে (ইং তারিখ ১৪ই নভেম্বর)। রেলষ্টেসনের নাম এর্ণাকুলাম—আর বন্দরের নাম কোচিন। অবশ্য কোচিনে ও রেলষ্টেসন আছে যেমন আছে সুবৃহৎ বাস ষ্টেসন। শুধু এর্ণাকুলামের আয়তন ও জনসংখ্যা হল যথাক্রমে ৩.২৭ বর্গমাইল ও ৭০ হাজার। কিন্তু ফোর্ট কোচিন, মাট্টানচেরী ও এর্ণাকুলামের মোট আয়তন ও জনসংখ্যা একসঙ্গে বলা চলে যথাক্রমে ৮ বর্গমাইল ও দুইলক্ষ। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলে এখানে শীত নেই বললেই হয়। মৌসুমীবায়ুর জন্য বর্ষাকাল সাধরণতঃ জুন থেকে অক্টোবর, বৎসরে ৫ মাস। দক্ষিণভারতের অন্যান্য বড় শহরগুলির মত এখানেও বিমান বন্দর, বৃহদায়তন রেলষ্টেসন, ও সরকার পরিচালিত সুবৃহৎ বাস ষ্টেসন আছে। সরকারী একসপ্রেস বাস সার্ভিস ও ডিলুকস একসপ্রেস বাস সার্ভিস দৈনিক দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব বড় শহরেই নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে; সোজা কথায় জালের মত ছেয়ে আছে সমস্ত দক্ষিণভারত এই বাস সার্ভিসে। এছাড়া আছে লোকাল বাস সার্ভিস—যেগুলো যাতায়াত করে এর্ণাকুলাম, উইলিংডন দ্বীপ, মাট্টানচেরী ও ফোর্টকোচিনের ভিতরে। ফেরী বোট সার্ভিস, ষ্টীম

লাঞ্চ, লাকসারি কোচও আছে, যেমন আছে প্রচুর ট্যাকসি ও অটোরিকসা। এখানে বহু ছোটবড় হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, লজিং, রেষ্টহাউস, টুরিষ্ট হোম ইত্যাদি আছে—কয়েকটী বড় বড় হোটেলের নাম নীচে দিলাম ঃ—

১। মালাবার হোটেল, উইলিংডন দ্বীপ, কোচিন-৩,

২। উডল্যাণ্ডস হোটেল, (ঐ),

৩। ইন্টারন্যাশনাল হোটেল, মহাত্মা গান্ধীরোড, এর্ণাকুলাম,

৪। মেফেয়ার হোটেল, ব্যানার্জী রোড, এর্ণাকুলাম, এবং

৫। টুরিষ্ট বাংলো, বলঘাটি প্যালেস, এর্ণাকুলাম।

দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলিই প্রধান মনে হয় ঃ—

ক) সাণ্টাক্রুজ ক্যাথিড্রেল, ফোর্ট কোচিন,

খ) সেণ্ট ফ্রান্সিস চার্চ্চ, ফোর্ট কোচিন (লোকাল বাস-রুট নং ১/বি (বা) ১/সি।

গ) জ্যুয়িস সিনাগগ (Jewish Synagogue), জ্যুটাউন্, মাট্টানচেরী=শনিবার বন্ধ (লোকাল বাসরুট নং ১)

ঘ) মাট্টানচেরী ডাচ প্যালেস (জ্যুয়িস সিনাগগের কাছে, সোমবার বন্ধ)।

ঙ) ভগবতী মন্দির, চোট্টানিকারা (লোকাল বাস রুট নং ১/বি (বা) ১/সি)।

চ) ত্রিচুর (৪৬ মাইল),

ছ) গুরুভাইয়ুর মন্দির (৬২ মাইল),

জ) পেরিয়ার বন্যজন্তু সংরক্ষণ বিভাগ, থেকাডি (১৩০ মাইল)

ঝ) শিবমন্দির, তিরুমালাই দেবাসোম, এর্ণাকুলাম।

এতবড় শহরে মাত্র নয়টি সিনেমা হাউস আছে, তন্মধ্যে দুটী শুধু ইংরেজী ছবি দেখিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারী টুরিষ্ট আফিস, কোচিন থেকে যাত্রীদের নানাবিধ সাহায্য ও সুপরামর্শ দিয়ে থাকে। বড় বড় রাস্তায় দেশী ও বিদেশী মদের দোকান এখানে অনেক—এ বিষয়ে অন্যান্য বহু রাজ্যের মত এখানে কোন বাধা নিষেধ নেই।

মহাত্মা গান্ধী রোডে তাপনিয়ন্ত্রিত একটী বৃহৎ হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের দোকান আছে—আর বড় বড় দোকান সব আছে এর্ণাকুলামের ব্রডওয়ে'তে এবং কোচিনের নিউ রোডে। একটা কথাই বারে বারে মনে পড়ে—কেরালার অন্তর্গত কোচিনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের পিছনে সুবৃহৎ জলাভূমি ও হ্রদ, আর দিকে দিকে নারিকেল কুঞ্জ সুশোভিত সমুদ্র সৈকত। এসব নানাকারণেই কোচিনকে "আরব সাগরের রাণী" বলা হয়।

আমাদের অস্থায়ী বাস নির্ব্বাচন করি "অনন্ত ভবন," মহাত্মা-গান্ধী রোড, এর্ণাকুলাম—প্রতি ডবল কামরার ভাড়া ৮্ টাকা (তুটো বেড, লাইট, ফ্যান ও পৃথক বাথরুম সহ)। খাবারের জন্য পৃথক দাম—তবে সকালে, তুপুরে বৈকালে ও রাত্রে আমরা ওখানেই বেশীর ভাগ দিন আহার্য্য গ্রহণ করি। বাথরুমটা ছিল চমৎকার, মোজাইক—টালি করা, আর পা ঘষবার জন্য পৃথক খসখসে মেজে। বৈকালে আমরা সেণ্ট ফ্রান্সিস চাৰ্চ্চ, কোচিন, যাই বাসে করে এবং সমুদ্রতীরে বসে সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ বোধ করি। বেড়াতে বেড়াতে আমরা শ্রী পি, কে, এস, সুব্রহ্মনিয়াম নামক অমায়িক বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হই। তার নিকট থেকে আমরা কোচিনের বহুতথ্য সংগ্রহ করি বৈকালে আমরা যে গীর্জ্জা দেখেছি তা বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সময়ে তৈরী ইং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং এখানে এখনও নিয়মিত ভাবে ধর্ম্মোপাসনা হয়। ডাচ জলদস্যুদের তৈরী একটী ক্ষুদ্র কেল্লা এখন কোচিনের সহকারী জেলাশাসকের বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিকটেই "নেহেরু বাল—উদ্যান" দেখি—এই ত্রিকোণাকার বালউদ্যানের তিনপাশেই সিমেণ্ট কংক্রীটের রেলিং ঘেরা এবং ঐ রেলিং এর একদিকে সামুদ্রিক মাছ ও নানাবিধ জন্তু, এবং অপর তুদিকে বহুবিধ পক্ষী ও জন্তু-জানোয়ারের জীবন্ত প্রতিকৃতি রয়েছে—যেমন ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী সব—মজা করে খেলবার জন্য সবাই হাজির। পার্কটি বেশ সুবিন্যস্ত, এবং শিশুদের জন্য উপযুক্ত ভাবে পরিচ্ছন্ন আছে দেখে আনন্দ পেলাম। স্থানীয় জেলেরা দলে দলে

বের হয় প্রাতে ৪/৩০ টার সময়ে আর বাড়ী ফিরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় ৫/৩০ টার সময়ে। অদূরে একটু উচ্চস্থানে একটী লাইট হাউস্ আছে—সমুদ্র বিহারী জেলের দল ও জাহাজের নাবিকদের সুবিধার জন্য। সমুদ্র সৈকতে একটি "রেষ্ট হাউস্" আছে P. W. D.'র=দরকারমত সফররত সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ উহা ব্যবহার করেন। ঐ রেষ্ট হাউজের আঙ্গিনায় "খাটপাচ্চক" নামে একটা ফলবৃক্ষ দেখলাম। ছোট্ট কাঁঠালের মত দেখতে ফলগুলি আর পাতাগুলি আকারে অতি বৃহৎ=ফলগুলি কচি অবস্থায় সুস্বাদু সব্জি হিসাবে ব্যবহৃত হয় শুনলাম। এরকম গাছ অন্যকোথাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পরদিন প্রাতে আমরা সিটি বাস স্টাণ্ড থেকে গুরুভাইয়ুর যাই এক্সপ্রেস বাসে চড়ে। ভাড়া জনপ্রতি ২·৫৫ পয়সা, পৌঁছাই বেলা ১১ টায়। বিরাটাকৃতি মুখ্য মন্দিরে ভগবান কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করি। এখানেও মন্দিরে পুরুষের "ধুতিবিনা গতি নেই" বিধায় একখণ্ড সাদা "লুঙ্গিমার্কা ধুতি" ক্রয় করে ব্যবহার করি। মন্দির দর্শনের পরে সন্নিকটে অবস্থিত "মডার্ণ হোটেলে" ভাত খাই—জনপ্রতি খরচ ১.৫০ পয়সা। স্থানীয় অধিবাসীরা না জানে ইংরেজী, না হিন্দী—যাত্রীদের ভাষাগত সমস্যা এখানে প্রকট। টুরিষ্ট লজ, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট আছে অনেক। দ্বিতল বিশিষ্ট দালান এখানে বিরল, পাকাঘর ও একতলা দালানই বেশী। মাছ পাওয়া যায় প্রচুর, শুটকী মাছের ব্যবসা ও তাই খুব জোরদার। বাজারে মারওয়ারী দোকান আছে মাত্র ২/১ টি, বাকী সব স্থানীয় লোকের। পথের পাশে বহু আম—কাঁঠালের বাগান, নারিকেল গাছ তো আছেই। দেখলাম দোফলা আমগাছের বিশাল বাগান—কোন কোন গাছের একডালে মুকুল, অপর ডালে কাঁচা আম এবং অন্য ডালে বেশ কতকগুলি পাকা আম ঝুলছে। খুব মজার নয়কি? বারমাসই একগাছে আম ফলে এমন গাছের সমারোহ একসাথে আগে কখনই দেখিনি। কোথাও ছোট ৫/৬ ফুট নারিকেল গাছে ফল ধরেছে; এক একটা গাছে ৩/৪ টি ছড়া এবং প্রত্যেক

ছড়ায় ১৫/১৬টী করে নারিকেল = ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনায়াসে মাটিতে দাঁড়িয়ে গাছথেকে নারিকেল সংগ্রহ করতে পারে। গুরুভাইয়ুর থেকে ফিরবার পথে বাসে এক ভদ্রলোকের সাথে (শ্রী এন, কে, কীর্ত্তিকার) পরিচয় হয়েছিল। তিনি একজন মেডিকেল "রিপ্রেজেণ্টেটিভ"। তিনি কয়েকবসৎর পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন এবং সেখানকার বাংলা ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার, সবই ভাল লাগে তার বললেন। তিনি যে বাঙ্গালী মেসে থাকতেন—সেখানকার বন্ধুরা তাকে "খাসুন" বলে ডাকত। কারণটা তিনি যেমন বলেছিলেন=প্রথমদিকে কলিকাতার মেসে ভাষা ব্যাপারে তার বেশ অসুবিধা হত—কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। বন্ধুবান্ধবকে তিনি আপ্যায়িত করতেন—বাংলা শিখবার জন্য চেষ্টা করতেন। কেহ এলেই তাকে বলতেন আসুন, বসুন, এবং (চাপানের সময়ে) খাসুন। সাবাই "খাসুন" শুনে হো-হো করে হাসলেও তিনি কারণ বুঝতে পারেননি। অবশেষে একবন্ধু তাকে বললেন, তিনি বিদেশী এবং বাংলা ভাল জানেন না। তার কথা বলায় একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে "চা পান করুন বা চা খান" কিন্তু খাসুন নয়। ইংরেজীতে যেমন put "পুট" কিন্তু cut "কুট" নয়, কাট তেমনি বাংলায় বলার সময়ে আসুন, বসুন, কিন্তু খাসুন নয়, খান বলতে হবে। তিনি সেই বন্ধু মুখার্জীর কথা আজও ভোলেননি। ভদ্রলোকটি বেশ বুদ্ধিমান ও রসিক বলে প্রতিভাত হল আমাদের মনে। আমারও "আসুন-বসুন-খাসুন" চিরকাল মনে থাকবে। গুরুভাইয়ুর থেকে বাসে করে আমরা এর্ণাকুলাম ফিরি, আর অনন্তভবনে পৌছাই সন্ধ্যা ৭টার সময়ে।

এরপরদিন আমাদের বিশ্রাম-দিবস—ঘুম থেকে দেরীতে ওঠা, এতদেরী যে "ব্রেকফাষ্টের" সময় বহুপূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। লাঞ্চের পরে আবার বিশ্রাম—বৈকালে চা-পর্ব্বের পরে বিশ্রান্তালাপ ও পরদিনের প্রস্তুতির জন্য আলোচনা। নৈশভোজ যথাসম্ভব সকাল সকাল সেরে নিয়ে আবার বিশ্রাম, বিশ্রামের পর বিশ্রাম, আবার বিশ্রাম, কি বলেন ?

রিকসা করে পরদিন প্রাতে আমরা "বোটজেটি" যাই, সেখান থেকে ষ্টীমলঞ্চে করে যাই ফোর্ট কোচিন। বোট জেটির সন্নিকটে "সুভাষ পার্ক" বেশ মনোরম উদ্যান ; অনুপম, অনবদ্য বলা বোধ হয় ঠিক হবেনা কারণ প্রধানতঃ ঐ পার্কের আয়তন খুবই ছোট। সাগরবেলায় সন্ধ্যাকালে আরো চমৎকার। ওপারে "উইলিংডন সেতু" যার বুকের উপর দিয়ে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী ও পদযাত্রী চলছে দিবারাত্রি। নীচে সমুদ্রের "ব্যাকওয়াটার"—শান্ত সমুদ্রের পরিবেশ, চারিদিকে কর্ম্মকোলাহলের মুখরতার মধ্যে ও যেন প্রশান্তি বিরাজমান। কোচিন ফোর্টে বেড়াবার পরে আমরা বাসে করে "মাট্টানচেরী হল্ট" হয়ে এর্ণাকুলাম প্রত্যাবর্ত্তন করি।

আমরা জানি হিন্দুমাত্রই ধর্ম্মপ্রাণ, বিশেষ করে সাগর সলিলে স্নান, তীর্থদর্শন ইত্যাদি সস্ত্রীক সম্পন্ন করতে পারলে প্রত্যেক বিশ্বাসী হিন্দু নিজেদের ধন্যমনে করেন। জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপের গ্লানি দূরীভূত হল, এই অনুভূতি তাদের জীবনে শান্তি, তৃপ্তি ও পবিত্রতা বোধ জাগ্রত করে। তীর্থধর্ম্ম পালনের জন্য ভারতের দূরতম প্রান্তর হতেও যে ব্যাকুলতা লয়ে বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বপ্রদেশের হিন্দু ছুটে আসেন, পথে অনাহারে বা স্বল্পাহারে, অনিদ্রায় ও অন্যান্য কারণেও যে দুঃসহ ক্লেশ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেন, বিশ্বাসের সেই দৃঢ়তা, ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য পালনের সেই নিষ্ঠা দেখলে অবিশ্বাসের মুখরতা আপনা-আপনি স্তব্ধ হয়ে যায় ; ধর্ম্মার্জ্জনের সেই আকুলতা ও আগ্রহের সম্মুখে মাথা স্বতই নত হয়ে যায়। যারা এই ধর্ম্মপালনের জন্য ব্যগ্র (বা দেশভ্রমণের অদম্য আগ্রহ নিয়ে যারা বের হন) তারা কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলে গণ্য করেন না—কোন বিপদ বা অসুবিধাকেই গ্রাহ্য করেন না। আমরা বাঙ্গালী তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের বাংলা মায়ের কথা মনে পড়ে। বাংলা দেশের মত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র অল্পস্থানেই আছে। শস্য-শ্যামল প্রান্তর, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, সৌন্দর্য্যের রাণী দারজিলিং শহর, দীঘার উন্মুক্ত সমুদ্র সৈকত, কত দেবদেবীর পীঠস্থান বাংলা, ১৫৫৯ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ, শান্তি নিকেতন, দুর্গাপুর ও

চিত্তরঞ্জন কারখানা, কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাট, ডায়মণ্ড-হারবার ও সাগরদ্বীপ, নানা কারণেই প্রখ্যাত। বাংলার তীর্থক্ষেত্রগুলি যুগ যুগ ধরে ভারতের সকল প্রদেশের তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে আসছে—আজও রয়েছে অম্লান সেই তীর্থমাহাত্ম্য। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুর, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, মায়াপুর, গঙ্গাসাগর, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, জল্পেশ্বর প্রভৃতিস্থানে যাত্রীদের ভীড় ক্রমেই বাড়ছে বলে মনে হয়। বাংলার মন্দিরগুলি ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা দক্ষিণদেশের মন্দিরের মত উত্তুঙ্গ ও বৃহদায়তন নয় বটে, তবে তার বিশিষ্টতা--সুগঠিত অবয়বে ও নকশার বৈচিত্রে, ভারত বিখ্যাত ও সর্ব্বজনস্বীকৃত। কত কিম্বদন্তী আছে এইসব মন্দিরের পিছনে! যাহোক, এবার আমাদের ফিরবার পালা; "আরব সাগরের রাণীকে" জানাই নমস্কার।

২৯। প্রত্যাগমণ পর্ব্ব।

কোচিন—মাদ্রাজ একসপ্রেস যোগে (III স্লিপার কোচে) আমাদের সব ঠিক আছে। গাড়ী আসতে দেরী হওয়ায় বৈকাল প্রায় ৩ টার সময়ে আমরা এর্ণাকুলাম ছেড়ে রওনা হলাম কলিকাতা অভিমুখে। গাড়ীভাড়া মাদ্রাজ সেন্ট্রাল পর্য্যন্ত (৭১৫ কিঃ মিঃ) জন প্রতি ২১·৬০ পয়সা। সৌভাগ্যবশতঃ স্লিপার কোচে একজন ভাল সাথী জুটেছিল আমাদের—শ্রী টি, আর, ভেঙ্কটেশ্বর পিল্লাই ও তার পারিবারবর্গ (পিতামাতা, স্ত্রী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ষোড়শী ভগ্নী)। তারাও কলিকাতা ফিরছেন শ্রী পিল্লাইর—চাকুরীস্থল কলিকাতা। তিনি কিছু কিছু বাংলা বলতে পারেন, আর কেহ নয়। সময় সময় তার সাথে বহু আলোচনা হয়, দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য (হোটেলের মাদ্রাজ মিল, মিঠাইর দোকানে ইডলি, ধোসা, উকমা, জিলিবি, বালুসাই, এবং কালে কদাচিৎ মাইশোর পাক), দক্ষিণ ভারতে যাত্রীদের ভাষার অসুবিধা ভোগ, দক্ষিণে হিন্দী বর্জন সমিতির জয়জয়কার, কলিকাতার উগ্র আধুনিকতা ও তার ফলাফল, বাংলার রসগোল্লা, সন্দেশ ও মিষ্টি দৈ

ইত্যাদি বিষয়ে। সারাপথ তার গল্প চলেছে—অনবরত এতকথা সবাইর ভাল লাগেনা।

পথে ত্রিচুর ষ্টেসনে লালকলা, কমলালেবু, কাফি ও বিস্কুট এবং রাত্রি ৮৷৩০ টায় কোয়েম্বাটুরে নৈশভোজ সম্পাদন করি গাড়ীর ভিতরেই। প্রত্যুষে আর্কোনাম জংশন ষ্টেসনে কাফি পান করি প্রায় ৬টার সময়ে। একসপ্রেস গাড়ী দ্রুততালে চলেছে—এখানে মেলগাড়ীর চেয়ে একসপ্রেস গাড়ীর গতি সাধারণতঃ দ্রুততর ; বাংলার মত নয়। ধূ ধূ মাঠের ভিতরে মাঝে মাঝে তালগাছের সারি—যেন শস্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অতন্দ্র প্রহরায় রত। এই তালকুঞ্জ আরো কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়—তালরস, তালগুড়, তালমিশ্রি, তাড়ি ও বিভিন্নপ্রকার মাদকদ্রব্য এই গাছ থেকেই উৎপন্ন হয়—আর কত লোক এর উপরে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নির্ভরশীল। মাদকদ্রব্য বর্জ্জন বা নিষিদ্ধ হলেও চোরাপথে বা কালপথে এর চলন থাকবেই—যুক্তিবাদীরা তা মানতে বাধ্য। উপযুক্ত শিক্ষা, মানসিক উৎকর্ষ, স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান, ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আস্তে আস্তে অবশ্য সবই সম্ভব। সকাল ৭৷৪৫ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী থামে পেরামবুর—রেলগাড়ী তৈরী কারখানার জন্য বিখ্যাত এই স্থান। বেসিন ব্রীজ জংশন পৌঁছাবার আগে গাড়ীর গতি বন্ধ হয় "সিগন্যাল" অভাবে—মাঠের মাঝখানে বহুসময় দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে আমাদের একসপ্রেস ট্রেনখানি মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেসনে পৌঁছায় সকাল ৯৷১৫ মিনিটে।

ক্লোকরুমে মালপত্র জমা রেখে (এখানেও ব্লাকমণি দরকার বিধায়—কুলীর মারফতে লাইনে না দাঁড়িয়ে)—অতি অল্প সময়ে মালপত্র জমা দিয়ে রসিদ পেলাম। দ্বিতলে উঠে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে / প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে স্নানাদি সারলাম মহারামে। এখানে ও সেই বখশিষ বা ব্লাকমণি—আরামের জন্যে খুসী হয়ে না দিলে চলবে কেন ? গীতার সেই শ্লোকটাই বারে বারে মনে হতেছিল তখন ঃ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ষ্টেশনের "কুইক মিল" রেষ্টুরেন্টে ভোজনের পরে ট্যাকসি করে বেড়াতে বের হই। আমাদের মাদ্রাজ—কলিকাতা মেল ছাড়বে রাত্রি ৯/১০ মিনিটে, কাজেই তখন আমাদের অখণ্ড অবসর। মেলের ভাড়া জনপ্রতি ৪৩/৪৫ পয়সা III শ্রেণী, (দূরত্ব ১৬৬০ কিঃ মিঃ), সংরক্ষিত শয়নঘরের ভাড়া অতিরিক্ত। এখানেই আমরা প্রথম শুনতে পাই যে গত ২৯শে অক্টোবর ওরিষ্যাতে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটেছে—যার ফলে রেললাইনও প্রায় ৪০/৪৫ মাইল বিধ্বস্ত—তা এখনও গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত হয়নি। সে কারণে আমাদের গাড়ী হাওড়া যাবে ভায়া ভিজিয়ানাগ্রাম, টাটানগর, ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিনঘণ্টা পরে গাড়ী হাওড়া পৌছবার সম্ভাবনা। "নাস্তি গতিরণ্যথা"—কাজেই মানতে হবে বৈকি! রাত্রে গাড়ী, কাজেই সময় কাটাবার জন্য এটা আমাদের অতিরিক্ত বা "ফাউ" লাভ—মাদ্রাজ সহর পরিক্রমণ। আমরা প্রভু ভেঙ্কটেশের মন্দিরে যাই, আর দুটো মন্দির বন্ধ দেখে ফিরে আসি—(দেবতা বিমুখ বলব কি ?)। মিউজিয়ামটা আর একবার ভাল করে দেখি—দেখা হলনা একেয়ারিয়াম—সোমবার ছুটীর দিন। মনোরম মেরিণা বীচে অনেকক্ষণ ছিলাম—অসীম সমুদ্রবেলায় সপ্তরঙ্গা রামধেনু প্রত্যক্ষ করি সূর্য্যাস্তের সময়ে। সাগর সলিলের দৃশ্য বড়ই চমৎকার—পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কারুশিল্পে মনপ্রাণ ভরে ওঠে অপার আনন্দে। হৃদয়ের অনুভূতি অন্যরকম হয়ে যায়—ক্ষণিকের জন্য হলেও তা সর্ব্বতোভাবে কাম্য মনে করি। যাক, সেখানেই সমুদ্রপারে "সুইমিং পুলের" ধারে দ্বিতল রেষ্টুরেন্টে বসে ভালমন্দ জিনিষ গ্রহণান্তে আমরা পুনরায় ষ্টেসনে ফিরে আসি। ষ্টেসনেই নৈশভোজ সেরে আমরা কলিকাতা গামী মেলে উঠি রাত্রি প্রায় ৯ টার সময়ে। গাড়ী ছাড়ে ৯।১০ মিনিটে। শ্রী পিল্লাই

তার পরিবার সহ বোধহয় অন্যগাড়ীতে চেপেছেন—আমাদের কামরায় তার স্থান হয়নি, যে কোন কারণেই হোক। কেন জানিনা, মনটা হয়তো তাকেই খুঁজতেছিল।

ঘুম ভাঙ্গলে দেখি ভোর হবার বেশী দেরী নেই। প্রভাত রবির আগমণবার্তা যেন শুনতে পেলাম বহুদূর থেকে। সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই, আকাশের গায়ে রং এর ছোঁয়াচ লেগেছে—প্রাণ-মাতানো রং। কোথা থেকে আসে এত রং, রংএর ছটার বর্ণালী কে শেখায় নিত্যনতুন ভাবে? মনোহারী করে ক্ষণে ক্ষণে কে বদলিয়ে দেয় এমন চমকপ্রদ ভাবে? বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকি—রংএর পশরা অফুরন্ত, যদিও ক্ষণস্থায়ী বলা চলে। রং ও আলোর লুকোচুরি চলে বেশ খানিকক্ষণ। পরে ধিকি ধিকি তালে অরুণদেব রক্তবসন পরিত্যাগ করে উর্দ্ধে উঠতে থাকেন নয়ন ঝলসানো শ্বেতাম্বর পরিধানে। পট পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমে সূর্য্য কিরণ হয় প্রখরতর—আর সেদিকে তাকান যায় না। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ইহা হবে অগ্নিবর্ষী—আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি তাই, লীলা-ময়ের কলা কৌশল!

পথে "সিগনাল" অভাবে গাড়ী থামে বারে বারে—অবশেষে আসলাম "ভেলুরু" ষ্টেসনে। সেখানে না আছে চা—কাফি, না কিছু। বেলা ১১।৩০ মিনিটের সময়ে টুনি ষ্টেসনে খাবার দেবার জন্য বুক করি—জনপ্রতি ১ ৮৭ হিঃ টিকেট কিনে রেলওয়ে ভেণ্ডারের কাছ থেকে। পুণ্যতোয়া গোদাবরীর উপরে বিরাট সেতু অতিক্রম করি। ভাবি কত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এই গোদাবরী তীরে। ইতিহাস, পুরাণ তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু আজও সেসব লোকাচার, নিয়ম নীতি এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। আগামী কালে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বা উল্টো হয়ে যাবে তা হলপ করে কেহ বলতে পারেনা। কালের আবর্ত্তে সবই সম্ভব। দশটার সময়ে গাড়ী থামল সম্বলপুর—এখানে ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করছিল বড় বড় পেয়ারা (আমরুত)—প্রতিটী ১৫ পঃ, মোসাম্বির ও কমলালেবু প্রতিটী ২৫ পঃ হিসাবে। ঘনকলকাকলীর মধ্যে "কাবে

কাবে” ধ্বনিটাই প্রবল, অবশ্য চিনাবাদাম, পাকোড়া, মিকচার, ইড়েনীর (ডাব) ইত্যাদি ও আছে। রেললাইনের দুধারে তামাক, যব, অড়হর ও ধনেগাছ, মাঝে মাঝে তালকুঞ্জ। ষ্টেসনের সন্নিকটে বস্তি অনেক—তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা যে গুরুতর, তা সহজেই অনুমেয়। তাদের মলিন ছিন্নবেশ, আবাসিক পরিস্থিতি তাহাই সপ্রমাণ করে। লালমাটি ও পাথরের ছড়াছড়ি—বেরসিক মনকে ও রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায় যেন। মেলট্রেন দ্রুত ছুটে চলেছে—ছোট ছোট বহু ষ্টেসন পার হয়ে যায়, যেমন, হামশরাম ববিবলি, পার্ব্বতীপুরম্ ইত্যাদি। এদিকটায় মনে হয় তালগাছের প্রাচুর্য্য রয়েছে। জানিনা মনকে রাঙ্গাবার কাজে স্থানীয় তাল-রসের অবদান কতখানি! স্থানে স্থানে চ্যুতবৃক্ষের সমারোহ বাংলা মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বৃক্ষনিচয় সযত্নে বর্দ্ধিত, পরিস্কৃত ও যথোপযুক্ত ভাবে বারিসিঞ্চিত ও বটে। সুফল প্রসবিনী বলেই এত আদর যত্ন ও সম্মান মনে হয়। টুনিতে প্রায় ১১।৩০ মিনেটের সময়ে আমরা ভোজন সমাধা করি। বেলা ১।৩০ মিঃ এর সময়ে পৌছাই ওয়ালটেয়ার—সেখানেও কেহ কেহ “মিল” নিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রী আম্বুলীর সাথে হঠাৎ দেখাহয় এখানে—কয়েক মিনিটের জন্য; মনটা খুসীতে ভরে গেল (বিদেশে আত্মীয়—বন্ধুর দর্শন সহজলভ্য নয়)—আর পুণরায় তার অদর্শনে তেমনি বিষাদাক্রান্ত হল মন। অনেকক্ষণ যেন তার চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। এই ওয়ালটেয়ার ষ্টেসনে আমাদের গাড়ীর ইঞ্জিন বদল হয় পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। মাদ্রাজ থেকে এতক্ষণ আমাদের বগীছিল (III শয়নকক্ষ) যাত্রীগাড়ীর মধ্যে প্রথম গাড়ী; আর নূতন ইঞ্জিন উল্টাদিকে লাগার ফলে আমাদের গাড়ী হল যাত্রীগাড়ীর মধ্যে একদম শেষ গাড়ী। এবার নূতন পথে চলল গাড়ী, ভায়া ভিজিয়ানাগ্রাম, টাটানগর।

আমাদের কোচের ভিতরে ভিন্ন অংশে ছিল একজোড়া যুবক-যুবতী ও তাদের মাতা—কলিকাতা যাত্রী। এই তরুণ যুগল ছিল মনে-প্রাণে, চলনে-বলনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে সত্যই যৌবনোচ্ছল।

সরম-রাঙা কৃষ্ণ-কালো চোখ—আর মিষ্টি মুখের ঝর্ণা-ঝরা হাসি, ঢেউ দোলানো কোমর-ঝোলাবেণী সব মিলিয়ে প্রাণে আনে এক অসীম উন্মাদনা। সর্ব্বদাই মৃদুমধুর গুঞ্জরণে, মায়ের অগোচরে একে অন্যের একটুখানি প্রেমের পরশ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। চাপা হাসি চোখে ও মুখে—সর্বদাই যেন আরো নিবিড় ভাবে পরস্পরকে কাছে টেনে নিতে চায়—যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে। জানিনা একেই পুণ্য প্রেমের পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী ধারা; মদির স্বপ্নের মধুমাখা সমীরণ, সোহাগের সুরভি মাখা, বলব কিনা! মা পাশেই ঘুমে কাতর, অথবা সব বুঝে শুনেই ঘুমের ভান করে পড়ে আছেন—আর এরাই শুধু কপোত-কপোতী যথা "বক্‌বকম্-কুম্"। গাড়ীর অনেকেই আড়নয়নে ওদের মাঝে মাঝে দেখতেন, ওদের তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এক জনের বাথরুমে যাওয়া ও অপরে তাকে যথাসাধ্য সঙ্গোপনে যাওয়া—আসার সাহায্য করার ও ভিতরে বিশেষ অর্থ আছে! সারারাত না ঘুমাবার ফলে বেশ বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় ছিল এরা বোধকরি জাগরণের ক্লান্তি অপনোদন প্রয়াসে। কোথায় যেন পড়েছিলাম উদর চায় আহার, পেট পুরে আহার, কিন্তু তার সাথে রসনা চায় আস্বাদন। পেটপুরে আহারে ও তৃপ্তি বা আনন্দ হয়না যদি তার সাথে আস্বাদ না পাওয়া যায় (অর্থাৎ মধুর স্বাদযুক্ত না হয়)। তেমনি দেহ চায় দৈহিক মিলন, প্রতি অঙ্গের নিবিড় মিলন; কিন্তু তারসাথে মন চায় একটু প্রাণের পরশ। এই প্রাণের পরশ (বা সত্যিকার ভালবাসা) না পেলে দৈহিক মিলনেও পুরোপুরি তৃপ্তি বা আনন্দ হয়না। এদের চোখমুখ দেখে অবশ্য বুঝেছিলাম এরা প্রাণের পরশ ও ভৌমানন্দ দুইই পুরোপুরি পেয়েছে। কতবিন্দু কতকিছু দেখা যায় রেলগাড়ীর লম্বা সফরে!

রেলগাড়ী ছুটে চলেছে—দুধারেই এবার পাট পচার গন্ধ। কোথাও লাইনের পাশেই পাট ভিজান আছে ডোবা / নালায়। পাটকাঠি সারি দিয়ে রাখা হয়েছে ছোট ছোট তাঁবুর ঢংএ। মাঝে মাঝে ইক্ষুচাষ বা ধানচাষও বেশ আছে। ধান প্রায় পেকে

এসেছে—সোনার রং ক্ষেতগুলি সত্যি নয়নাভিরাম। অদূরে আবছা-কাল পাহাড়গুলি ছবির মত সাজান মনে হয়। আর তার পিছনে কৃষ্ণ-নীল আকাশ—সবগুলি মিলে এক অভিনব পরিবেশ। মানুষের আঁকা ছবি এর কাছে কিছু নয়—পরম নিপুণ শিল্পীর কাজও লজ্জায়-সম্ভ্রমে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাবে এখানে। আসা-যাওয়া নিয়েই সংসার—আমরা সবাই জানি। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব আমরা—সব দেখেও যেন কিছু দেখিনা বা বুঝতে পারিনা। আমাদের গাড়ীতেও তেমনি কতলোক আসছে—যাচ্ছে। কেহ আমাদের সাথে উঠে আগেই নেমে গিয়েছে—২।৪ জন এখনও আছে। আবার কেহ কেহ পরে উঠে ইতিমধ্যেই নেমে গিয়েছে কেহ অল্প পরে নামবে বা কেহ কেহ আমাদের সাথে শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে নামবে। এরই ভিতরে আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব বা ভালবাসা। বিভিন্ন জীবন, ভিন্নতর মতবাদ এবং বিচিত্র ভাষা ও পোষাক পরিচ্ছদ। গাড়ীতে আমরা সবাই "সাময়িক" আর পৃথিবীতেও তাই, তবে হয়তো গাড়ীর চেয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী, তবে চিরস্থায়ী নয় কোনমতেই। চিরস্থায়ী বা চিরন্তন যাহা তাহা পাবার আগ্রহ যেন নেই কাহার ও—পরম সত্যের প্রতি এত অবহেলা অচৈতন্যেরই নামান্তর—মোহগ্রস্ত হলে যাহা হয় তাহাই। তবুও যখন ক্ষণিকের জন্য মনে আসে সেই ভাব, তন্মুহূর্ত্তেই সকল সম্ভাব্য উপায়ে—অপরাপর প্রবৃত্তি বা ভাব মন থেকে ধুয়ে মুছে পরম করুণাময় নিত্যসত্য পরমেশ্বরের লীলাকীর্ত্তণ বা নিভৃতে নামজপ-ধ্যান ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করতে হয়—চিরস্থায়ী ও চিরন্তন সত্যের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করতে হয় মনে-প্রাণে। ছোটবেলায় পড়েছিলাম "নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ"? উত্তর "মহাদেবের জটা হইতে"। এখানেও আমরা কে কোথা হতে আসি, কোথায় যাই? সবাই আলাপ-পরিচয় করেন কিন্তু পরম করুণাময়ের কৃপায় আমরা যে এধরায় আসি ও যাই—সেবিষয়ে কেন অবধান করিনা? বিপদে পড়লেই শুধু বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনের নাম মুখে আসে, সম্পদ বা সুখের সময় নয়। দীনান্তেও তাঁকে একবার শ্রদ্ধার

সহিত স্মরণ করি কি ? ভোগ-সুখ রূপের ক্ষণিক আনন্দ আমাদের চিরশান্তিরূপ পরম সত্যকে, আত্মার স্বরূপকে একেবারে ভুলিয়ে রেখেছে—অল্পের আশায় বৃহতের প্রতি ভুল বা অবজ্ঞা আর কি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা আবার মনে পড়ে। তিনি বলেছেন ভগবান ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে—"ঐশ্বর্য্য তুদিনের জন্য, ভগবানই সত্য। বাজীকর আর তার বাজী। বাজী দেখে সব অবাক, কিন্তু সব মিথ্যা। বাজীকরই সত্য, বাজী মিথ্যা।"

সুউচ্চ না হলেও উন্নতশির পাহাড়গুলি যেন সারিবদ্ধভাবে রেললাইনের অদূরে দাঁড়িয়ে আছে—ভগবানের মহিমা ঘোষণার জন্য। মাঝে মাঝে তুএকটা অতিবৃহৎ শিলাখণ্ড এমনভাবে বেঁকে বা ঝুঁকে আছে যেন অনতিবিলম্বেই উহা প্রলয় ঘটাবার জন্য কাহার ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষমান। একবার স্থানচ্যুত হয়ে গড়াতে আরম্ভ করলে তাকে রুখবে কে ? সুদূরে উন্নত গিরিশৃঙ্গ ঘনকৃষ্ণবর্ণ, যেন দিগন্ত রেখার সাথে মিশে গিয়েছে আস্তে আস্তে। সমুদ্রে যেমন ঢেউএর পরে ঢেউ, অবিরত ঢেউ, এখানেও তেমনি পাহাড়ের পরে পাহাড়, তারপরে পাহাড়, এর যেন শেষ নেই। নিকটে মাঠের ভিতরে তালগাছের সারি—অদ্ভুত মনে হয় এই পরিবেশে। সোনার বরণ ক্ষেতের মাঝে বক ও টিয়াপাখীর আনাগোনা, মাঝে মাঝে পাটপচা গন্ধ, বাংলা মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ যেন বাংলা মায়ের শস্যশ্যামল প্রান্তরের একটী অংশ বিশেষ।

সকালে জানলার পাশে বসে রৌদ্রসেবনে তৎপর ছিলাম ; গাড়ী অনবরত চলেছে এঁকে বেঁকে। বৈকালেও সেই জনালার পাশে বসে রৌদ্রতাপ বেশ লাগছিল – শীতের মৃত্যু আমেজে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হল তাই ভাবছিলাম। পূর্ব্ব-পশ্চিমে কি একাকার হয়ে গিয়েছে ? আসল কথা, প্রাতে আমাদের গাড়ী উত্তরদিকে যাচ্ছিল, তাই পূর্বদিকের তপনতাপ আরামে অনুভব করি—আর ওয়ালটেয়ারের পরে শুধু ইঞ্জিন পরিবর্ত্তন নয়, দিকপরিবর্ত্তন করে গাড়ী চলতে থাকায় বৈকালে আমরা পশ্চিমের সূর্য্যও পাই একই জানলার পাশে। গাড়ী চলছিল বেশ মন্থরগতিতে উপরদিকে,

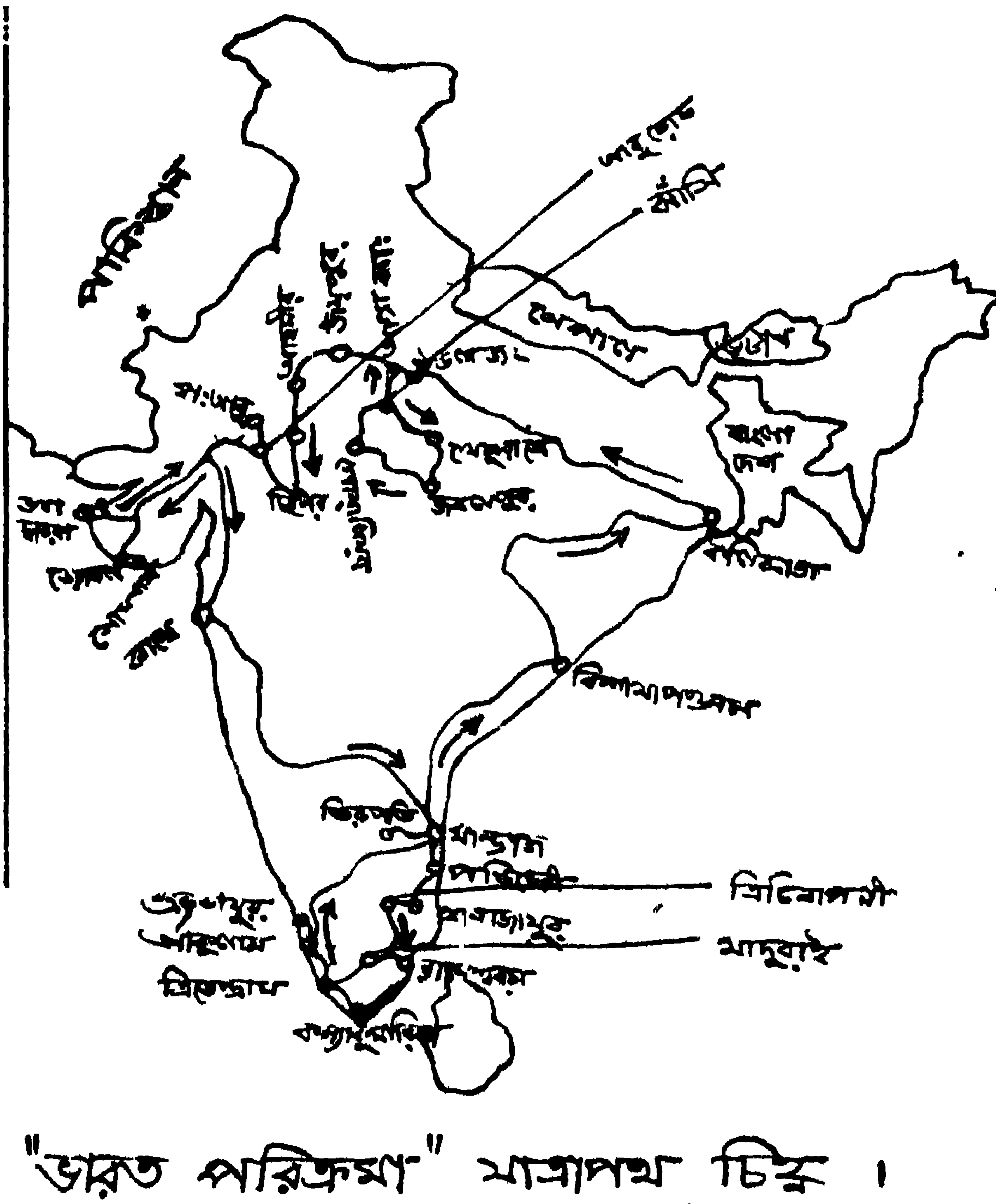

"ভারত পরিক্রমা" যাত্রাপথ চিহ্ন।
(কোন স্কেল অনুযায়ী নহে)।

পাহাড়ের কোল বেয়ে। বনফুলের গন্ধে প্রাণে একটা সরল আমেজ জাগে, কখনও বা তীব্রগন্ধের অনুভূতি যেন চাঞ্চল্য আনে মনে। বিচিত্র এই সৃষ্টি, আর কত বিচিত্র এই সংসার। সন্ধ্যায় রায়গড় ষ্টেসনে পৌঁছাই, নৈশভোজ এখানেই। ছোট পাহাড়িয়া নদীর উপরে সেতু পার হয়ে যায় আমাদের লৌহদানব উদ্দাম গতিতে। বিরাট বড় গাড়ী, বিরাট যেমন যাত্রীসংখ্যা, তেমনি বিরাট তার গতিপথ ও আওয়াজ। নিত্যকার পথে না গিয়ে ঘোরাপথে, ভায়া ভিজিয়ানাগ্রাম—টাটানগর, যাবার কারণে পথ আরো দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে। গত ২৯শে অক্টোবর তারিখে খুড়দা রোডের নিকটে রেললাইন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে—যাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা সম্ভব হয়নি এবং তাই এই অবস্থা। প্রত্যূষে ৫।২০ মিনিটের সময়ে টাটানগর ষ্টেসনের হৈ-হুল্লুরে নিদ্রাভঙ্গ হয় যাত্রী ওঠানামা ছাড়াও ফেরিওয়ালাদের চীৎকার, চায়-কাফে, পান-বিড়ি-সিগারেট, ইডলি-ধোসা, পুরিগরম, ইত্যাদিতে বেশ সরগরম এই ষ্টেসন। এখান থেকেই কাফির চাহিদা কম, আর তেমনি চা-এর চাহিদা বেশী মনে হল। লালমাটীর দেশ যেন যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ উধাও গালুডির পরে—মনে পড়ে গেল আবার বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার মধু, বাংলার ফল……অপরূপ শস্যশ্যামল ধরিত্রীর অপরূপ শোভা অনবদ্য, অতুলনীয়।

প্রাতকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতরাশ, (চা, বিস্কুট, কলা, পাকোড়া ইত্যাদি সহযোগে)। রৌদ্র বেশ আরামপ্রদ বোধ হচ্ছিল, জলটা তেমন ঠাণ্ডা না হলেও ঠাণ্ডাই বটে। রাত্রে খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে একবার যেন টের পেয়েছিলাম। রাস্তার ধারে কোন কোন নীচু জায়গায় তার প্রমাণ এখনও রয়েছে। সকালের আবহাওয়া বেশ নাতিশীতোষ্ণ, মেজাজ সরিফ করে দেবার মত। আমাদের ভারতপরিক্রমা এবার শেষ। খড়্গপুর ছেড়ে জকপুর মাধপুর, ভোগপুর, ইত্যাদি ছেড়ে কোলাঘাটে রূপনারায়ণ পার হয়ে আমরা অবশেষে হাওড়া পৌঁছাই দুপুরে ১২।৩০ মিনিটের সময়ে, বুধবার ইংরেজী ২০শে নভেম্বর। অলমিতি বিস্তারেণ !!

কাঠমাণ্ডু (নেপাল)

বহুদিনের বাসনা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও একরকম হঠাৎ ঠিক হল আমরা নেপাল বেড়াতে যাব। তদনুযায়ী ১৭ই ফেব্রুয়ারী মিথিলা একসপ্রেসের "থ্রিটায়ার স্লিপার কোচে" চড়ে রওনা দিলাম রাত্রি ৯।৩০মিঃ এর সময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে। (ভাড়া জনপ্রতি ২৩·০০+৪·৫০ পয়সা মোট ২৭·৫০ পয়সা হাওড়া থেকে রকসৌল—ভায়া সমস্তিপুর)।

১৮ই তারিখে ঘুম ভাঙ্গল মধুপুর ষ্টেশনে। "বেড-টি" পর্ব সাড়া এখানেই। শীতের আমেজে এই বিশেষ পরিবেশে ঘুম-জড়ানো চোখে চা-পান এক অপূর্ব ব্যাপার। প্রাতরাশ হয় কিউল জংশন ষ্টেশনে প্রায় ৮।৪০মিঃ এর সময় লুচি-তরকারী, জিলিবী সিঙ্গারা ও চা সহযোগে। গাড়ী যেন আর ছাড়েইনা—প্লাটফরমে নেমে ইতস্ততঃ পায়চারি করি। এখানে শ্রীকল্যাণ ঘোষের দেখা পাই; অনুরোধ এড়াতে না পেরে পুনরায় আমরা সবাই জলযোগ করি গাড়ীতে বসেই। সমস্তিপুর পৌছাবার পূর্বেই আমরা দ্বিপ্রাহরিক ভোজন পর্ব সমাধা করি (গরম গরম মুগডাল, ভাত, বেগুন ভাজা, তরকারী ও চাটনী)। সমস্তিপুর পৌছাই প্রায় ১১টার সময়ে—এখানে মিটার গজের গাড়ীতে আরোহন করি প্রায় দুঘণ্টা পরে—উদ্দেশ্য রক্সৌল (?)—দুঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যায়। ফিরে যাবার "রিজার্ভেশন" এখানেই করে নেই (২০ ডাউন, মিথিলা একসপ্রেস) ২৪।২ তারিখে সমস্তিপুর থেকে হাওড়া পর্য্যন্ত। মিত্রবাবুর সহৃদয়তায় জনপ্রতি ৫্ টাকা হারে অতিরিক্ত দেওয়ায় উহা সম্ভব হয়েছিল। মুজাফ্ফারপুর পৌছাই বিকেল ৪ টার সময়ে। চা-বিস্কুটে আবার যেন খুসীর আমেজ টের পাই। কলা, পেয়ারা, সন্দেশ, চানাচুর সবাই মিলে সানন্দে গ্রহণ করি। আমাদের "ফ্লাস্কে" জল ভরে নেই এখানে। অবশেষে গাড়ী ছাড়ে

ছাড়ে বেশ দেরী করে ৫।৩০ মিনিটের সময়। নৈশভোজ গাড়ীতেই হয় প্রায় ৭ টায়।

দুর্ভোগের রাত—সাগাউলি ষ্টেশনে থামে রাত্রি ৮।৩০ টায়—এখানে আবার গাড়ী বদল করতে হয় রকসৌল যাবার জন্য। গাড়ী আসে রাত্রি ১২।৩০ মিঃ এর সময় এবং ছাড়ে পরদিন প্রাতে (১৯ শে ফেব্রুয়ারী) ৫।৩০ মিঃ। প্লাটফরমের বাইরে নিজেদের মালপত্র সহ পড়ে থাকা এই অসম্ভব শীতের হাওয়ার ভিতরে—অচেনা নূতন জায়গায়—এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আলো-আঁধারিতে বিদেশ—বিভূঁই এ প্রায় নিশব্দ প্রান্তর—রজনী দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত—কল্পনা করতেও ভয় হয় মনে। যাক, রাত্রিশেষে গাড়ী ছাড়ে "রক্সৌল" অভিমুখে। রক্সৌল পেঁছাই প্রাতে ৮ ঘটিকায় সময়। প্রাতরাশ সমাধা করি চা-নিমকি-ডিমসেদ্ধ-মাছভাজা-মুরি সহযোগে ষ্টেশন প্রাঙ্গনে। টাঙ্গায় করে রওনা হই ৮।৫০ মিঃ। বীর-গঞ্জের বাসষ্টেশনে পৌছাই প্রায় একঘণ্টা পরে—স্বল্প পথের ভিতরেই "চেকপোষ্টে" নানা লুকোচুরি খেলার পরে। নেপাল প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেককে এসময় বসন্তের টিকা ও কলেরার ইনজেকশন নিতে হবে। সভয়ে সবাই তাই টাঙ্গাওলার অযাচিত পরামর্শ সাগ্রহে মেনে নেই এবং কিছু অতিরিক্ত খেসারত দেই গোপনে (ভাড়া টাঙ্গাপিছু ৫৲+ ····)। বিপদ কখনও একা আসেনা কথাটা সব সময় মনে না থাকলেও ঠিক সময়ে মনে করিয়ে দেয়!! বীরগঞ্জে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুঘণ্টা পরে পৌছে দেখি "সাহা এণ্ড কোং'র" "রিজার্ভকরা গাড়ী" ১॥ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে কাঠমাণ্ডু রওনা হয়ে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করে শ্রী কল্যান ঘোষ অগ্রীম দেওয়া ৪০০৲ টাকার ভিতরে মাত্র ২০০৲ ফেরত পাবেন বলে জানা গেল। ঐ দিন যাত্রী বেশী থাকায় এই অসময়ে কোন বাস পাওয়া গেলনা—দূরের পথ, সরকারী নিয়মানুযায়ী রাত্রে গাড়ী চলেনা তবে আগামী শিবরাত্রি উপলক্ষে একমাসের জন্যে উক্তনিয়ম শিথিল করা হয়েছে শুনলাম।

আমরা কাঠমাণ্ডু যাব—এই সেই কাঠমাণ্ডু যে পুণ্যভূমি হিমগিরি

হিমালয়ের কোলে ৫৫০০ ফিট উঁচুতে পুণ্যস্রোতা বাগমতির পাশে অবস্থিত। বৃটিশ আমলেও আপন সার্ব্বভৌমত্ব অবিস্মরণীয় ভাবে অক্ষুন্ন রেখে মহামহিমান্বিত গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই হিন্দু রাজ্য। বিশ্ববিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় বিশেষ করে শিবরাত্রির সময়ে—এই একদা মধ্যযুগীয় সহর বর্ত্তমান যুগের রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা ও সভ্যতায় কত উন্নত তা চাক্ষুষ না দেখলে প্রত্যয় হয়না। নিজস্ব জৌলসে যেন কাঠমণ্ডু আজ বিশ্বমাঝে আপন সম্মোহন শক্তিতে ভরপুর। কলিকাতা থেকে রেলপথে পাটনা এবং সেখান থেকে আকাশ পথে কাঠমাণ্ডু যাতয়াতই বোধ হয় ভাল নানাকারণে, তবে পয়সার কিছু সাশ্রয় হয় কলিকাতা থেকে রেলপথে সমস্তিপুর হয়ে রকসৌল এবং সেখান থেকে টাঙ্গা—বাসযোগে কাঠমাণ্ডু গেলে। বাগমতি নদীর পাশে রাজধানী সহরে দর্শনীয় বস্তু আছে বহু—নজর কেঁড়ে নেওয়া সৌধশ্রেনী, রম্যসম্ভারে পূর্ণ বিপনি নিচয়, পশুপতিনাথের মন্দির, গুহ্যেশ্বরী মন্দির, রাজপ্রাসাদ, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বাইশধারা, বৌদ্ধমন্দির, রত্নাপার্ক ইত্যাদি। এই সুপ্রাচীন মহান নগরীতে পা দিয়েই বুঝেছিলাম যে এ শুধু স্বপ্ন দিয়েই তৈরী নয়—স্মৃতি দিয়েও ঘেরা। পথের ক্লান্তি ভুলে একবার এলে বোঝা যায় আনন্দ পাবার খোরাক এখানে কিছু কম নয়। ছোট বড় হোটেল ভর্ত্তী—দেশী বিদেশী লোকের আনাগোণা ও কম নয়। কম সময়ের মধ্যে ঘুরে দেখতে গেলে "গাইডের" সাহায্য নিতান্ত দরকার। সরকারী টুরিষ্ট আফিস আছে—তারা বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য সবকিছু নিয়ে তৈরী—নিজেদের প্রয়োজন ও সময় তালিকা প্রকাশ করলে তারা সব বন্দোবস্ত করে দেয় সানন্দে। দারজিলিং, শিলং, সিমলা যদি পর্ব্বতের রাণী হয় তবে কাঠমাণ্ডু নিশ্চয়ই রাজা হবার যোগ্যতা রাখে।

যাক, বীরগঞ্জ বাস ষ্টেসনের সন্নিকটে "অমর হোটেলে" আমরা মাছ-ভাত-দহি খাই স্নানাদি সমাপন করে। ভোজন দক্ষিণা নেপালী মুদ্রায় জনপ্রতি ৪২০ (ভারতীয় মুদ্রা ৩·২৫)।

কমলালেবুর দাম খুব বেশী মনে হল—ছোট সাইজের ৩টির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ১৲ (নেপালী মুদ্রা ১.৩৮ পয়সা)। রাস্তার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বিশ্রাম দরকার ; আবার কাঠমাণ্ডু যাবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা ও দরকার। আমরা কয়েকজনকে "যেন তেন প্রকারেণ" বাস সংগ্রহ করতে হবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব কাঠমাণ্ডু পৌঁছাতে হবে এই পরামর্শ দিয়ে বাকী ক'জন অমর হোটেলের দুখানা কামরায় একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা নিলাম। কিন্তু হায়, অদৃষ্টে সইলোনা! সবে কম্বলপেতে একটু গা দিয়েছি অমনি খবর এল—গাড়ী এসে গেছে—চটপট সব !! জনপ্রতি অতিরিক্ত ৫৲ টাকা দিতে হবে ; সারারাত গাড়ী চলবে, ভোর হবার প্রাক্কালে গাড়ী কাঠমাণ্ডু পৌঁছাবে। পূর্ব্ব পরিকল্পনানুযায়ী বৈকালে না পৌঁছে এবার পৌঁছাবার কথা শেষরাত্রে! পাঞ্জাবী বাস ড্রাইভারের করুণায় অবশেষে আমরা কাঠমাণ্ডু পৌঁছাই পথে কোন বিভ্রাট না ঘটিয়ে। রত্না পার্কের সন্নিকটে "কেশরী লজের" চারতলার ৮ নং কামরায় আমাদের জায়গা হল—সাতটি বেডে নয়জনের (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ঘরের দুমাথার বেডে দুজন করে চারজন আর মাঝখানে ৫টী বেডে ৫ জন—আমি উত্তরদিক থেকে দ্বিতীয় বেড পেলাম—কামরার দরজা একেবারে দক্ষিণ দিকে। ঘরটীতে জানালা আছে যথেষ্ট—পূর্ব্ব-পশ্চিমে মোট ১০টী বড় জানালা। শয্যা নিলেও ঘুম এলনা—নানাকারণে। নূতন পরিবেশ, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমার স্নেহালোকের আবেশে, আনন্দঘন মূহুর্ত্ত অতি নিকটবর্ত্তী বলেই যেন সময় অতি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। নীচে পরিচারকদের সাড়া পেয়ে ছুটে এলাম—গরম জামা ইত্যাদি চড়িয়ে। জমাদারনী আমার মুখে নেপালীকথা শুনে প্রথমটায় হতচকিত। এখানে কাজে জমাদারনী হলেও চেহারায় কিন্তু রাজরানী-যেমন রং তেমন গড়ন। তাকে অনুরোধ জানালাম ভোর হবার পূর্বে অর্থাৎ সবাই উঠে ভীড় করার আগে আমাকে এক বালতি গরম জল যোগাড় করে দিতে—স্নানের জন্য। এখানেই হোক বা অন্য কোন হোটেল থেকে একবালতি গরমজল এনেদিলে

ভাল বকশিষ দেবো। কথায় কথায় জেনে নিলাম—তার পরিবারের কাঠামো, বাড়ীর নিশানা আয় ব্যয় ইত্যাদি। সে থাকে স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে—দুটী হোটেলে সকালে-বিকালে কাজ করে। স্বামীও তাই, তবে অন্যত্র। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় মেয়েটী স্কুলে পড়ে—তাকেও দেখেছি পরে উঠতি বয়স, চোখদুটী যেন যাদুজানে, বেশ রসিয়ে কথা বলতে ও পারে ; ছোটরা বাড়ীতেই একটু একটু পড়ে। জমাদারনী নিজেই কাগজ ও কাঠ-কুটো যোগাড় করে আমার জন্য একটা বড় ডেকচি করে জল গরম করে দিল—অনেক ধন্যবাদ জানালাম—কিছু নগদ বকশীষ সহ। সে আমাকে তারপরদিন তাদের বাড়ী যাবার জন্য অনেক অনুরোধ জানাল—আমিও নেপালী ভাষায় উত্তর দিলাম যতটা সম্ভব নেপালী প্রথায়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতার" পটভূমি শিলং বা সিমলা, কাঠমাণ্ডু বা উটাকামাণ্ডু জানিনা তবে এটা জানি পার্ব্বত্য শহরের নিরলস হাতছানি সমতলবাসীদের নিরন্তর আকর্ষণ করে। এই শহর (৫,৫০০ ফিট) দেখবার দুর্ব্বার আগ্রহ তাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। যখন যাওয়া ঠিক হল, তখনই একটা অতিরিক্ত "ভাললাগা" আমেজ আমার হৃদয়পটে সংযোজিত হয়। পাহাড় ঘেরা সুন্দর রাজধানী শহরটা যতই বেড়িয়েছি, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি ততই। "ইউক্যালিপটাস" ও দেবদারু গাছের মধ্যদিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গিয়েছে, পথের দুধারে নাম-না-জানা নানাবর্ণের পাহাড়ী ফুল। একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য মনে আছে—একটা "ইউক্যালি-পটাস" গাছে দুটো কাঠবেড়ালী—একটা অপরটার মুখে খাবার পুরে দিচ্ছে। নূতন নূতন পরিবেশে নূতনতম আনন্দের শিহরণ জাগায় প্রাণে—এই বৃদ্ধ বয়সেও। চারিদিকের মনলোভা সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপথকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই অতিপুরাণো রূপকথার রাজপুত্রের প্রাণভোমরা যেমন কৌটার মধ্যে বদ্ধ ছিল এতদিন, তেমনি আমার হৃদয়টাও যেন কোন ভারী সিন্দুকের মধ্যে আটকা পড়েছিল এতদিন—হঠাৎ যেন মুক্তির স্বাদ পেয়ে অনাবিল আনন্দে

মেতে উঠেছে। এ পৃথিবীর সমস্ত স্বাদ ও গন্ধ, সমস্ত সুখ ও যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দে পুনঃ মগ্ন হতে চায় মন! বিবাগী মন উদাসীন না হয়ে পুনরায় মায়াময় সংসারে উঁকি মারতে আরম্ভ করে। আনন্দের জোয়ারে যেন হৃদয়ের দুকূলে প্লাবন দেখা দেয়!! যতটা সম্ভব বৃদ্ধ বয়সে মনের আনন্দের খবর আর কাউকে দেইনা। আর একটা কথা—দুটো চোখ দিয়ে কি সব কিছু দেখা যায়, নাকি সব সময় দেখা যায়? হৃদয়-মন চোখের সঙ্গে সাহায্য করলেই সেই পরম উপলব্ধি হয়, তাইনা?

শিবরাত্রির দিন ২০শে ফেব্রুয়ারী। উপবাস আজ অনেকেই পালন করেন—আমিও করি। পুণ্যার্জ্জনে কিনা জানিনা তবে বরাবরই করি কিনা তাই। স্নানাহ্নিক সেরে ট্যাকসি করে আমরা যাই বাবা পশুপতিনাথের মন্দিরে (নেপালী মুদ্রায় জনপ্রতি যাতায়াত ভাড়া লাগে ৬'৮০ টা)। সে কি বিরাট ভীড়—কোলাহল মুখরিত নগরপথ—আকাশে বাতাসে শুধু "জয় পশুপতিনাথকি জয়"। পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণে নিয়ত—দিবারাত্রি অতন্দ্র পাহারায় কর্ত্তব্যরত। তবে দেশী-বিদেশী স্ত্রীপুরুষের সমারোহ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, সম্যকভাবে বলা যায়না বা বলে শেষ করা যায়না। মন্দিরাভ্যন্তরে পশুপতিনাথের চারিদরজায় বাবাকে দর্শন করে ধন্য হলাম—পথশ্রম সার্থক মনে হল। আবার একদিন আসব মনস্থ করে ভীড়ের চাপে আপনিই ফিরে এলাম মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে। পথেই শুনলাম যে এক বৃদ্ধা মহিলার ১৯০০ টাকা এবং আর একজন যাত্রীর নগদ ৪০০ টাকা কোমরের কাপড় কেটে "পকেটমার" হয়েছে এবং আরো অনেকের গিয়েছে এবং যাবে। সশঙ্কিত চিত্তে সাবধান হলাম আমরা সবাই আর সঁপে দিলাম সব অদৃষ্টের হাতে। যাক বাসায় ফিরে কেশরী লজের বাইরে "নেপাল ব্যাঙ্ক" থেকে ২০০ ভারতীয় মুদ্রা নেপালীমুদ্রায় বদল করে নিলাম—পেলাম ২৭৮। প্রত্যেক ছোটবড় নোটেই নেপালের মহারাজার প্রতিকৃতি ছাপানো আছে। অবশ্য প্রত্যেক দোকানেও মহারাজার ছবি সযত্নে টাঙ্গানো আছে দেখেছি। আমরা আবার একটী ট্যাক্সী

করে রওনা হলাম (সময় ১১ টা থেকে বৈকাল ৫ টা পর্য্যন্ত মোট জনপ্রতি খরচ টাঃ ৩২_) নিম্নলিখিত দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন মানসে—

১। নীল কণ্ঠেশ্বর,

২। স্বয়ম্ভু ভগবান,

৩। বালাজী,

৪। বুদ্ধ মন্দির,

৫। ভকতপুর,

৬। পাটন (কৃষ্ণমন্দির) ও

৭। বাইশধারা।

"বাইশধারা"র কথাটাই আগে বলি। অপরূপ এর রূপ-তুলনা যার নেই। মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনও দেখেছি কিন্তু এই পুরানো মধ্যযুগীয় শহরে কেমন করে এত সুন্দর জিনিষের সৃষ্টি হল ? শুনলাম যে এখানে "হরেকৃষ্ণ হরেরাম" ছবির অনেক "আউটডোর" সুটিং হয়েছে। হ্যাঁ, মনোরম ঝর্ণার বর্ণাঢ্য দৃশ্য, ধনাঢ্য রুচিবানের শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। রঙীন মাছের তলাউ বা পৃথক জলাশয়ে বৃহদাকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাছের একত্র সমারোহ এভাবে আর কোথাও দেখিনি। পুষ্পলতায় আচ্ছাদিত মনোরম নিভৃত কুঞ্জনিচয়, আরামদায়ক পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মনে দোলা জাগায়। ছোট ছোট রাস্তা চলে গিয়েছে পাইন ও দেবদারু বনের মধ্যদিয়ে—মহর্ষি কথিত বনভূমি বা তপোবনসম এ জায়গাটা তাই অতি চৎমকার। যেতে যেতে আমরা একটা সুন্দর ঝর্ণার সামনে এসে একটা বড় পাথরের উপর বসে পড়ি। দুচোখ ভরে পরম তৃপ্তিতে প্রকৃতির অকৃপণ হাতের রূপসুধা পান করে প্রাণে আসে খুসীর জোয়ার—আর বন্ধুবর গেয়ে ওঠে—

"হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে"

তন্ময় হয়ে শুনলাম—আকাশে বাতাসে ছড়ানো দরদীগানের সে সুর !! সারাদিন ধরে অবাধ খুসীর সঞ্চয় হৃদয়ে ধরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে ফিরি। একটা স্বপ্নময় মধুর স্মৃতির অনুভূতি নিয়ে আমরা ফিরি—

সেই মধুময় স্মৃতির রং আরো গাঢ় হয়েছিল রাত্রে স্মৃতির স্মৃতি চারণায়—না প্রকার আনন্দের পরিসমাপ্তিতে। রাত্রের আলো-আধাঁরিতে স্থানীয় শিল্পীগোষ্টীর নাচের আসরে যখন হোটেল প্রাঙ্গন বেশ জমজমাট, তখন কাহার ও সময় জ্ঞান ছিলনা—সবাই যেন একটা ভিন্ন জগতে একটা কিসের আবেশে মগ্ন ছিল।

পরদিন অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী ইচ্ছে করেই দেরীকরে শয্যা-ত্যাগ করি। আগে "বেড-টি" এবং ৯টার সময়ে যথোপযুক্ত ভাবে প্রাতরাশ সমাপন। সংক্ষেপে বলতে হয়—৯।৩০ মিনিটে স্নানান্তে প্রসাধন ও বেশ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। সবর্ব শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পট্টনায়ক ও অরবিন্দ দণ্ড সহ অতঃপর শহর পরিভ্রমণ।

বাজার থেকে "রেডিমেড" উৎকৃষ্ট পলিয়েষ্টার
১টী সার্ট=৪৯৲ টাকা
২টী সার্ট=৮৪৲ "
৫টী-ব্লাউজের জন্য
(২+২+১ গজ)
পলিয়েষ্টার ১০২৲ "
মোট ২৩৫৲ টাকা।

সংগ্রহ করি কিন্তু পরে সার্ট ৩টী ছোট হবে মনে হওয়ায় দোকানে ফিরে যাই এবং বড় সাইজ না পাওয়ায় টাকা ফিরিয়ে নেই। সঙ্গীরা অনেকে জামাকাপড় ছাড়াও বহুবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করেন -সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বোধ হয়, টাকার ব্যবস্থা থাকলে তারা ডিপার্ট-মেণ্টাল ষ্টোরের যাবতীয় জিনিষই কিনে ফেলতেন। কলিকাতার তুলনায় দামযে অনেক কম সে বিষয়ে কোন মতবৈষম্য নেই কিন্তু সীমান্ত চৌকী পেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা অনেক। সরকারী নিয়মানুযায়ী (এবং তদতিরিক্ত ও কিছু আছে) ট্যাক্স বা কর কোন কোন ক্ষেত্রে ১২০%, কাজেই কেনাকাটার দিকে নজর না দেওয়াই শ্রেয়। তবে হ্যাঁ, যেখানে কড়াকড়ি বেশী, সেখানেই রন্ধ্রপথে চোরাকারবারীদের পোয়াবারো। সুযোগ সন্ধান করে তারা বেশ ফলাও কারবার চালিয়েছে দেখলাম—"কষ্ট কল্লে কেষ্ট মেলে" কথাটা সত্য নয়কি ? যদি ও ঝকি বা কষ্ট অনেক আছে।

"রত্নাপার্ক" সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে প্রায় ৪০ মিনিট লেগেছিল আমাদের। নেপাল ইলেকট্রিক করপোরেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর, হেডপোষ্টাফিস্ ইত্যাদি দেখে ইন্দ্রচৌকের কাছে বড়রাস্তার উপরে "নেপাল কফি হাউসে" প্রবেশ করি। দোতলায় বেশ আধুনিক ভাবে সজ্জিত রেস্তোঁরা। বিভিন্নদেশীয় নরনারী বিচিত্র বেশে সজ্জিত হয়ে মশগুল এখানে। গরম-ঠাণ্ডা সবই পাওয়া যায়। এতভীড় সন্ধ্যাবেলা যে যাওয়া মাত্র টেবিল পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। সুবেশা তরুণীরা চটুল কটাক্ষ হেনে সহজেই অপরের লালসা জাগিয়ে তোলে; অন্তর জয়করে নিয়ে বোধহয় পকেট জয় করতে দ্বিধা বা দেরী করেনা। আমরা কেহ কেহ "সবজি—কাটলেট" ও লস্যি, আবার কেহ কফি ও কাটলেট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি একসাথে সবাই। কেশরী লজে ফিরে নৈশ ভোজ রাত্রি ১০।৩০ টায়; আর তারপরে শয়ন। কিন্তু "বিধি ঘোর বাম"! চোখে ঘুমের লেশও নেই যদিও দেহমন উভয়ই ক্লান্ত। আমাদের কামরায় বন্ধুরা পুনঃ পুনঃ ক্যাচ-ক্যাচ করে দরজা খোলা—বন্ধ করার শব্দে কি করে সত্যি ঘুমোয় তা আমার বুদ্ধির অগোচর। তবে কয়েকটী মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি ঐ রাত্রে। দরজা সংলগ্ন শয্যায় ছিলেন সুন্দরী চন্দ্রাদেবী (২০।২১) ও তার স্বামী (২৬।২৭)—একশয্যায় স্বামীস্ত্রী আমাদের ঘরে শুধু তা'রাই। জানি, সবাইর একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল এ'দের জন্য। তবে রমণীসুলভ সলজ্জ ব্যবহারের কার্পণ্য ও যৌবনোচ্ছল বরতনু আবরণীর স্বল্পতা সবাইর হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্ব্বসমক্ষে দিনে ৩।৪ বার বিচিত্র প্রসাধন ও পোষাক পরিবর্ত্তন [দামী আধুনিক স্বল্পবাস] তার কাছে যেন কিছুই নয় যদিও আর কেহ দিনমানে সর্ব্বসমক্ষে ঐরূপ বেশভূষা করতে বা প্রকট প্রসাধন করতে নিশ্চয়ই রাজী হতনা। আমাদের কামরায় আরো লোক ছিল যারা নিজেরা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় বিশেষকরে কাপড় বা কম্বল দিয়ে আব্রুতৈরী করে নিতেন দরকার মত। যাক, এবিষয়ে বোধ হয় অধিক কিছু না বলাই শ্রেয়।

বৈকাল বেলা হঠাৎ দেখা হল হাওড়ার কোনার বাবুর সাথে। অবাক হই খুব, অবশ্য খুসী হই মনে মনে তার চেয়ে অনেক বেশী। তার বিভিন্ন স্বাদের রসাল গল্পে অস্থির বোধ করি ; যেন বহুদিনের রুদ্ধজানালা হঠাৎ খুলে গেল আমার কাছে। কোনার বাবুকে এত প্রগলভ আর কোনদিন দেখিনি। চারিদিকে প্রাচুর্য্যের ইশারা এবং কোনার বাবুর উচ্ছসিত ভঙ্গি আমার যেন কেমন কেমন মনে হতে লাগল। ফেলে আসা জীবনটাকে ভোলা যায়না—জীবনের হারজিৎ কখন কোনদিক থেকে আসে কেউ কি বলতে পারে? জীবন-দর্শনের কথা বাদ দেওয়া যায়না ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের অমৃতোপম উপদেশ ভোলা যায়না=আর বাস্তব জগৎটাকে ও ভোলা যায়না—এটাই হল বড় মুস্কিল! কখন যে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গিয়েছে আপন মনে, কাহারও তা খেয়াল ছিলনা। বন্ধুবরের ইশারায় মোহ ভেঙ্গে গেল—আর ভাঙ্গলো আমাদের পথসভা। চারিদিকে বেশ কয়েকজন মনোযোগ সহকারে আমাদের আলোচনা শুনছিলেন। তারা এবার নিজ নিজ পথে অগ্রসর হলেন। গঙ্গার ইলিশ খেতে গিয়ে মড়িতে কাঁটা ফুটলে যেমন অস্বস্তি লাগে, ভাল লাগার মাঝখানে বেদনা বোধহয়, আমাদের মাঝখানে অপরিচিত কয়েকজনের উপস্থিতি ও ঠিক তেমনি অপ্রিয় লাগছিল আমাদের।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী অতিপ্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময়ে শয্যা-ত্যাগ করে যথারিতী "বেড-টী" সমাপন করি। ৮ টায় বের হয়ে ট্যাকসী করে প্রথমে গুহ্যেশ্বরী মন্দির আর সেখান থেকে পশুপতি-নাথের মন্দির এবং পরে সদলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। ট্যাকসীভাড়া ফুরণে জনপ্রতি ৩্ টাকা মাত্র।

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে (পীঠস্থানে) গিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের "যোগচক্ষু" খুঁজেছিলাম—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাইনি। সত্যিই, যার চোখদুটী সুন্দর তার সবই সুন্দর বা আরো ভাল করে বলা—যায় চোখদুটী সুন্দর সে সবই সুন্দর দেখে! গভীরভাবে চিন্তা করলেই অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টার-মশাইকে বলেছিলেন—যোগী বা সাধুর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে

থাকে অর্থাৎ সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা' দেয়--সব মনটা ডিমের দিকে থাকে—কিন্তু উপরে ভাস ভাসা ভাবে নামমাত্র চেয়ে থাকে। জ্ঞান-অজ্ঞান পাশাপাশি থাকে যেমন থাকে আলো-আঁধার। ঠিক প্রদীপের গোড়ায়ই ছায়া পড়ে অন্ধকার হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের একজায়গায় পড়েছিলাম--লক্ষণ বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রাম বলেছিলেন, ভাই এ আর আশ্চর্য্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। সবাইরই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হওয়া দরকার। পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটা কাঁটা খুঁজে আনতে হয়। সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তারপর দুটী কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা যোগার করতে হয়—তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়। আমার ও তাই প্রার্থনা যাতে আমি ঐ জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে পারি। জানি সংসারে থেকে দুকুল রাখলে তা সহজে হয়না, তবে তা'র ইচ্ছা হলে (বা তিনি কৃপা করলে সবই সম্ভব এ জগতে। বোধ হয় ভ্রমণ কাহিনী থেকে অনেক সরে এসেছি—চলুন ফিরে যাই পুরাণো কথায়!

বৈকালে দলের কয়েকজন বেড়াবার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখার মানসে কয়েকখানা ছবি তোলার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমি এই ব্যাপারে নেই পূর্ব্বেই জানিছিলাম, তবু সঙ্গী হতে হবে—অগত্যা রাজী। কিন্তু হঠাৎ একজনের অন্য কাজে বাইরে যেতে হল—আমি তা'র জন্য কেশরী লজের গেটে অপেক্ষমান থাকলাম। কথা হল, তিনি ফিরে আসামাত্র তাকে নিয়ে আমি রত্নাপার্কের পাশে মন্দিরের কাছে যাব—দলবল সেখানেই থাকবে। তার দেখা না পাওয়ায় আমি গেটের দোকানের সামনে শুধুই পায়চারি করছিলাম। উক্ত বস্ত্র ভাণ্ডারের মালিক মিঃ শ্রেষ্ঠ আমাকে ভেতরে বসতে দিলেন এবং অনেক আলোচনা হল তার সাথে, তিনি ও আমি দুজনায় রাস্তায় দাড়িয়ে অনেকক্ষণ—নেপালের সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনীতি উন্নয়ন পরিকল্পনা, শিক্ষা

ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা, রাজপরিবার—কিছুই বাদ গেলনা। প্রায় ১॥০ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আমি একাই রত্না পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে ওদের দেখা পেলাম—ফটো তোলার পরে প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে। আমি যা'র জন্য অপেক্ষা করছিলাম তার দেরী হওয়ায় তিনি "চোরবাট" অর্থাৎ "সর্টকাট" করে অন্যরাস্তা দিয়ে রত্নাপার্কে চলে গিয়েছিলেন শুনলাম।

জন্মদিন থেকে এই পৃথিবীর গতি এক। শরৎ-হেমন্তে শীত-বসন্তে তার রং বদলায় কিন্তু চাঞ্চল্য নেই। সুখে-দুঃখে সে অভিন্ন, উদাসীন ও নির্ম্মম। মা ধরিত্রীর এই চরিত্র তার সন্তানরা পায়নি। সুখ-দুঃখ শীত-বসন্তে তার রূপ আলাদা, চরিত্র ভিন্ন। তাইতো সে বিবর্ত্তন চায় প্রতিনিয়ত, প্রতিমূহুর্ত্তে। বিবর্ত্তন আসছে আসবে চিরকাল, যুগ যুগ ধরে আসবে। যেদিন বিবর্ত্তন আসবেনা সেদিন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলো মিশরের মমির মত শুয়ে থাকবে। সবাই একথা জানে, তবু হাহাকার, তবু অতৃপ্তি। সেই হাহাকার ও অতৃপ্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ ছুটছে—বিরাম-বিহীন হয়ে পাগলের মত ছুটছে। কিসের জন্য এই বুভুক্ষা—সেই আদিম কাল থেকে চলে আসছে চিরশাশ্বত অদম্য বুভুক্ষা দেহ ও মনে। না জানাকে জানবার আগ্রহ, না পাওয়াকে পাওয়ার চেষ্টা। কখনও শান্তভাবে কখনও রুদ্রভাবে তার প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানুষের প্রকৃতিই এই, অন্যরকম কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমাদের।

হোটেলে ফিরে দেখি গেটে অপেক্ষমান সেই জমাদারনী ও তার রূপসীকন্যা—তার স্বামীর অসুখ হয়েছে বলে বাড়ীতেই আছে এবং আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। খানিক পরে আবার আমাকে এখানে পৌছে দিয়ে যাবে বলল। আমি কেন জানিনা "বাজে" (অর্থাৎ বৃদ্ধ দাদু) সম্বোধনে মুগ্ধ হলাম—অবশ্য তাদের আচারে, ব্যবহারে, যথেষ্ট শালীনতা ও আতিথেয়তা ছিল, বিশেষ করে আমার মত বিদেশীয় অতিথির প্রতি। আমার নেপালী কথায় তারা সবাই খুসী—অনেকানেক কথাবার্ত্তা হল। নিকটস্থ দোকান

থেকে "ঘুমাকো রোটী" সহযোগে এক বট্‌কো চা-পানও হল। আমি "সরাব" খাইনা জেনে আর পীড়াপীড়ি করেনি তা গ্রহণ করার জন্য। জ্যেঠা (জমাদার) একটা মিশনারী মেয়ে স্কুলে চাকুরী করে; সেখান থেকে পাদ্রী মেমসাহেব মাঝে মাঝে দরকার মত তাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন--কখনও বা লিখে দিতেন কাছে না থাকলে, বাজার থেকে স্বল্পমুল্যে কিনে নিতে হত। প্রায় ছয়-মাস হল সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর কাছে এখন অন্য চাকুরী করে। প্রথম দিনেই জমাদারনী শুনেছিল যে আমিও কিছু ঔষধপত্র দিয়ে থাকি, তাই তার একান্ত অনুরোধে আমি একটা "প্রেসক্রিপশন" লিখে দেই। আজকেই কিনে এনে খাওয়াবে একডোজ, আর কাল দুইডোজ। জ্বর নিশ্চয়ই কমে যাবে, কোন ভয়ের কারণ নেই বললাম। (হঠাৎ জ্বর, ভয়, প্রবল পিপাসা, ঘর্ম্মহীনতা, নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত, লম্ফমান ও কঠিনস্পর্শ ইত্যাদি লক্ষণে "একোনাইট" বিশেষ ফলপ্রদ বা অব্যর্থ জানি ব'লে তাই দিলাম)। মা-বাবা, ছেলে-মেয়েরা সবাই আনন্দিত—"বাজের" সঙ্গে গল্পে মশগুল। আমিও খুশী তাদের ব্যবহারে। অনেকদিন আগে "ষ্টার" থিয়েটারে "দাবী" নাটক দেখেছিলাম--যার একটা গান আমার খুব ভাল লেগেছিল। সবপদটা মনে নেই তবু যতটা মনে পড়ে=

আকাশ আমি দেখতে পেলাম
অনেক দিনের পরে।
কুয়াসা ভরা লগ্ন এলে
সোনার আলো ঝরে॥
মন চেয়েছে খুসীর খেলা
স্বপ্ন নিয়ে প্রাণ ভরে।
রূপ-সাগরের ঢেউ লেগেছে
জীবন বালুচরে॥

আবার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক গেয়ে উঠলো সেই পুরানো গান যা' শুনেছিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে এক অধ্যাপক বন্ধুর মুখে=

ফুলেতে ধূলাতে প্রেম
হয়নাকো ফুলফোটার কালে।
ফুলফোটে তাই আকাশ মুখে
চাঁদের প্রেমে হেলে দুলে॥
ধূলা থাকে মাটীর বুকে
চরণতলে অধোমুখে।
ফুল ঝরিলে করে বুকে
এই লেখা তার আছে কপালে॥

যাক, ভাবনা-চিন্তার টানপোড়নে পথশ্রম টেরই পেলাম না। কথা হয়তো অনেক হয়েছে—কিন্তু কথাই সার। মায়া প্রপঞ্চময় বিচিত্র এই পৃথিবী। মা-মেয়ে আমাকে পুনরায় পৌছে দিয়ে গেল— পথেও অনেক কথা হল ঐ স্কুলে পড়া "চম্পা"র সাথে। তার চলনে-বলনে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট আছে—মনে রাখার মত। এইবুড়ো দাদুর সাথে এই স্বল্প সময়ের আলাপেও তার প্রভাব হয়তো আমি খানিকটা বুঝেছি।

জড়বাদ বা বস্তুবাদের চেয়ে আধ্যাত্মবাদের প্রতি আমাদের চিরকালই ঝোঁক বেশী। বিদেশীরা এজন্যই আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে ভারতে আসেন না—তারা আসেন এইজন্য যে ভারতীয়েরা আধ্যাত্মিকতাকে শ্রদ্ধা করে। আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় মহান ব্যক্তিরা কেবল শিক্ষিত নয়, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছেন। পালটে দিয়েছেন গোটা সমাজের চিন্তাধারা। এসব গম্ভীর আলোচনা বোধ হয় এখানে বেমানান, তাইনা ?

এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮৷৩০ টায় রিজার্ভ বাসে রওনা হলাম কাঠমাণ্ডু থেকে। বিদায় পশুপতিনাথ, বিনা বিপদে যাতে কলিকাতা পৌছাতে পারি তাই সকাতর প্রার্থনা জানালাম মনে মনে। গুজব অনেক শুনেছি, আর ভয়ও আছে যথেষ্ট, তাই "গমনে বামনঞ্চৈব" স্মরণ করে বাসের ফ্রন্টসিটের সংরক্ষিত আসনে বসে গেলাম। বিদায়, বহু ইপ্সিত মহান নগরী কাঠমাণ্ডু; বিদায় এবার! ছুটে চলল "বাস"

আমাদের। পালাং (৬৬৫০ ফিট) আসবার পূর্ব্বক্ষণে একটা চটিতে থেমে গেল বাস—চা পানের জন্য বিরতি। সানন্দে সবাই চা-পানে দেহমন একটু চাঙ্গা করে নিয়ে আবার বাসে আরোহণ। পথের ধারে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য বদলায়, মনের রং যেন অজান্তে পাল্টাতে সুরু করে দিয়েছে। বেশ উঁচুতে একটা সুবৃহৎ ঝরণার জলধারার পাশে দেখলাম ফেনিল জলরাশি জমাট বেঁধে আছে (এক একটা বড় চাঁই বরফের)। একটু পরেই পৌঁছালাম "দামান" ষ্টেসনে (৭৮২০ ফিট)। আমাদের এই প্রখ্যাত "ত্রিভুবন-রাজপথ" (৭৩ মাইল দীর্ঘ) ভারত তৈরী করে দিয়েছে—নেপাল ভারত মৈত্রীর প্রতীক হিসাবে। বাসপথের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান হল এই "দামো" (বা দামান্)। এখানে আছে সরকারী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বনবিভাগের পরিদর্শন কুঠী, আর কয়েকটী ছোট বড় চটী বা হোটেল। হোটেলের কর্মীরা সবাই প্রায় হরিণ-নয়না, সুবেশা তরুণী, কিছু কিছু হিন্দী-ইংরেজীও বলতে পারে। ব্যবসায়ীক বুদ্ধিতে পাকা ; হয়তো অনেকেই হৃদয়মন নিয়ে ব্যবসাতেও অতি-পাকা হয়েছে ইতিমধ্যেই। আমরা সবাই গাড়ীথেকে নেবে চা-খাবার খেয়ে নেই। আর কেহ কেহ সেই "ছোটবড় কর্ম্ম"ও সেরে নেন একটু দূরে পাহাড়ের আড়ালে। ঝরণার জলের অভাব নেই, রাস্তার দুদিকেই জল আছে। এগিয়ে চলে বাস দ্রুততালে। এবার থামে "চিত্তপুর" চটীতে। এখানে মসলামুরি ও চাপান বেশ আনন্দদায়ক মনে হয়। বাস রাস্তার সমান্তরালে কুলুকুলুনাদে স্রোতস্বতী মুখরিত—এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে সবাইর মন কেঁড়ে নেয়। মহিলা কেন, সবাই বলা যায় জলের কিনারায় গিয়ে উত্তাল ফেনিল জলরাশি একটু স্পর্শ করে খুব আনন্দ বোধ করে—আরো বেশী সময় কাটাতে চায় এখানে, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত বলে নানা-ভাবে অনুরোধ জানিয়ে বাসে উঠিয়ে আবার আমরা রওনা হই বীরগঞ্জের সীমানাচৌকী তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্য। অবশেষে ৪টার সময় বীরগঞ্জ পৌঁছে শুনলাম যে আজ আর যাবার উপায় নেই। রাত্রিবাস "অমর লজের" দোতলায়। পুনরায় চা-পান

এবং রাত্রি ১০ ঘটিকায় খিচুড়ী,, ভাজা ও চাটনী যোগে নৈশভোজন। আর বিশ্রাম ১১॥০ টায়। বলা নিষ্প্রয়োজন—সারাদিনের ক্লান্তির পরে বিশ্রামে আনন্দ আছে—আছে গভীর প্রশান্তি, যা' সহজেই দেহমনকে স্বপ্নলোকের অন্তরালে নিয়েযেতে সাহায্য করে।

পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করে ঠাণ্ডাজলে স্নানাদি সেরে নেই। নীচে "টীউব ওয়েলের" জল তুলে দুবালতি উপরের বাথরুমে নিয়ে আসি নিজেই—বেশীর ভাগ যাত্রী তখনও নিদ্রামগ্ন। চা-পানের পর চামড়ার সুটকেশও স্লিপার জোড়া হোটেলের বাইরে মুচীকে দিয়ে মেরামত করে নেই। নেপালী মুচীর কাজ ভাল, কিম্মত তেমন বেশী মনে হলনা—লোকটার হিম্মৎ আছে যদিও প্রথমে ঠিক বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় পত্তন চা ও প্রাতরাশ সমাপন করে আমরা এবার রওনা দেই বিভীষিকাময় চেকপোষ্ট অভিমুখে টাঙ্গা করে। অগৌণে আমাদের টাঙ্গা বীরগঞ্জ চেকপোষ্টে থেমে গেল : হৈ হৈ শব্দে মুখরিত—আর চারিদিকে পুলিশ (শান্তিসেনা) ছুটাছুটী করছে। অদূরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার মালপত্র পর্য্যবেক্ষণে রত। আবার কোথাও টাঙ্গাওলা সিপাইজীকে ডেকে "ফিস্‌ফিস্‌" ও জলপানি প্রদান। আবার ২/১ জন চতুরা মহিলা সামান্য (?) ওজনের হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে আস্তে আস্তে বড়রাস্তার পাশ কাটীয়ে সরে পড়েন। যা দেখলাম শুনলাম এই সীমান্ত চৌকীতে আটক হয় বহু জিনিষপত্র, দামী দামী বিদেশী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, জামাকাপড়, মদ, ইত্যাদি। আবার রাস্তার উপরেই গোপনে জলপানির টাকা দিয়ে "চেক হোগয়া, যানে দো" বলে সব ঠিক হয়ে যায় কোন কোন লোকের। চেকপোষ্ট পার হয়ে এসেই শুনতে পেলাম— (১) কোন এক ভদ্রমহিলা তার ব্লাউজের ভিতরে ঢুকিয়ে একটা জাপানী ছাতা নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন (২) একজন তিন বোতল বিলেতী "হুইস্কি" এনেছেন—একটী বোতল খুলে পুলিশ আফিসারদের সাথে বসে কিছু খরচ করেছেন এবং নগদ না হলেও পান-ভোজনের টেবিলে কিছু খরচ হয়েছে সব মালপত্র চেক করার পরই (৩) এক

মহিলা দুটো নূতন সাড়ী পড়ে এসেছেন, দুটী পলিয়েষ্টার সার্ট পড়েছেন একসাথে আর সায়ার পরিবর্ত্তে পড়েছিলেন দুটো দামী জামার কাপড় সায়ার মত সেলাই করে। ঐ মহিলাকে নিয়মানুযায়ী শুল্কদিতে হলে প্রায় ৩০০৲ টাকা দিতে হত (৪) একজন সাধারণ চাকুরে ভদ্রলোক একটা দামী ট্রানজিসটর সেট এনেছেন (টাঙ্গাওলার মারফতে গোপনে কিছু "এথি" পুলিশের হাতে গুঁজে দিয়ে)—তিনি নিজেই বলেছেন, কলিকাতায় ওটা স্রেফ ডবলদামে বিক্রী করবেন। অবশ্য পুলিশ-ঘাটি আরো আছে এবং হয়তো সেখানেও চালাকী করে সারিয়ে নিয়ে যাবে বা জলপানি দিয়ে দেবে—আর শেষপর্য্যন্ত ধরা পড়লে সরকারী অফিসে জমাহয়ে যাবে। বিচিত্রকাহিনী এবং বিচিত্রতর সব উপায় মাল পাচার করবার। শুনেছি অনেক, দেখলাম ও কিছু কিছু। যাক, এইসব ঝকমারির পরে টাঙ্গাওলার পরামর্শমত টাঙ্গাভাড়া ৩৷৷০ টাকা ছাড়া প্রথমে ২৲ ও পরে আরো ৫৲ টাকা দেই জলপানির জন্য— যাতে আমাদের বৃথা হয়রাণি না করে তাড়াতাড়ি চেক করে যাবার অনুমতি দেয়। কিন্তু ভবি অত সহজে ভোলবার নয়; মৌকা পেলে পেছকষতে কেউ কম যায়না !! প্রায় আড়াই ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের মুক্তি দিল—চেকপোষ্ট পেরিয়ে একটু দূরে এসেই আমাদের "বাস স্টপেজে" থেমে গেল টাঙ্গা। বাস রিজার্ভ করে এবার মুজাফয়পুর এবং পুনরায় পৃথক বাসে সমস্তিপুর পৌছাই বৈকাল প্রায় ৫৷৷০ টার সময়ে। সমস্তিপুর পৌছাবার পূর্ব্বে আমরা আমরুৎ (পেয়ারা), পাকা পেঁপে, মিঠাই ও চা খেয়ে নিই—সদলবলে। পথে আবগারী বিভাগের লোকজন হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে বাস চেক করে, কিন্তু কোন বামাল না পাওয়ায় (মনের দুঃখেই বোধ করি) একজন স্থানীয় অধিবাসীকে ধরে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য—যদি কিছু আদায় করা যায় সে চেষ্টায় !!

চেকপোষ্টে অনেক বিলম্ব হবে শুনে বীরগঞ্জে যে কয়জনকে আমরা ছেড়ে আসি, তারা আমাদের সাথে মিলিত হন মুজফারপুর থেকে সমস্তিপুরের পথে—মুজাফারপুর ছাড়ার পরেই। সে

আনন্দ ঘন মুহূর্ত্তের কথা ভোলা যায়না। বিষন্নতার যে ছায়া মনকে মসীলিপ্ত করেছিল তাই শুধু ধুয়ে মুছে গেলনা—বিচিত্র কোলাহলে ও ততোধিক আনন্দে মন মেতে উঠলো এবার। তবে একজন নগদ দক্ষিণা ১৭৫৲ ও কিছু মালপত্র ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। অল্পবিস্তর গিয়েছে আরো কয়েকজনের শুনলাম, ভোগান্তির কথা বলাই বাহুল্য। সমস্তিপুর রেল ষ্টেসনে পৌছেই দেখলাম ২০ ডাউন মিথিলা একস্‌প্রেস আমাদের নাকের ডগাদিয়ে বেরিয়ে গেল—যে গাড়ীতে আমার "বার্থ"সংরক্ষিত ছিল—কিন্তু নিরুপায় !! প্লাটফরমে বসে অবসর যাপনের ফাঁকে আমরা গরম লুচি-তরকারী, মিঠাই ও চা সহযোগে "বৈকালিক" সেরে নেই—পরে রাত্রি আট ঘটিকায় নিরামিষ নৈশভোজ সমাপন করি।

সমস্তিপুর প্লাটফরমে আমরা একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনার সম্মুখীন হই—এমন দুঃখজনক দৃশ্যের বর্ণনা বড়ই করুণ ও হৃদয় বিদারক হওয়াই স্বাভাবিক। বারাউনী লোকাল ট্রেন ছাড়বার প্রাক্কালে ভরতসিং নামধারী ৩৪।৩৫ বয়স্ক একজন ফেরীওয়ালা (মোমফলি—চীনা-বাদাম) গাড়ী থেকে নামবার সময় পিছলে নীচে পড়ে যায় ঠিক খাড়াভাবে প্লাটফরম ও গাড়ীর মাঝখানে। গাড়ী ঐ মূহুর্ত্তে চলতে আরম্ভ করে ও তার শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ে যায়। আর বলির পাঠাকাটার ন্যায় মাথা দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে রেল-লাইনের ভিতর দিকে পড়ে—আর মুণ্ডহীন দেহটা অক্ষতভাবে রেললাইনের বাইরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ট্রেনখানি একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে যায় কিন্তু হায়, সব শেষ মূহুর্ত্তমধ্যে। তার মোমফলির ঝুড়ি আর টাকাপয়সা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—কেহ কুড়িয়ে নিতে আসেনা! সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করেনা, আর যে সময় চলে যায় তাহা কখনও আর ফিরে আসে না। সর্ব্বজন বিদিত এই শাশ্বত বাক্য আমরা মনে রাখার চেষ্টা করিনা এটাই আশ্চর্য্য। গাড়ীও খানিকবাদে আপনগন্তব্য স্থলে অগ্রসর হল।

আমরা পরবর্ত্তী ট্রেন ২২ ডাউন নর্থ বিহার এক্সপ্রেস যোগে রওনা দেই। "রিজার্ভেশন" পাবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করি—কোন-

মতে যেতেই হবে তাই সকলকণ্ঠেই রাজী। এখানেও আবগারী বিভাগেব কয়েকজন অফিসার আপনাদের পরিচয় প্রদানান্তর কিছু "সেলামী" প্রার্থনা করলেন—সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাতেও কসুর করেননি—"অন্যথায় সব মালপত্র তন্নতন্ন করে চেক করবো, গাড়ী ছাড়তে বিলম্ব হবে অনেক—আর যদি কিছু মিলে যায় তবে তো কথাই নেই" ইত্যাদি। আমাদের বগীর প্রত্যেকে নগদ ২্ টাকা করে দেবার পরে তারা সদলে প্রস্থান করলেন। কি দায়ীত্বশীল সরকারী অফিসার ; নির্লজ্জ ঘৃণ্য প্রস্তাব জানাতে একটুও বাঁধেনা !! বোঝা যায় তারা দৈনিক এরূপ কাজে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আর স্ফীত হয়েছে "ব্যাঙ্ক ব্যালেনস্"। পথে মতিহারীতে পুলিশ বাহিনী আবার হানা দেবে এবং বিনা দর্শনীতে কাজ হবার নয় জেনে আবার যাত্রীদের কাছ থেকে ১্ টাকা করে আদায় করে মোট ৪০্ টাকা জমাকরা হয় (ঐচ্ছিক দান বাবদ)। যথা সময়ে প্রতিরাত্রের মত মতিহারী ষ্টেশনে পুলিশের হাতে ঐ টাকা আদায় দিয়ে দেওয়া হয় এবং আর কোন ঝামেলা হয়নি কোন ষ্টেশনে।

মধুপুর পৌছাই প্রত্যূষে পাঁচটার সময় এবং চা-পান করে একটু চাঙ্গা হয়ে নেই। শীতের আমেজে বেশ মধুময় মনে হল এই মধুপুরের হিমেল হাওয়া। প্রাতরাশ ৭।৩০ মিঃ এ, মধুরেণ সমাপয়েৎ চা সহযোগে। জানালা দিয়ে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখা যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে রং ও দৃশ্য বদলায় অবিরাম গতি যেমন ট্রেনের তেমনি দুর্বার গতি এই প্রাকৃতিক রসময় মনোহর ছবিগুলির। মনে ধরে রাখবার তেমন সুযোগ নেই—কেবলই পট পরিবর্ত্তন চলেছে। করুনাময় পরমেশ্বরের লীলা বোঝা ভার—বিচিত্র এই দেশ আর বিচিত্রতর তার অধিবাসীরা, কথায়, ব্যবহারে পোষাকে এবং সর্ব্ব বিষয়ে।

আমাদের সহযাত্রী নৈহাটীর শ্রীযুক্ত কমল পাল সস্ত্রীক প্রথমে যাত্রা বিরতি করেন ব্যাণ্ডেল জংসনে। বৃদ্ধ দম্পতিকে আমাদের সবাইর ভাল লেগেছিল। শ্রীযুক্ত পাল সৌম্য দর্শন একজন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক; ছেলে লণ্ডনে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পাঠরত। সবাই

আমরা তাদের শুভেচ্ছাসহ বিদায় সম্ভাষণ জানাই। অবশেষে কাঠমাণ্ডু (তীর্থযাত্রা কি প্রমোদ ভ্রমণ ?) থেকে আমরা হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছাই ২৫শে ফেব্রুয়ারী নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় দুঘণ্টা পরে। হাওড়া ষ্টেসন থেকে আমরাও বিভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে বিদায় জানাই।

বাড়ী পৌঁছেই দেখি বন্ধুবরের আমন্ত্রণ—দোল পূর্ণিমার উৎসবে তাদের বাড়ী যাবার জন্য। শ্রদ্ধেয়া ডাঃ সেন (B.Sc., DMS.) যে কবিতাও লিখতে পারেন তা পূর্ব্বে জানা ছিলনা। বহুপূর্ব্বে স্কুল ও কলেজ ম্যাগাজিনে আমিও কখনো কখনো কবিতা লিখেছি—কিন্তু এখন তা ধারণার বাইরে। তবু সার্থকনামা কর্ম্মব্যস্ত ডাঃ কবিতা সেনের খাতিরে আমিও তার চিঠির উত্তর সহ ছোট্ট একটি কবিতা লেখার প্রয়াস নিলাম। আপনারা কি মনে করবেন জানিনা, তবে বন্ধুবর ও তার মা-বাবা সবাই খুব খুসী হয়েছিলেন। নীচে দুটো কবিতারই অনুলিপি দিলাম=

১। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডাঃ নকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু=

দোলের দিনে মনে পড়ে রাধাশ্যাম কথা।
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, অপূর্ব্ব আনন্দ মাখা॥
বৃন্দাবনের ব্রজলীলা, মধুর গৌরাঙ্গ কথা অমৃত সমান।
মননে, কথনে পূণ্য বিশেষ লগনে শুনে পূণ্যবান॥
পিচকিরি আর ফাগের কারণে, মান অভিমান।
আলিঙ্গন, যোগ্য সম্ভাষণ পরে—সকলই সমান॥
রোষ দ্বেষ ভুলি, প্রিয়জনে বাঁধ বাহুর বন্ধনে।
প্রীত করি প্রীত হও দুজনাই, মধুর বচনে॥
স্মৃতির স্মৃতি অতি অনুপম, পরমধন মানি।
দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে—আমি জানি॥
রং আর আবিরে আজি, প্রাণে আনে রং।
ভৌমানন্দে লহ ভাগ—আজ না রাখি ভরং॥

নিরিবিলি নিরবধি—অপার আনন্দ শেষে।
চল নিজ কাজে খুসীর আমেজে—মনোহর বেশে ॥
নিখাদ আনন্দ কথা, আবার ভেবে দেখ ভাই।
অনেককিছু হল বলা, এবার ইতি করি তাই ॥

২। শ্রদ্ধেয়া বন্ধুবর ডাঃ (কবি) কবিতা সেন

করকমলেষু=

মধুময় মাসে মধুর আবেশে
মধুর লগনে লাগে দোল।
প্রাণের পরশে রঙ্গীন নেশায়
মনের গহনে কত কলরোল !!
আলিঙ্গন করি যুব-জন খেলায়
বয়স-পেশা কিছু নাহি মানি
বিশেষ দিনের উছল আনন্দে
প্রীতির পরশ মাগি ॥
দেহমনে আনে মাদকতা কত
কোন বাঁধা নাহি মানে।
তোমারও কি তাই হৃদয় মাঝারে
মিলিতে বাসনা জাগে ?
আবির মাখানো চন্দন চর্চ্চিত
সাজ-সাজাও মনোহর সাজে।
রোষ-দ্বেষ ভুলি রাঙিয়ে দাও রঙে
আজ কাজ নাহি লাজে ॥
মধুর সম্ভাষে বাঁধ হৃদয় দিয়ে
অনাবিল শান্তি তায়।
বন্ধু-বান্ধব যত আত্মীয় স্বজন সবে
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় ॥

পরম পিতার আজি মাগি আশীর্বাদ
চরণে জানাই নতি।
রঙীন দিনের যত রঙীন বাসনা
বিশেষ দিনের স্মৃতি॥
ফাগুণের আগুণে রাঙ্গিয়ে জীবন
সুখী হও, শান্তি পাও মনে।
এ শুভ লগণে দিয়ে-নিয়ে ভালবাসা
মনের গভীরে বৃদ্ধ করি ভণে॥

বিদায় **কাঠমাণ্ডু**!!

ধন্যবাদান্তে নমস্কার জানাই।

—:) সমাপ্ত (:—